দধিচীর অস্থি

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

DADHICHIR ASTHI
KRISHANU BANDOPADHAYA

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় : ১৩৫৮

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

মুদ্রাকর : শ্রীমতী শক্তি রায় : নিউ শক্তি প্রেস
১/এ, অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রীট : কলিকাতা-৭০০০০৬

দধিচীর অস্থি

অনুতোষ মিত্র কর্কটিপ সিগারেট ধরালেন।

চোখ বন্ধ করে বারকয়েক টান দেবার পর শব্দ করলেন আরামসূচক। ঘরে এখন তিনি একাই রয়েছেন। ডিভানের উপর তিনি নিজেকে আরো কিছুটা এলিয়ে দিয়ে তাকালেন দেওয়ালে টাঙ্গানো সুদৃশ্য ঘড়িটার দিকে। হামবুর্গ ফেরত জনৈক বন্ধু ঘড়িটা বছর দুয়েক আগে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন।

এখন কাঁটায় কাঁটায় ছটা দশ।

ভ্রূ-কুঁচকে উঠল অনুতোষের।

এমন তো হবার কথা নয়। এতক্ষণে অতিথিদের মধ্যে কয়েকজনের এসে পড়া উচিত ছিল। অথচ কারুর এখনও দেখা নেই। শ্যালক রবীন দত্তকেই অবশ্য তিনি সবার আগে আশা করছেন। এখন এসে পড়লে কিছু প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিতে পারতেন। বলেও রেখেছিলেন তাই। ঠিক সময় ঠিক জায়গায় পৌছাবার অভ্যাসটা আজও সে রপ্ত করতে পারলো না।

কর্কটিপ ক্রমে ছোট হয়ে এল।

তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অমৃত ভাটিয়া ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রদূত। উনিই ক্যারাকাস থেকে এক কার্টুন কর্কটিপ সিগারেট পাঠিয়েছিলেন। এখনও আছে কিছু স্টকে। ফুরিয়ে গেলে আবার অন্য ব্র্যাণ্ডের উপর নির্ভর করতে হবে ভাবলে সময় সময় মন খারাপ হয়ে যায়। অবশ্য এই ধরনের বদ অভ্যাসের কোন মানে হয় না।

ঘড়ির দিকে আবার তাকালেন তিনি।

কাঁটা আরো কয়েক মিনিট এগিয়েছে।

ডিভানের একপাশে সুদৃশ্য টিপয় রাখা রয়েছে। তার উপর অ্যাসট্রে আর একগোছা চিঠি। সমস্ত চিঠিই লণ্ডনের ছাপমারা সুদৃশ্য এয়ারমেল-এর খামের মধ্যে রয়েছে। ছোট হয়ে আসা সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রের মধ্যে ঠেসে দিয়ে, গোছার মধ্যে থেকে একটা চিঠি বেছে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলেন অনুতোষ মিত্র।

কালকের ডাকে আসা এই চিঠিখানা ইতিমধ্যে বার দুয়েক তাঁর পড়া হয়ে গেছে। প্রতিবারই যে অনুভূতি লাভ করেছেন, এবারও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। কিছুটা বিরক্ত হয়েই তৃতীয়বার পড়তে আরম্ভ করলেন। লণ্ডন

প্রবাসী তাঁর এক মামাতো ভাই এই চিঠিখানা লিখেছেন। ভাগ্যিস লিখেছেন, তাই ছেলের কেচ্ছাকাহিনী জানা গেল।

এই সময় নির্মল সোম ঘরে প্রবেশ করলেন।

পেশায় তিনি ব্যারিস্টার।

এখনকার স্থূল শরীরের দিকে তাকালে বোঝবার উপায় নেই যে, এককালে তিনি ভাল অ্যাথলেট ছিলেন। ছিলেন, ফুটবল মাঠের অতি ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন রাইট আউট। অমুতোষের বাল্যবন্ধু। কলেজের রোমাঞ্চকর দিনগুলি একই সঙ্গে দুজনের কেটেছে।

সিগার দাঁতে চেপেই নির্মল সোম বললেন, একি! আর কেউ এখনও এসে উপস্থিত হয়নি দেখছি। আমি তো ভেবে বসে আছি, আমারই দেরি হয়ে গেছে।

—ইণ্ডিয়ান পাংচুয়ালিটি বলে একটা কথা আছে জান তো? সকলে ওই ধারা বজায় রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে আর কি।

—তাই তো দেখছি।

নির্মল সোম বসলেন।

প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, কি এত মন দিয়ে পড়ছিলে?

—সরোজের চিঠি।

—সরোজ কে?

—আমার মামাতো ভাই।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভদ্রলোক তো লণ্ডনে থাকেন।

—ঠিকই বলেছো। সরোজ ওখানেই সেটেল্ড করেছে। দেশে আর ফিরবে না। ওর এই চিঠিখানা আমায় বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

—ভাবিয়ে তুলেছে! ব্যাপারটা কি?

চুলের মধ্যে একবার আঙুল চালিয়ে নিয়ে অমুতোষ বললেন, ছেলেটাকে নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়েছি ভাই। তোমাকে অবশ্য বলতে বাধা নেই। তুমি তো আমার হাঁড়ির সব খবরই রাখো। সরোজ লিখেছে—

—থামলে কেন?

আক্ষেপের সুরে তিনি বললেন, সরোজ লিখেছে, প্রিয়তোষ এখন ওখানে অনেক কেচ্ছার নায়ক! ছেলেকে আমি লণ্ডনে পাঠিয়েছিলাম ডাক্তারি পড়তে। পড়াশোনা জলাঞ্জলি গেল, উনি এখন মেয়েদের পিছনে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন।

—বয়সকালে ওরকম একটু হয়।

অবাক হয়ে অনুতোষ তাকালেন।

—তুমি বলছো এ কথা!

—হ্যাঁ, ভাই। আমাকে বলতে হচ্ছে। বয়সকালে ওরকম একটু হতেই হবে, তারপর আবার গিয়ে পড়েছে প্রচণ্ড স্ত্রী স্বাধীনতার জায়গায়। কাঁচা মাথা তো, একটু বিগড়বেই। ঘাবড়িয়ো না, সব ঠিক হয়ে যাবে আবার।

—তুমি তো বলেই খালাস। আমি ভাবছি—

বিস্ময়ের সুরে নির্মল সোম বললেন, ছেলেকে শাসন করবার কথা ভাবছো নাকি? মাথা খারাপ। তুমি কড়া চিঠি দেবে, সে আরো বেশী করে মেয়ে চর্চায় মন দেবে। পড়া অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসতে বলবে, সে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়ে ওখানে থাকার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে ফেলবে। তাই বলছিলাম, ও-পথ মাড়িও না।

—কি করতে বল এখন?

—কিছুই না।

—সে কি! কিছুই না!

—ঠিক তাই। আমার কথাই ধর না—বিলেতে গিয়ে আমিও কিছু কম কেলেঙ্কারি করিনি। শেষ পর্যন্ত কি হল? ডিগ্রী পাবার পরই সুবোধ বালকের মত বাড়ি ফিরে এলাম। জয়েন করলাম হাইকোর্টে। সব ঠিক ঠিক চলতে লাগলো। এখন আমার দিকে কেউ আঙুল তুলতে পারে? এই রকমই হয়। প্রিয়তোষের বেলায়ও তাই হবে তুমি দেখে নিও।

কথাবার্তা চলতে থাকুক।

ইতিমধ্যে অনুতোষ মিত্র'র সংক্ষিপ্ত পরিচয়টা দিয়ে রাখা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উনি জন্মেছিলেন এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে। বাবা চিত্ততোষ মিত্র ছিলেন কাঠের কারবারী। নানা প্রয়োজনের দামী থেকে সস্তা সব রকম কাঠই তাঁর আড়তে মজুত থাকত। উত্তরাধিকারী সূত্রে ওই ব্যবসা যথাসময় হাতে পেলেন অনুতোষ এবং তাঁর ছোট ভাই দানতোষ। তখন তাঁরা থাকতেন উত্তর কলকাতার রামধন মিত্র লেনের পৈতৃক বাড়িতে।

কাঠের ব্যবসায় কিন্তু অনুতোষ মন বসাতে পারলেন না। কি ভাবেই বা পারবেন। উনি অন্য ধাতুর মানুষ। দু-চার দিন ওখানে যাওয়া-আসা করার পর বুঝলেন, কাঠের ব্যবসা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ভাইয়ের হাতে ব্যবসা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবার পর গিয়ে উপস্থিত হলেন হাইকোর্ট পাড়ায়। অফিস

খুললেন ওখানে। নিতান্ত খেয়ালের বশেই এ্যাটর্নীশীপ পড়েছিলেন। এখন কাজে লেগে গেল।

এর পরের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বলতে গেলে এরপর থেকেই অনুতোষ মিত্র'র জয়যাত্রা আরম্ভ। অল্প কিছুদিন পর থেকেই জলস্রোতের মত মক্কেল আসতে লাগল তাঁর অফিসে। খ্যাতির প্রায় তুঙ্গে চলে গেলেন তিনি। সেই সঙ্গে ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের অঙ্কটাও দ্রুত হারে বেড়ে যেতে লাগল। কাজের চাপে উনি হিমসিম খেতে লাগলেন।

টাকায় সব হয়।

সমাজের নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেতে তাঁর আর কোন অসুবিধা হল না। মোট কথা, অনুতোষ যখন পঞ্চাশে পা দিলেন, তখন তিনি প্রচণ্ড ধনী এবং সুনামী ব্যক্তি।

এরপর আরো সাতটা বছর কেটে গেছে।

কিন্তু মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বোধহয় সুখী হতে পারে না। মনে হয়, এটা পরমপুরুষের অভিশাপ। সেই ধারা অনুতোষের জীবনেও বজায় ছিল। বিত্তের ক্ষেত্রে তুঙ্গে উঠে গেলেও, পারিবারিক জীবন তাঁকে অসুখী করে রাখল। স্ত্রী অলকা অসামান্যা রূপসী ছিলেন। প্রথম কয়েক বছর দাম্পত্য-জীবন গভীর খাতেই বয়েছিল।

প্রিয়তোষের জন্ম হল। অনুতোষ ভেবেছিলেন তাঁর মত সুখী আর কে আছে। তারপরই কিন্তু ছন্দপতন ঘটল। স্ত্রীর আচার-ব্যবহারে কিছুটা খাপছাড়া ভাব ইদানিং লক্ষ্য করছিলেন। প্রথমে গা করেন নি, ক্রমে সবকিছু যখন আরো বেখাপ্পা হয়ে উঠল, তখন একটা সন্দেহ স্বাভাবিক কারণেই তাঁর মনকে ভাবিয়ে তুলল। পারিবারিক চিকিৎসককে ডাকা হল।

অভিজ্ঞ ডাক্তার সেন দেখলেন এবং শুনলেন।

—কি বুঝলেন ডাক্তার সেন ?

—উনি মানসিক স্থৈর্য হারিয়েছেন।

—অর্থাৎ—

—আপনি তো বুঝতেই পারছেন···মানে···

অনুতোষ এবার ভালভাবেই বুঝলেন, তাঁর সন্দেহ অমূলক নয়। পাগল হয়ে গেছে অলকা। তাঁর জীবনে হাহাকার নেমে এল। এরপর স্পেশালিস্টরা এলেন। তাঁরাও ডাঃ সেনের অভিমতকেই সমর্থন জানালেন। তারপর এমন

দিন এল, যখন অলকাকে উন্মাদ আশ্রমে না পাঠিয়ে আর কোন উপায় রইল না। অবশ্য বহুদর্শী অনুতোষ নিজেকে দৃঢ় রাখলেন। কর্তব্যে অবহেলা করলেন না। ছেলেকে মানুষ করতে হবে।

সেই প্রিয়তোষ আজ ইংল্যাণ্ডে ডাক্তারি পড়ছে।

ঘোর উন্মাদ অবস্থায় অলকা আজও বেঁচে আছেন। এবং আছেন উন্মাদ আশ্রমে।

অনেক দিন হল উত্তর কলকাতার পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে এসেছেন। নতুন বাড়ি করেছেন থিয়েটার রোডে। আজকাল যাকে শেকস্‌পীয়র সরণী বলা হয়। একলা মানুষ, এত বড় বাড়ির প্রয়োজন পড়ে না। তবু একতলাটা ভাড়া দেন নি। ইচ্ছে আছে প্রিয়তোষ ফিরে এলে ওখানে ডিস্পেনসারি সাজিয়ে দেবেন। এমন ডিস্পেনসারি যা কলকাতার কোন ডাক্তারের আছে কিনা সন্দেহ।

অবসর সময় অনুতোষের কাটে নানা হুজুগের মধ্যে দিয়ে। মাঝে মাঝে কয়েকদিন সময় বার করে নিয়ে কোন শৈলাবাস বা সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে আসেন। কি ধরনের হুজুগের প্রতি তাঁর ঝোঁক, সে সম্পর্কের উল্লেখ করতে গেলে আজকের কথাই ধরা যেতে পারে। কোন উপলক্ষ্য নেই তবু কয়েকজনকে নৈশ আহারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এমন পার্টির ব্যবস্থা মাঝে মাঝেই হয়। বন্ধু খাওয়াতে ভালবাসেন তিনি। বলাবাহুল্য, প্রচুর টাকা থাকলে যে কোন ধরনের হুজুগে গা ভাসাতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

...তাই বলছিলাম, ও সমস্ত চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও...নির্মল সোম বললেন, এখন যা করছে করুক। সময়ে নিজেই সামলে যাবে।

অনুতোষ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মুখ খোলার আগেই প্রদীপ ভট্টাচার্যকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখলেন। ছিমছাম, চেহারায় প্রদীপের বয়স ত্রিশ বত্রিশের বেশী নয়। মুখে হাল্কা একটা হাসি লেগেই আছে। সে অনুতোষের জুনিয়ার। ভারী কাজের ছেলে।

—এসো প্রদীপ—

অনুতোষ সোফা দেখিয়ে দিলেন।

—বসো ওখানে। কটায় অফিস বন্ধ করেছিলে?

প্রদীপ বললে, আমাকে তিনটের সময় বেরুতে হয়েছিল। অফিস বন্ধ করার দায়িত্বটা অরবিন্দবাবুর হাতে দিয়ে এসেছিলাম।

—তিনটের সময় কোথায় গিয়েছিলে?

—বাজোরিয়ার সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিল। আপনি তো—মনে পড়েছে। মিসেস মুখার্জি এখানে আসার কথা কিছু বলছিলেন নাকি?

—আমাকে তো বলেছিলেন চারটের সময় বাড়ি ফিরে যাবেন। ওঁর স্বামী অফিস থেকে এলে দুজনে আসবেন এখানে।

এই সময় সুদীপ্ত মুখার্জি দেখা দিল।

অত্যন্ত স্মার্ট। মুখ চোখের জেল্লা লক্ষণীয়। রুচিশীল পোশাকে ওকে মানিয়েছেও চমৎকার। বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী হবে না। একা নয় সঙ্গে এক যুবতী রয়েছে। দেখে, সহজেই মনে হয় বাঙ্গালী নয়। পাঞ্জাবী কিম্বা সিন্ধী হতে পারে। সাজ পোশাকে আড়ম্বর নেই বলেই বোধহয় বুঝতে পারা যাচ্ছে যে সুশ্রী মেয়ে।

সুদীপ্ত উঁচু গলায় বলল, হ্যালো জন—বৌকে সঙ্গে না নিয়েই চলে এলে যে?

—বাড়ি আর ফেরা হল কোথায়! দারুণ কাজের চাপ ছিল। অফিস থেকে সোজা চলে আসছি এখানে।

—কাজটা ভাল করনি। প্রদীপের মুখে শুনলাম, মিসেস মুখার্জি তোমার অপেক্ষায় বাড়িতে বসে থাকবেন। তোমার সঙ্গে আসবেন এখানে।

বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে সুদীপ্ত বলল, বাড়ি ঘুরে আসার উপায় ছিল না। এতে অসুবিধের কিছু নেই। আমার দেরি দেখে ও নিজেই চলে আসবে। একটু থেমে আবার বলল, এর সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। শালিনী রাওয়াল। আমার অফিস সেক্রেটারি।

আলাপ পর্ব শেষ হল। শালিনী চমৎকার বাংলা বলতে পারে।

তবে একটা কথা আছে মিত্তিরদা—, সুদীপ্ত বলল, বুঝতেই পাচ্ছেন, একটা অসামাজিকতা আমি করে ফেলেছি। শালিনীকে আপনি নেমন্তন্ন করেন নি, অথচ—

কথা চাপা দেবার চেষ্টা করলেন অনুতোষ। ঠিক আছে—ঠিক আছে। সমস্ত নিয়মকানুন সব সময় মেনে চলতে হবে, তার কোন মানে নেই। আমার জীবনটাই দেখ না, বেনিয়মে চলছে।

শালিনী বলল, আমি কিন্তু আসতে চাই নি। উনি জোর করে—

ভালই করেছেন। আপনি এসে পড়ায়, আমি সত্যি খুশী হয়েছি।

দানতোষ আর রবীন দত্ত একই সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলেন এই সময়। দু'জনের বয়সের বিশেষ পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন

মধ্যেই। ছোট ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলেন অনুতোষ। কারণ দানতোষকে অসম্ভব গম্ভীর দেখাচ্ছে। শ্যালক রবীন দত্ত অবশ্য বেশ হাসি-খুশী। তিনি প্রদীপের পাশে গিয়ে বসলেন।

অনুতোষ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার শরীর কি ভাল নেই।

শরীর ভালই আছে। তবে—দাদা, তুমি একবার এধারে এস না। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

দাদা ভাইয়ের পিছু পিছু ঘরের আরেক প্রান্তে গিয়ে পৌছালেন।

—বল এবার ?

একটু ইতস্তত করে দানতোষ বললেন, বলতে আমার খুবই সঙ্কোচ হচ্ছে, তবু না বলে উপায় নেই। আরো কিছু টাকা না পেলে ব্যবসা বাঁচাতে পারব না।

সে কি ! মাত্র মাস দুয়েক আগে তোমাকে কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছি। তখনও তুমি ঠিক এই কথা বলেই টাকাটা নিয়েছিলে।

নিয়েছিলাম···মানে···

শোন দানু, ইদানিং তোমার সম্পর্কে কিছু কথা আমার কানে এসেছে। তুমি আজকাল শেয়ার মার্কেটে ঘোরাঘুরি করছ। অনেক টাকা লোকসান দিয়েছ ওখানে। মাঝ থেকে দেখা-শোনার অভাবে পৈতৃক ব্যবসাটা ডুবছে।

দানতোষের মাথা ঘুরে উঠল। এই সঙ্গে মনে হল, মুখের সমস্ত রক্ত কে যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিয়েছে। তিনি ভাবতেই পারেন নি, তলায় তলায় দাদা তাঁর কার্যকলাপের সমস্ত ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন ! ভারি খারাপ লাগতে লাগল। এখন কি যে উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না।

না না, এ একেবারেই ভাল কথা নয়। অনুতোষ বললেন, তোমাকে আমি যথেষ্ট দায়িত্বশীল এবং সংযমী বলে জানতাম। কিন্তু একি—এ সমস্ত তুমি কি করে বেড়াচ্ছ ?

কাঁপা গলায় দানতোষ বললেন, শেয়ার মার্কেটে যাওয়াটা যে ঠিক হয়নি, পরে তা বুঝতে পেরেছি। মাঝ থেকে কিছু লোকসান হয়ে গেল। গ্রহের ফের বলতে পার। তবে ওখানে যাওয়া একেবারে বন্ধ করেছি।

আমি বিশ্বাস করি না। মদের নেশার মত শেয়ার মার্কেটে যাওয়াও একটা নেশা, যারা একবার যেতে আরম্ভ করে—নেশা ছুটতে সময় লাগে অনেক।

বিশ্বাস কর, আমি আর যাই না। তুমি খোঁজ নিলেই জানতে পারবে।

ব্যবসা আবার ফর্মে আনার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি। এখন তুমি সাহায্য না করলে, কিছুতেই কিছু করা সম্ভব হবে না!

হুঁ। এখন কত টাকা তোমার দরকার?

হাজার পচিশেকের মত। 'ইণ্ডিয়ান টিক'-এর একটা লট একজনের কাছে রয়েছে। ওটা নিতে পারলে, অবস্থা সুবিধাজনক হয়।

এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারছি না। পচিশ হাজার টাকা তো আর খোলামকুচি নয়। আগে আবার কুড়ি হাজার টাকা নিয়েছ। ভেবে দেখি। তুমি বরং কাল সকালে এসে আমার সঙ্গে দেখা কর।

দুই ভাইয়ের কথাবার্তা তখন চলছে, নির্মল সোম সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললেন, মিনিট দুয়েকের জন্য বারান্দায় আসবেন?

—নিশ্চয়।

সুদীপ্ত সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল।

বারান্দায় আসার পর সোম বললেন, অনধিকার চর্চা অবশ্য করতে চলেছি। কথাটা কি জানেন, আমি আপনার একজন ওয়েল উইশার। নইলে—

সুদীপ্ত হাসি মুখে বলল, ভনিতা না করে যা বলতে চাইছেন তাই বলুন…

কথাটা আপনার অফিস সেক্রেটারিকে নিয়ে। ওঁকে এখানে না আনলেই ভাল করতেন। কুন্তলা হয়তো এখনই এসে পড়বে। ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলে অত্যন্ত দুঃখিত হবে সে।

আমি কিন্তু চাই, সে সমস্ত কিছু বুঝতে পারুক।

তার মানে?

বছর তিনেক আগে ওকে যখন বিয়ে করেছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল, আমার মত ভাগ্যবান স্বামী কলকাতা শহরে বোধহয় দুটি নেই। তারপর কি হল? যত দিন যেতে লাগল ওর ব্যবহারে ততই হতাশ হতে লাগলাম। এখন তো ফেড আপ। যে কোন দিন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে পারে।

দুঃখিত ভাবে মাথা নেড়ে নির্মল সোম বললেন, দারুণ জট পাকিয়ে ফেলেছেন দেখছি। কিন্তু এ সমস্ত ভাল নয়। ঠাণ্ডা মাথায় বসে মিটমাট করার ব্যবস্থা করুন।

আর কোন লাভ হবে না। আপনি ওর বাপের পারিবারিক বন্ধু। তাই এ সমস্ত বললাম। অন্য কাউকে তো বলাও যায় না। আসল কথাটা কি জানেন, কুন্তলা কি চায়, সে নিজেও জানে না। বলেছিল, সময় কাটাতে চায় না,

একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও। তার ব্যবস্থাও হল। মিত্তিরদা নিজের অফিসে ওকে জায়গা করে দিলেন। ভাবলাম, এবার বুঝি সব দিকে সামলালো। কিন্তু কোথায় কি? সে একরোখা স্বভাব যথা নিয়মে বজায় আছে।

খুব খারাপ লাগছে আমার: কুন্তলাকে তো সেই ফ্রকপরা অবস্থা থেকে দেখছি। তার এই পরিবর্তন ভাবা যায় না। যা হোক, আমি একবার—

ওর সঙ্গে কথা বলে দেখবেন?

হ্যাঁ।

ম্লান হেসে সুদীপ্ত বলল, কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না! ঠিক আছে। আপনি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখুন।

পোর্টিকোতে ট্যাক্সি এসে থামল।

ট্যাক্সি থেকে নামল কুন্তলা।

বয়স আটাশ-উনত্রিশের কম হবে না। তবে যৌবনকে সে ভাল ভাবেই ধরে রাখতে পেরেছে। দেখে তেইশের বেশী মনে হয় না। সুশ্রী মুখের সঙ্গে সারা শরীরে কেমন আভিজাত্য মেশান। গায়ের রং ফরসা ঘেঁসা। দীর্ঘাঙ্গী।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সে বারান্দায় উঠে এল। কয়েক পা এগিয়ে যাবার পরই থমকে দাঁড়াল। দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে অদূরে দাঁড়িয়ে কথোপকথনরত দু'জনের উপর। ভ্রূ কুঁচকে উঠেই সরল হয়ে এল। সে এগিয়ে গেল দু'জনের দিকে।

সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে তরল গলায় কুন্তলা বলল, তুমি এখানে? ওদিকে তোমার অপেক্ষায় এতক্ষণ আমি বাড়িতে বসেছিলাম।

—সরি—

—দায়সারা কথাবার্তা আমার ভাল লাগে না। অফিস থেকে সোজা এখানে চলে আসবে, ফোনে একথা আমায় জানিয়ে দিলে পারতে।

—জানাতে চেষ্টা করিনি একথা তুমি জানলে কি ভাবে?

—তার মানে—

মৃদু হেসে সুদীপ্ত বলল, কলকাতার টেলিফোন ব্যবস্থা ক্রমেই কি রকম শোচনীয় হয়ে উঠেছে দেখছো তো। কয়েকবার ডায়েল করেও কানেকশন পাইনি। তারপর ভাবলাম, আমার দেরি দেখে নিশ্চয় তুমি এখানে এসে পড়বে।

এবার নির্মল সোম কথা বললেন।

—কেমন আছো কুন্তলা ?

কুন্তলার মুখে হাসির ঝিলিক খেলল।

—চলে যাচ্ছে। আপনি ভাল আছেন সোমকাকা ?

—মোটামুটি ভাল।

—দেখে শুনে মনে হচ্ছে আজকাল আপনি আমাকে বয়কট করেছেন কতদিন আমাদের দেখা হয়নি বলুন তো ?

—তা মাস ছয়েক তো বটেই। আসল কথাটা কি জান, কিছুদিন থেকে ভীষণ ব্যস্ত আছি। মাঝ থেকে হয়েছে কি, সকলেই আমাকে অসামাজিক ভাবতে আরম্ভ করেছে। আসছি একদিন তোমাদের ওখানে। কিছু দরকারী কথা আছে।

—দরকারী কথা !

—ভীষণ দরকারী।

—এখনই বলুন সোমকাকা। আগ্রহ আমি চাপতে পাচ্ছি না।

নির্মল সোম হেসে ফেললেন।

—এখনই নয়। তোমার যখন এত আগ্রহ তখন আজই-না হয় বলবো। খাওয়া দাওয়ার পর। চল, এবার যাওয়া যাক। ডিনারের সময় বোধহয় হয়ে এল।

দুজনকে নিয়ে সোম এগুলেন।

ড্রইংরুমে তখন দুভাগে কথাবার্তা চলছে।

রবীন দত্ত আর দানতোষ নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে কি সমস্ত আলোচনা চালাচ্ছেন। মান্টিলপিশের কাছের দুটো কোচ অধিকার করেছেন অমুতোষ আর শালিনী। সরস ভঙ্গীতে কথা বলছেন গৃহকর্তা। দু-আঙুলের ফাঁকে কর্কটিপ পুড়ে চলেছে।

অমুতোষ বলছিলেন, গত পাঁচ বছর ধরে ভাবছি মাস দুয়েক কমপ্লিট রেস্ট নেব। ওই সময়টুকু কাটাবো ইংলণ্ডে। তা আর হয়ে উঠছে না।

সবিস্ময়ে শালিনী বলল, অবসর কাটাতে একেবারে ইংলণ্ডে যাবেন ?

—এতে অবাক হবার মত কিছু আছে নাকি ?

—এতে অবাক হবার মত কিছু নেই বলছেন ! দু'মাস দূরের কথা, আমি পনেরো দিন সিমলা কি নৈনিতালে থাকার কথা ভাবতে পারিনা। অবশ্য আপনার কথা—মানে···টাকা থাকলে যে কোন ইচ্ছাই-হেলায় পূরণ করা যায়

—তা ঠিক। এব্যাপারে আমার কিছুটা শ্লাঘা আছে। পৈতৃক সূত্রে টাকা পাওয়া আর নিজের চেষ্টায় প্রচুর রোজগার করার মধ্যেকার পার্থক্যটা নিশ্চয় বোঝেন। ভাল কথা, আপনার সাগর পারে যেতে ইচ্ছে করে না?

শালিনী হাসল।

—বিলেত যাবার ইচ্ছে আমার ছোট বেলা থেকেই। কিন্তু ওই যে বললাম—সিমলা বা নৈনিতালে যার পনেরো দিন থাকার সামর্থ নেই তার বিলেত যাবার ইচ্ছে পূর্ণ হতে পারে না।

অনুতোষ কিছু বলার আগেই নির্মল সোম এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে কুন্তলা আর সুদীপ্ত।

সোম বললেন, প্রদীপকে দেখছি না?

—ডিনারের বিলি ব্যবস্থা করতে ওকে কিচেনে পাঠিয়েছি।

নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ চলতে লাগল এরপর।

ডিনার শেষ হল সাড়ে নটার কিছু পরে।

প্রতিটি কোর্সই ছিল উপাদেয়। অনুতোষের পাচকভাগ্য ভাল বলতে হবে। বেশ তৃপ্তি করেই সকলে খেয়েছেন। তবে আজকের পার্টিতে একটি বিষয় লক্ষণীয়—শালিনীর নাটকীয় উপস্থিতির দরুন কি না বোঝা যাচ্ছে না, অন্যান্য বারের মত এবার গল্প-গুজোব তেমন জমজমাট রূপ নিতে পারেনি। কেমন খাপছাড়া ভাব। আন্তরিক ভাবে সকলে যেন মিশতে পারছেন না। অবস্থাটা সকলেই অনুভব করছিলেন। কিন্তু কেউ এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রকাশ করলেন না। ডিনারের পর সকলে আবার ড্রইং রুমে এসে বসলেন। প্রথানুসারে গরম কোন পানীয় গ্রহণ করে বিদায় নেবেন।

সবে কফি পরিবেশিত হচ্ছে, ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। অনুতোষ উঠে গিয়ে রিসিভার তুললেন।

হ্যালো—মিত্র স্পিকিং—

অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল, 'মৃন্ময়ী উন্মাদ আশ্রম' থেকে বলছি। দুপুরে বারকয়েক চেষ্টা করে আপনাকে ধরতে পারি নি—এই অসময়ে বিরক্ত করতে হল, কিছু মনে করবেন না।

তাতে কি হয়েছে—কি ব্যাপার বলুন তো!

নিতান্ত অফিসিয়াল ব্যাপার বলে বলতে হচ্ছে, নইলে—

সঙ্কোচ করতে হবে না—যা বলবার পরিষ্কার করে বলুন—

আজ একুশ তারিখ হয়ে গেল—এখনও আপনার কাছ থেকে টাকাটা আমরা পাই নি।

অশুতোষের ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

হ্যালো—কথাটা মনে করিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ। কাল টাকা পেয়ে যাবেন—

উনি রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

ওদিকে—

ঘরের আরেক প্রান্তে সোফায় পাশাপাশি বসে আছেন নির্মল সোম আর কুন্তলা। নীচু গলায় কথা হচ্ছিল দু'জনের মধ্যে। খাওয়া দাওয়ার পরেই কুন্তলাকে নিয়ে এখানে এসে বসেছেন সোম।

কুন্তলা বলছিল, আপনাকে মিথ্যা বলব না সোমকাকা। আপনি যা শুনেছেন, সমস্ত বাজে।

কিন্তু মাত্র কিছুক্ষণ আগে সুদীপ্ত আমার কাছে দুঃখ করছিল।

করবেই, আসল কথাটা হল, ও আমাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। শুধু তাই না, বেহায়াপনার চূড়ান্তে পৌঁছে গেছে। অফিসের মেয়েটাকে এখানে আনবার কি দরকার ছিল, বলতে পারেন?

কাজটা অন্যায় হয়েছে, আমি স্বীকার করি। তবে···

এর মধ্যে কোন তবে নেই। আপনাদের জামাই চাইছে, তিতিবিরক্ত হয়ে আমি ডাইভোর্সে রাজী হয়ে যাই। তারপর ও বিয়ে করে ফেলে ওই অবাঙালী মেয়েটাকে।

দুঃখিত ভাবে সোম বললেন, সমস্ত কিছু তোমরা অত্যন্ত জটিল করে তুলেছ। তবু আমি বলব, এখনও সময় আছে। ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতিটা তোমরা খতিয়ে দেখ। দু'জনকে মনে রাখতে হবে, ব্যাপারটা ছেলেখেলা নয়।

কুন্তলা কিছু না বলে ম্লান হাসল।

সোম আবার বললেন, জল এতটা গড়িয়ে গেছে, কে জানত! কাল সকালেই তোমার বাবাকে সমস্ত কথা বলতে হবে।

এখন বলবেন না।

কিন্তু—

আর কিছুদিন যাক।

বেশ।

বলাবাহুল্য, তখন কফি পর্ব শেষ হওয়ার মুখে। প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে আসা কাপ দুটো দুজনে তুলে নিলেন। ঘড়ির কাঁটা তখন পৌনে এগারোটার নীচে নেই। অতিথিরা এবার বিদায় নেবেন। প্রথমে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল প্রদীপ। তারপর একে একে সকলে। বিদায় নেবার আগে সময়োচিত কথাবার্তা হতে লাগল অতিথিদের সঙ্গে গৃহকর্তার।

সুদীপ্ত কুন্তলাকে নিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, অনুতোষ বললেন, মিসেস মুখার্জি, কালকে কাজের চাপ একটু বেশী মনে আছে তো?

মৃদু হেসে কুন্তলা বলল, আছে। পি. এন সারোগীর সেটেলমেণ্টটা—

ঠিক আর দেরি করাব না। শুভরাত্রি।

গাড়ি বেরিয়ে গেল।

অনুতোষ ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলেন, অদূরে রবীন দত্ত আর দানতোষের মধ্যে কথা হচ্ছে।

রবীন, শোন এখানে—

রবীন ঝটিতে ভগ্নীপতির কাছে এসে দাঁড়ালেন: কিছু বলছেন?

—মেণ্টাল হসপিটালে গিয়েছিলে তোমার দিদির সঙ্গে দেখা করতে?

—হ্যাঁ।

—এ মাসের টাকাটা নিশ্চয় জমা করে এসেছ?

—করেছি তো—সেদিনই—

অনুতোষ ফেটে পড়লেন: মিথ্যেবাদী! টাকা তুমি জমা করো নি। কিছুক্ষণ আগে ফোন করে সেকথা জানিয়েছেন ওঁরা। আমার ধারণা ছিল না তুমি এত বড় স্কাউণ্ড্রেল। যখন প্রয়োজন হচ্ছে টাকা দিচ্ছি। তারপরও—

রবীন দত্ত ভয়ে ভাবনায় একেবারে সিঁটিয়ে উঠলেন। বললেন তোতলাতে তোতলাতে, ভীষণ প্রয়োজন পড়ায় টাকাটা আমি খরচ করে ফেলেছিলাম। দু'একদিনের মধ্যেই অবশ্য জমা করে দিতাম। মানে…

—থামো! আমার কথাটা এবার কান খুলে শুনে রাখো—এ বাড়িতে আর ঢুকবে না। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হল।

গাড়িতে একটা কথাও হল না। কুন্তলা গম্ভীর, সুদীপ্ত অন্যমনস্ক।

পার্টি শেষ হয়ে যাবার পর শালিনী ট্যাক্সি করে ফিরে গেছে নিজের

আস্তানায়। সুদীপ্তর সঙ্গে কোন কথা হয়নি। এই রকম ব্যবস্থা বোধহয় আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। দূরত্বের আয়ু ক্রমেই কমে আসছিল। গড়িয়াহাট রোডে—নিজেদের ফ্ল্যাটে যখন ওরা পৌঁছল, তখন সাড়ে এগারোটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি আছে।

গ্যারেজে গাড়ি বন্ধ করে উপরে উঠে আসার পর সুদীপ্ত দেখল, কুন্তলা কাপড় বদলায় নি। শোবার ঘরে বড় জানালাটার সামনে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ। শ্রান্ত শরীরটাকে এখনই ঢেলে দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। সুদীপ্ত কিছু না বলে জামা-প্যাণ্ট বদলাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল।

সোমকাকাকে তুমি অনেক আজেবাজে কথা বলেছ। কেন বলেছ জানতে পারি কি?

উনি জানতে চাইছিলেন—সুদীপ্ত বলল, আমি শুধু তোমার স্বভাবের কথা বলেছি।

এমন ভাবে বলেছ, যাতে সমস্ত দোষটা আমার ঘাড়ে চাপে। তুমি যদি এতই দুধে ধোওয়া, তবে অফিস সেক্রেটারিকে বেহায়ার মত ওখানে নিয়ে গিয়েছিলে কেন?

—কার কথা বলছ?

বিদ্রূপের হাসিতে কুন্তলার ঠোঁট বেঁকে উঠল: ওভাবে পাশ কাটানো যায় না। ওই অবাঙালি মেয়েটা যে তোমার অফিস সেক্রেটারি, প্রদীপবাবুর মুখে তা শুনলাম। ওখানে ওকে নিয়ে যেতে পারলে? ছি-ছি! শালীনতা বলে কি কিছুই তোমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই?

তুমি নিজের দিকে তাকিয়ে কথা বল।

কেন, আমি কি করেছি?

বিয়ের আগে তুমি একজনের প্রেমে পড়েছিলে মনে আছে?

বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে কুন্তলা বলল, আছে। বয়স কালে অনেক মেয়েই ওরকম প্রেমে পড়ে। তাছাড়া কথাটা তো তোমার কাছে লুকিয়ে যাই নি। বিয়ের পর একটু সহজ হয়ে উঠতেই তোমাকে বলেছিলাম সমস্ত কিছু।

বলেছিলে! কিন্তু ইদানিং সেই প্রাক্তন প্রেমিকটির সঙ্গে যে তোমার মাঝে মধ্যে দেখা হচ্ছে, তা বল নি।

ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ নয় বলেই বলি নি। এত কথায় কাজ নেই। ফাইনালি বল তো, আসলে তুমি চাইছটা কি?

—আমি ?

সুদীপ্ত এতক্ষণ পরে সিগারেট ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, এটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এত তাড়াতাড়ি আমরা দু'জনে দু'জনের দিক থেকে দূরে সরে গেছি। এর জন্য দায়ী অবশ্যই আমি নই। তুমি স্বীকার করো বা না করো, তাতে কিছু যায় আসে না। তবে এটা ঠিক, তোমাকে আন্তরিকভাবে পাবার জন্য আমি সব রকম চেষ্টা করেছি। তোমার যে কোন অনুরোধ রাখার জন্য তৎপর থেকেছি। আমি যা রোজগার করি, তাতে হাফ ডজন স্ত্রী পুষতে পারি। তবু তুমি যখন বললে, 'দুপুরে একলা চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগে না। একটা চাকরি-টাকরি পেলে ভাল হয়', তোমার ইচ্ছেতে বাধা দিই নি। যদিও আমার স্ত্রী চাকরি করুক, আমি তা মোটেই চাই নি। মিত্তিরদা নিজের অফিসের জন্য একজন মহিলা অ্যাসিস্টেন্ট খুঁজছিলেন আমি ওখানে তোমার ব্যবস্থা করে দিলাম। এত কাণ্ডর পরও শেষমেষ দাঁড়ালটা কি? তুমি দূরে সরে যেতে লাগলে। তোমার প্রাক্তন প্রেমিক ঘোরাফেরা করতে আরম্ভ করল। মনে রাখতে হবে আমার একটা ধৈর্যের সীমা আছে। তবুও কিন্তু আমি এমন কিছু করি নি, বা বলি নি, যাতে তুমি আঘাত পাও। নিজেকে শুধু গুটিয়ে নিয়েছি। মনের খোরাক সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি অন্যত্র। এতে আমার অপরাধটা কোথায়? এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি দাঁড়াবে। আমরা দু'জনেই অনুভব করছি, এইভাবে বেশি দিন চলতে পারে না। প্রাণহীন সম্পর্কের বোঝা আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। কাজেই যা হোক একটা ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, ততই ভাল।

বেশ সহজভাবে কুন্তলা বলল, তোমার বক্তৃতা মোটামুটি ভালই হয়েছে বলতে হবে। তবে পুরুষদের যা স্বভাব—মেয়েদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েই খালাস! ছাড়াছাড়ির জন্য তুমি বড় বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। এই ব্যস্ততার কারণটাও অবশ্য বুঝি। অফিস সেক্রেটারিকে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ঘরে আনতে চাও। এই মুহূর্তে আমি কোন মতামত দিতে পারব না। কাল বিকেলে বাবার সঙ্গে দেখা করছি। তারপর যা হয় হবে।

একটু থেমে বলল, রাত অনেক হল। তুমি নিজের ঘরে গেলে খুশী হব। এবার আমি ঘুমিয়ে পড়তে চাই।

সুদীপ্ত দরজার দিকে এগোল।

অনুতোষের বাড়ি থেকে বেরিয়েই শালিনী ট্যাক্সি পেয়ে গেল। ও থাকে

বাবা-মা'র সঙ্গে ক্রিক রো'র একটা ফ্ল্যাটে। বাবা একটা আয়রণ ফাউণ্ড্রিতে মোটামুটি ভাল কাজ করেন। ট্যাক্সি গতি নেবার পর শালিনী পিছনের সিটে একটু হেলে বসল। নানা চিন্তা ওর মনে ভিড় করে আসছে।

তার ধারণা ছিল, কুন্তলা ওই পার্টিতে উপস্থিত থাকবে না। ধারণা করে নেওয়ার মধ্যে কোন অসঙ্গতি ছিল না। স্ত্রী উপস্থিত থাকবে জেনেও সুদীপ্ত তাকে ওখানে নিয়ে যাবে, ভাবা যায় না। কুন্তলাকে দেখে তাই শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। ভাগ্যক্রমে কোন বিশ্রী ঘটনার অবতারণা হয়নি। এই প্রথমবার সে দেখল কুন্তলাকে। ভাবতেই পারে নি, মহিলা দেখতে এত ভাল হতে পারেন।

এই ধরনের নানা কথা ভাবতে ভাবতে গন্তব্যস্থল এসে পড়ল। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের পিছন দিকের ফুটপাথ ঘেঁষে গাড়ি থামাতে বলল ড্রাইভারকে। এখান থেকে তাদের ফ্ল্যাটের দূরত্ব গজ পঁচিশেকের বেশী হবে না। অযথা গলির মধ্যে ট্যাক্সি ঢুকিয়ে লাভ কি? ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামল শালিনী।

কয়েক পা সবে এগিয়েছে—

এই যে—

চমকে মুখ ফেরাতেই বিরক্তিতে মন ভরে উঠল। মাত্র কয়েক হাত দূরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিলীপ লালোয়ানী। সে একা নেই। পার্কের রেলিং ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরেকজন। মস্ত বড় ব্যবসাদারের ছেলে দিলীপ। পাড়াতেই থাকে। কিছুদিন থেকে শালিনীর পিছনে ঘুরঘুর করছে।

অভিসার সেরে ফেরা হচ্ছে, বুঝি?

তীক্ষ্ণ গলায় শালিনী বলল, বড় বেশী সাহস দেখিয়ে ফেলেছেন। কাল সকালেই আমি আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করব।

স্বচ্ছন্দে। আমিও তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করছি। একজন বিবাহিত লোকের সঙ্গে তুমি কি সমস্ত করে বেড়াচ্ছ, তাঁকে বোধহয় বলা দরকার।

শালিনী উত্তর না দিয়ে এগোল।

দিলীপ পথরোধ করে দাঁড়াল এবার।

এত সমস্ত ঝামেলার মধ্যে যাবার দরকার কি? আমার অনেক টাকা আছে, তা তুমি জান। দু'জনের দিন রঙিন হয়ে ওঠে যাতে, সেই চেষ্টা দেখাই ভাল নয় কি?

—সরে দাঁড়ান!

—যদি না দাঁড়াই?

দ্বিতীয়জন এবার মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছে। শালিনী আর সময় নষ্ট করল না। সজোরে এক চড় কষিয়ে দিল দিলীপের গালে, তারপর পাশ কাটিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল। নিজেদের ফ্ল্যাটে যখন পৌছল, তখন দারুণ হাঁপাচ্ছে। দরজা খুলে দিয়েছিলেন মা। মেয়ের অবস্থা দেখে অবাক না হয়ে পারলেন না।

—কি হয়েছে?

—কি আবার হবে! তাড়াতাড়ি হেঁটে এসেছি বলে হাঁপাচ্ছি।

—ফিরতে তোমার এত দেরি হল আজ?

—একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম মা। কাল সকালে সব কথা বলব।

ঠিক এই সময় ফোন ঝনঝনিয়ে উঠল।

মা এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললেন। সাড়া দেবার পরই রিসিভার কানের কাছ থেকে সরিয়ে এনে বললেন, লিনী, ধর। তোমাকে এক ভদ্রলোক চাইছেন।

—আমাকে!

শালিনী অবাক হল।

—তোমার নামই তো করলেন ভদ্রলোক।

এতরাত্রে আবার কে ফোন করছে !!!

বিস্মিত শালিনী ফোন ষ্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

—হ্যালো—

ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল, অনুতোষ মিত্র কথা বলছি। অসময়ে ফোন করার জন্য নিশ্চয় অবাক হচ্ছেন; বিছানা থেকে উঠে আসতে হল বলে আমি দুঃখিত।

—শুতে এখনও যাইনি। এই মাত্র ফিরেছি। বলুন মিঃ মিত্র—

শালিনী কথা বলতে বলতেই ভাবছিল, লাইনের অপর প্রান্তে যে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষটি বসে আছেন, যাঁর সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আলাপ হয়েছে—তিনি এই অসময়ে ফোনে কি এমন কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন?

অনুতোষের গলা শোনা গেল, ইংল্যাণ্ড যাওয়ার আগ্রহ আপনার কি সত্যি প্রবল?

—নিশ্চয়। বললাম তো সঙ্গতির অভাবে—

—ধরুন, আমি যদি আপনাকে সুযোগ দিই—

—আপনি! কিন্তু—

—ইংল্যাণ্ডে আমার একজন সেক্রেটারির দরকার হতে পারে। আপনি কাল সকালেই চলে আসুন আমার এখানে। বিস্তারিত ভাবে কথাবার্তা হবে।

সকাল? মানে……কটায়?

—ছটা। ওই কথাই রইল। এবার ছাড়ছি। শুভরাত্রি।

অনুতোষ লাইন কেটে দিলেন।

দাঁত দিয়ে তলাকার ঠোঁট কামড়ে ধরে কয়েক মিনিট একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল শালিনী। অল্পক্ষণের আলাপের পর এরকম লোভনীয় প্রস্তাব কেউ-কাউকে দেয় বলে বড় একটা শোনা যায় না। বড়লোকদের অবশ্য নানা রকম খেয়াল থাকে।

শালিনী আবার রিসিভার তুলে নিল।

নম্বর ডায়েল করল। ওধারে রিং হয়ে চলেছে।

বেশ কয়েকবার রিং হবার পর সাড়া পাওয়া গেল, সুদীপ্ত মুখার্জি স্পিকিং—

—আমি শালিনী—

—কি ব্যাপার? বল—

ওদিকে—

দানতোষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড তখন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে ছুটে চলেছে। রবীন দত্ত বসে আছেন কারওনারের পাশে। ড্যাসবোর্ডের স্তিমিত আলো দুজনের মুখকে ম্লান করে রেখেছে। নির্মল সোম দক্ষিণে থাকেন। গাড়ি মেরামত করতে পাঠাবার দরুন ট্যাক্সিতে করে পার্টি রক্ষা করতে এসেছিলেন। ফেরার সময় প্রদীপ তাঁকে নিজের গাড়িতে নিয়ে গেছে।

—আপনাকে খুবই চুপচাপ দেখছি?

রবীন দত্ত কাঁধ নাচালেন।

—মনের অবস্থা ভাল নেই।

—কেন?

—ভেবেছিলাম আপনি কারণটা আঁচ করতে পেরেছেন।

—বুঝলাম। এরজন্য দাদাই দায়ী। একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে উনি আপনাকে কি সমস্ত বলছিলেন দেখলাম।

অপমানসূচক কিছু কি ?

—উনি কি ধরনের লোক আপনি ভালই জানেন।

—ব্যাপারটা কি ?

—মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। আমারও হয়েছিল। তারই জের টেনে মুখে যা এল তাই বলে গেলেন। শেষে জানিয়ে দিয়েছেন আমি যেন ওর বাড়িতে আর কোন দিন না ঢুকি।

—বলেন কি !

দানতোষ বিস্ময় দমন করতে পারলেন না।

—ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে। ভারী অন্যায়। বড় ভাই হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, লোকটার মাথা ক্রমেই বিগড়ে যাচ্ছে।

রবীন দত্ত ম্লান হাসলেন।

—আপনি ভুল করছেন। মানে হিসাব ভুল করছেন আর কি। ওঁর মাথা বেশ পরিস্কারই আছে। আসল কথাটা হল, অসম্ভব অহঙ্কারী হয়ে পড়েছেন। এন্তার রোজগার করে এমন লোক বহু আছে। তাই বলে এত বাড়াবাড়ি সকলেই করে না।

—আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন। আমার ব্যাপারটাই ধরুন না। ওঁর কি উচিৎ হয়েছে ওই ভাবে বিদ্রূপ করে কথা বলাটা ?

—কি হয়েছিল ?

—আপনি তো জানেন ব্যবসায় কেমন টাল যাচ্ছে। কিছু টাকা চাইলাম। এমন একটা পোজ করলেন, যাতে—

—জানি—জানি, আপনার দাদা হতে পারেন, আমারও তো ভগ্নীপতি। হাড়ে হাড়ে জানি লোকটাকে। কয়েকদিন আগে বলছিলেন, সস্তায় একটা কাঠের লট পাচ্ছেন। তারই জন্য বোধহয়—

—ঠিকই ধরেছেন। তার জন্যেই তো চাইলাম টাকাটা। শুনেই দাদা এমন গার্জেন গিরি আরম্ভ করলেন যে বলবার নয়।

রবীন দত্ত সিগারেট ধরালেন।

আমার পরামর্শ নিন। মিথ্যে সময় নষ্ট না করে অন্যত্র চেষ্টা করুন। আপনার দাদা আশায় আশায় রাখবেন—টাকা দেবেন না।

আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি। যে কোন উপায়ে দাদার কাছ থেকে টাকাটা আদায় করবই।

রবীন দত্ত কিছু না বলে মুখ তুললেন।

দানতোষ তখন গাড়িটা গ্রে স্ট্রীটের দিকে মোড় ঘোরাচ্ছেন।

স্বাভাবিক নিয়মে এ্যাটর্নি অফিস হাইকোর্ট পাড়ায় হওয়া উচিত। অনুতোষ কিন্তু এধারা মানেন নি। অফিস করেছেন চৌরঙ্গী টেরেসে। মোটামুটি একটা হলকে সুদৃশ্য প্লাইউডের সাহায্যে কয়েক ভাগ করা হয়েছে। সুচারু ভাবে সাজানো। প্রতিদিন বেলা সাড়ে ন'টার সময় অফিসের দরজা খোলে। অনুতোষ অবশ্য তখন আসেন না। অফিসের দরজা খোলে হয় কুন্তলা, নয় প্রদীপ। দুজনের কাছেই চাবি আছে। আরেকজন কর্মী অবশ্য আছেন। অরবিন্দবাবু। মধ্যবয়স্ক, গোবেচারা লোক। একজন বেয়ারা অবশ্য আছে।

কুন্তলা আজ একটু তাড়াতাড়িই এসে পড়ল।

এখন সবে ন'টা দশ। অফিসের দরজা খুলে গিয়ে বসল নিজের ছোট পার্টিসান দেওয়া ঘরটায়। মন-মেজাজ এখনও তার ভাল নেই। সুদীপ্ত যে প্রথম শ্রেণীর স্বার্থপর, গত রাত্রে সে তা আরেকবার প্রমাণ করছে। নানা চিন্তায় সে রাতভোর একরকম না ঘুমিয়েই কাটিয়েছে। কুন্তলাকে তাই বোধহয় কিছুটা বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

ফাইলপত্র ঠিকঠাক করতে করতে মিনিট দশেক কাটল।

বেয়ারা এসে পড়ল। বয়স বেশী নয়। বিহারের সাহাবাদ না কোথায় বাড়ি। ঝাড়াপোঁছার কাজে সে লেগে গেল। অরবিন্দবাবু এলেন এবার। নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। বেয়ারাকে বললেন এক গেলাস জল দিতে। কুন্তলা আড়মোড়া ভেঙে জানালার দিকে তাকাল। নিজের চেয়ারে বসেই রাস্তার অনেকখানি দেখা যায়।

ওদিকে অফিসের বাইরে তখন গাড়ি থেকে নামছে প্রদীপ। ওকে ছুটোর সময় পারিবারিক প্রয়োজনে বর্ধমান যেতে হবে। এই সময়টুকুর মধ্যেই ও জরুরি কাজগুলো গুছিয়ে নিতে চায়। অনুতোষের সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার। মনে হয়, উনি এগারোটার আগে আসবেন না। প্রদীপ অরবিন্দবাবুর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

চশমা ঠিক করে নিয়ে অরবিন্দ বললেন, কিছু বলবেন?

বিপুল দস্তিদারের ফাইলটা কি কাছাকাছি আছে?

আলমারিতে রয়েছে।

বার করুন তো!

অরবিন্দ চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। প্রদীপ কুন্তলার খুপরির দিকে এগোল। অরবিন্দবাবু ফাইলটা আনুন, ও ততক্ষণে মিসেস মুখার্জির সঙ্গে গুটিকয়েক কথা সেরে নেবে। প্লাইউডের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই বিস্ময়ের মুখোমুখি হল। কুন্তলা ভীষণ উত্তেজিত ভাবে ফোনে কথা বলছিল।

কি বললেন?···মারা গেছেন!! কখন···আঁা···হ্যালো···কে আপনি? নাম বলছেন না কেন···হ্যালো···হ্যালো······

দ্রুতগতিতে প্রদীপ ওর কাছে গিয়ে পৌছল।

রিসিভার নামিয়ে রেখে কুন্তলা উঠে দাঁড়িয়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম তার মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে ক্রমেই। প্রদীপও দারুণ উত্তেজনা বোধ করছেন। কে মারা গেল?

কি হয়েছে মিসেস মুখার্জি?

কাঁপা গলায় কুন্তলা বলল, মিস্টার মিত্র মারা গেছেন—!

খবর দিল কে?

সেটাই তো বুঝতে পারছি না। খবরটা দিয়েই লাইন কেটে দিল

প্রদীপ চিন্তিত গলায় বলল, কেউ রসিকতা করে নি তো! কলকাতায় এমন ঘটনা তো অনেক ঘটেছে। আজে-বাজে ফোনে কেউ-কেউ আনন্দ পায়।

তাহলেও এমন বিশ্রী সংবাদ যখন পাওয়া গেছে, একবার খোঁজ নেওয়া দরকার।

অরবিন্দবাবু দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দ্রুত গলায় বললেন, উনি ঠিকই বলছেন, ওখানে গিয়ে একবার দেখা দরকার। হাজার হলেও ব্যাপারটা— আমার খুব ভাল ঠেকছে না।

বেশ। মিসেস মুখার্জি, চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক। আমার গাড়ি আছে।

মিনিট দশেকের মধ্যে দুজনে অনুতোষ মিত্রর বাড়িতে গিয়ে পৌছল। চৌরঙ্গী টেরেস থেকে শেক্সপীয়র সরণীর দূরত্ব কতটুকুই বা। কয়েকবার কলিংবেল পুস করার পরও কেউ সাড়া দিল না। ব্যাপার কি? চাকর দুজন গেল কোথায়? কি করবে এবার ভাবতে ভাবতেই দরজায় হাত রাখল প্রদীপ। পাল্লা ধীরে ধীরে সরে গেল। আশ্চর্য কাণ্ড! দরজায় ভেতর থেকে ছিটকিনি পর্যন্ত দেওয়া নেই!

কুন্তলা আর প্রদীপ ভেতরে ঢুকল

অমুতোষ দোতলায় থাকেন ওরা জানে। সিঁড়ি বেয়ে দুজনে ওপরে উঠে গেল। পরিপূর্ণ স্তব্ধতা বিরাজ করছে চারধারে। এমন তো হবার কথা নয়। পর পর দু'খানা ঘর সম্পূর্ণ খালি। তৃতীয় ঘরখানার দরজা ভেজানো। প্রদীপ ঠেলতেই খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কুন্তলার গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

কার্পেটের ওপর অমুতোষ হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন। পরণে ড্রেসিং গাউন আর স্লিপিং সাজাশ। মুখ একপাশে হেলে পড়েছে। চোখ নিমীলিত। প্রদীপ ছুটে গিয়ে তাঁর দেহ পরীক্ষা করল। যদি· ·স ডাক্তার নয়, তবু তার বুঝতে অসুবিধা হল না অমুতোষ মারা গেছেন। কুন্ত... দূর এগিয়ে আসে নি। টেবিলের পাশের চেয়ারটায় বসে পড়েছে। ... ঝিমঝিম করছে বোধহয়। ওর আর কিছু বুঝতে বাকি ছিল না। তবুও প্রশ্ন করল, কি দেখলেন?

প্রদীপ এগিয়ে আসতে আসতে বলল, মারা গেছেন।

তবুও একজন ডাক্তারকে—

না আমরা কাউকে কিছু জানাব না। চলুন, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি।

কেন বলুন তো?

ওঁর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। দেখছেন না, সারা শরীর কেমন সবুজ হয়ে উঠেছে। শরীরে বিষ না ঢুকলে এমন হয় না।

আপনি বলতে চাইছেন—

আত্মহত্যা করেছেন কি খুন হয়েছেন বলা শক্ত। যদি সত্যিই খুন হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা এখানে এসেছিলাম পুলিশ জানতে পারলে আর দেখতে হবে না। দুজনকে নিয়ে এমন টানাটানি করবে যে জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে।

প্রদীপ কথা বলছিল আর রুমাল দিয়ে এটা-ওটা মুছছিল। ওর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদের হাতের ছাপ মুছে ফেলা। যাতে পরে কোন ক্রমেই ওদের উপস্থিতি ধরতে পারা না যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুজনে বেরিয়ে এল বাইরে। গাড়িতে যখন বসেছে, কুন্তলা তখন কাঁপছে। এখন কি বলা উচিত প্রদীপ ভেবে পাচ্ছে না। অকল্পনীয় এক ঘটনা ঘটে গেছে।

গাড়ি গতি নেবার পর কুন্তলা বলল, উনি কি ওই ভাবে ওখানে পড়ে থাকবেন?

আমরা কি করতে পারি বলুন!

কোন পাবলিক ফোন থেকে ওঁর ভাইকে খবরটা দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য কে ফোন করছে তা জানানো হবে না।

ওঁর ভাইয়ের ফোন নম্বর আমি জানি না। তবে খবর যদি দিতেই হয়, পুলিশকে দেওয়া ভাল। উনি খুনই হয়ে থাকুন বা আত্মহত্যাই করে থাকুন, পুলিশকে তো ঘটনাস্থলে পৌছতেই হবে।

আমি কিন্তু অন্য একটা কথা ভাবছি—

কি কথা ?

চাকর ঢুকে গেল কোথায় ? ওই দেখুন—

প্রদীপ থেমে যেতেই সচকিত কুন্তলা দেখল, শালিনী দ্রুত পায়ে ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলেছে। সে ওদের দেখতে পায় নি। প্রদীপ গাড়ির গতি মন্থর করে দিল। কুন্তলা ঝুঁকে পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল, শালিনী রাস্তা পার হয়ে অমৃতোষের বাড়ির মধ্যে ঢুকছে। আজকের দিনটাই অদ্ভুত। একের পর এক বিস্ময় দেখা দিচ্ছে।

কি হল ?

কুন্তলা সোজা হয়ে বসে বলল, মিস্টার মিত্রর বাড়িতে ওকে ঢুকতে দেখলাম।

ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে। গতকাল সন্ধ্যার আগে তো মহিলার সঙ্গে মিস্টার মিত্রর আলাপ পর্যন্ত ছিল না।

আমারও অদ্ভুত লাগছে। আমরা এখন চলেছি কোথায় ?

অফিস।

অরবিন্দবাবু কিন্তু জানেন আমরা কোথায় গিয়েছিলাম।

চিন্তিত গলায় প্রদীপ বলল, এই অস্বস্তিবোধটা আমারও রয়েছে। তবে কি জানেন, মনে হচ্ছে অরবিন্দবাবুকে আমি ম্যানেজ করে ফেলতে পারব।

কুন্তলা আর কিছু বলল না।

কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় বাসব লালবাজারের গেট অতিক্রম করল।

একনাগাড়ে পাঁচ বছর ঠিক ঠিক সময় দেবার পর সকাল ন'টা বাজতে দশ মিনিট আগে ওর সি-মাষ্টার নিজের গতি স্তব্ধ করে ফেলল। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল বাসবের। এই দামি ঘড়িটার ওপর তার বিশেষ মমত্ববোধ আছে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে, একটু বিশ্রাম নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিল "ফেবার

লিউবা'র উদ্দেশে। ঘড়িটা ওখানে জমা দিয়ে রাস্তায় নামতেই মনে হল, একবার লালবাজারে ঘুরে গেলে মন্দ হয় না।

পুরন্দর সামন্তকে তাঁর নিজের ঘরেই পাওয়া গেল। মহা সোরগোল তুলে তিনি বাসবকে অভ্যর্থনা জানালেন।

কি ব্যাপার মশাই, মাস তিনেক দেখা নেই! বসুন, বসুন। এভাবে ডুব মারার কোন মানে হয়? কলকাতার বাইরে-টাইরে গেছিলেন নাকি?

এখানেই ছিলাম।—বাসব পকেট থেকে পাউচ ইত্যাদি বার করে হাসল: আসল ব্যাপারটা কি জানেন মিস্টার সামন্ত, ইদানিং হাতে কোন কেস আসে নি। আপনারা আবার কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে না পড়লে এই অধমের খোঁজ-টোজ নেন না। তাই দেখা সাক্ষাৎ হয়নি আর কি!

সামন্ত হেসে ফেললেন: ভারি গুছিয়ে কথা বলেন কিন্তু। যাক, একটা মনের মত কথা বলি। রহস্যের মুখোমুখি কিছুদিন না হয়ে হাঁপিয়ে উঠেছেন নিশ্চয়? এসে পড়ে ভালই করেছেন। আমি আপনাকে এবার একটা রহস্য উপহার দেব।

ঘটনাটা কি?

গতকাল স্থানীয় থানা থেকে কেসটা আমাদের হাতে এসেছে। ওপর থেকে জোর তাগাদা পাচ্ছি নিহত ব্যক্তি কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের বড়কর্তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আমাদের কমিশনার স্বাভাবিক কারণেই খুব বিচলিত।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, বুঝলাম। এবার ঘটনাটা ব্যক্ত করুন।

পরশু বেলা এগারোটার কিছু পরে থানায় ফোন করে জানায়, শেকস্‌পীয়র সরণীর অমুক নম্বর বাড়িতে একজন মরে পড়ে আছেন। আপনারা শিগগির যান। সংশ্লিষ্ট ইন্সপেক্টর এই উড়ো ফোনের ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে না পারলেও, নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছোন। দেখলেন, সত্যি একজন মরে পড়ে আছেন। বাড়িতে তখন কেউ ছিল না। মৃত ব্যক্তির পরিচয় পেতেও বিশেষ অসুবিধা হয়নি। তিনি বিখ্যাত এ্যাটর্নি অমুতোষ মিত্র।

তারপর?

বিকেলের দিকে আমরা তদন্তে নামলাম। মিত্রর দুজন আত্মীয়ের সন্ধান পাওয়া গেল। ভাই আর শালা। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, গত সন্ধ্যায় ও-বাড়িতে একটা পার্টি হয়ে গেছে। পার্টি থেকে ওঁরা দশটার কিছু পরে

যে যার বাড়ি ফিরে গেছেন—আর কিছু জানেন না। পার্টিতে যাঁরা উপস্থিত ছিল, তাঁদের ঠিকানা সংগ্রহ করেছি। এই হল ব্যাপার।

অশুতোষ মিত্রর আর কোন আত্মীয় নেই?

আছে। ছেলে বিলেতে ডাক্তারী পড়ছে। স্ত্রী উন্মাদ আশ্রমে।

চমৎকার। ধনী ব্যক্তি বুঝতেই পারছি। দু-চারজন বয়-বাবুর্চি থাকার কথা। বললেন না, বাড়ি একেবারে খালি ছিল?

ঠিক তাই। খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারা গেছে, দুজন বয় আর বাবুর্চি আছে। আগের রাত্রে পার্টি শেষ হবার পর তাদের ছুটি দিয়েছিলেন মিত্র। বলেছিলেন, পরের দিন বিকেলে এলেই চলবে। দুপুরের খাওয়া উনি হোটেলে সেরে নেবেন।

হুঁ। উড়ো টেলিফোনটা কোথা থেকে এসেছিল, খোঁজ নেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ, একটা পাবলিক বুথ থেকে।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন?

পেয়েছি কিছুক্ষণ আগে। সকাল ছ'টা থেকে আটটার মধ্যে মারা গেছেন ভদ্রলোক। সাপের বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। টিপয়ের ওপর রাখা পেয়ালাতে যে অর্ধেক কফি ছিল, পরীক্ষা করে জানা গেছে ওতে বিষ মেশানো রয়েছে। এ ছাড়া—

বলুন?

মাথার পিছন দিকে একটা আঘাত আছে। লাঠি বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। আঘাত অবশ্য গুরুতর নয়।

কথা শেষ করে সামন্ত সিগারেট ধরালেন।

বাসব অন্যমনস্ক ভাবে পেপার ওয়েটের দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছু বুঝতে পারলেন?

মাথা ঝাঁকিয়ে বাসব বলল, এত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়। তবে দুটো ব্যাপার আমার মনে খটকা জাগাচ্ছে। এক, বয়-বাবুর্চিকে ওইভাবে ছুটি দেওয়ার অর্থ কি। শুধু মাত্র কিছুক্ষণ একলা থাকতে চান, এই কারণেই ব্যাপারটা ঘটেছে বলে আমার মনে হয় না। দুই, পেয়ালায় অর্ধেক কফি ছিল। এর অর্থ হল, বিষ মেশান অর্ধেক কফি উনি খেয়ে ফেলেছিলেন। মৃত্যুর পক্ষে ওই যথেষ্ট। মাথায় আঘাত করার অর্থ কি? এগিয়ে যাওয়ার মুখেই এরকম দু-চারটে সমস্যা রয়েছে যা হোক, আপনি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন নাকি?

বিকেলেই যাবার কথা। সময় হয়ে এসেছে। পার্টিতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের ডেকেছি। আপনি এসে পড়ায় ভালই হল। চলুন, সকলকে বাজিয়ে টাজিয়ে দেখে নিতে পারবেন। অনেক দিন নিষ্কর্মা বসে আছেন। মাথার মধ্যেকার গ্রে ম্যাটার বোধহয় শুকিয়ে গেছে। নরম করে নেওয়া দরকার তো?

বটেই তো!—বাসব হেসে ফেলল! চলুন।

বিরূপাক্ষ ঘোষাল সদর দরজার মুখেই দাঁড়িয়েছিলেন। স্থানীয় থানার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বলে কিনা জানা যায় না, গায়ে-গতরে একটু বেশী মাত্রায় ভাল। মুখের ওপর সব সময় শ্রাবণের আকাশ ভর করে রয়েছে। অতি বড় আপনজনও বোধহয় তাঁকে কোনদিন হাসতে দেখেন নি। লালবাজার থেকে হোমিসাইড স্কোয়াডের বড়কর্তা সদলবলে আসছেন। বলতে গেলে তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্যই উনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

মিনিট দশেকের মধ্যেই জীপ এসে থামল।

কোথায় দলবল? জীপ থেকে নামলেন পুরন্দর সামন্ত আর বাসব। বাসবকে দেখেই বিরূপাক্ষর মন খিঁচড়ে গেল। এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তদন্তে বেসরকারী লোক দালালি করুক, উনি একেবারেই পছন্দ করেন না। এই সঙ্গে ভেবে পান না, কর্তারা ওই লোকটিকে এত স্নেহের চোখে দেখেন কেন?

কেউ এসেছেন নাকি?

তটস্থ বিরূপাক্ষ বললেন, এখনও আসেন নি স্যার।

চাকর-বাকররা কোথায়?

ওরা রান্নাঘরের দিকে আছে, স্যার।

বাসব বলল, রান্নাঘরটা সীল করা আছে তো?

বিরূপাক্ষ উত্তর দিলেন না।

সামন্ত বললেন, উনি কি বললেন, শুনতে পেয়েছেন?

হ্যাঁ···মানে···রান্নাঘরটা সীল করার তো কোন দরকার ছিল না। মৃতদেহ যে পাওয়া গেছে, সেই ঘরখানা বন্ধ করিয়ে রেখেছি।

কাজটা আপনি ভাল করেন নি। বাসব বলল, কিছু সূত্র বোধহয় আমরা হারালাম। চলুন, মিস্টার সামন্ত ওপরে যাওয়া যাক। অমুতোষ মিত্রর ঘরখানা প্রথমে দেখা দরকার।

চলুন।

কয়েক পা এগিয়ে সামন্ত থামলেন।

চাবিটা দেখি।

একটা পেতলের চাবি ব্যস্তসমস্ত ভাবে পকেট থেকে বার করে দিলেন বিরূপাক্ষ।

আপনি এখানেই থাকুন। সকলে একে একে এসে পড়বেন এবার। ওঁদের ড্রইংরুমে বসাবেন। আমরা আসছি।

করিডর পার হতেই দোতলায় পৌঁছবার সিঁড়ি পাওয়া গেল। সিঁড়ি অতিক্রম করার পরই টানা বারান্দার মুখোমুখি হতে হল দুজনকে। একজন কনস্টেবল থাম ঠেসান দিয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। তাড়াতাড়ি সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে, কপালে হাত ঠেকিয়েই তটস্থ হয়ে দাঁড়াল। সামন্ত ওর হাতে চাবিটা দিয়ে দরজা খুলতে বললেন।

তালার ওপরকার সীল ভেঙে দরজাটা খুলল কনস্টেবল। বিশাল ঘরখানা কেমন যেন থমথম করছে। সোঁদা সোঁদা গন্ধ মনকে ভারি করে তুলল। জানালাগুলো খুলে দেওয়া হল। আসবারপত্র খুব বেশী নেই। জোড়া খাটের ওপর ডানলোপিলোর বিছানা। ছোট একটা রাইটিং টেবিল, তার সামনে গদি মোড়া চেয়ার, প্রমাণ সাইজের আর্মচেয়ারটা উত্তর দিকের জানালার সামনে রাখা, দুটো স্টিলের আলমারি ছাড়াও একটা ওয়ার্ডরোব রয়েছে।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বাসব বলল, হত্যাকারী এমন একজন লোক, যার প্রতি অনুতোষ মিত্রর বিশেষ আস্থা ছিল।

কিভাবে বুঝলেন?

নিজের শোবার ঘরে কেউ যাকে-তাকে আসবার অনুমতি দেয় না।

এমনও তো হতে পারে, হত্যাকারী অতর্কিতে ঢুকে পড়েছিল, তারপর—

কফি খাওয়ার একটা ব্যাপার আছে, আমাদের মনে রাখতে হবে। অতর্কিতে কেউ এসে পেয়ালায় বিষ মেশাতে পারে না। আমার মতে মিত্র আর হত্যাকারীর মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। কোন অসতর্ক মুহূর্তে—হয়তো, মিত্র একবার কোন জানালার কাছে গিয়েছিলেন বা ওয়ার্ডরোব কি স্টিল আলমারি খুলতে গিয়েছিলেন কোন কারণে—সেই সময় হত্যাকারী কফির সঙ্গে সাপের বিষ মিশিয়ে দেয়।

তবুও একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে, গৃহকর্তা নিজে কফি খেলেন, অথচ অতিথিকে অফার করলেন না, এটা যেন একটু কেমন কেমন—

বাসব একটু চুপ করে থাকার পর বলল, এর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, সেও কফি খেয়েছিল। কাজ মিটে যাবার পর, অর্থাৎ অনুতোষ মিত্র মারা যাবার পর, সে পেয়ালা পিরিচ ধুয়ে, যেখানে বাসনপত্র থাকে, সেখানে রেখে বাড়ি থেকে সরে পড়েছে। দুই, মিত্র তাকে কফি খেতে অনুরোধ করেছিলেন, সে সবিনয়ে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে।—ওধারে একটা দরজা রয়েছে? কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো?

সামন্ত এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুললেন।

ওধারটা একবার উঁকি মেরে দেখে নিয়ে বললেন, বাথরুম।

এবার আমাদের আলমারি খুলে দেখতে হবে। চাবি কার কাছে?

আমার কাছে। মিত্রর ড্রেসিং গাউনের পকেটে গোছাটা পাওয়া গিয়েছিল।

প্রথমে ওয়ার্ডরোব খোলা হল। একধারে হ্যাঙারে সারি সারি স্যুট ঝুলছে। তাকগুলোতেও সার্ট, পাজামা, স্লিপিং স্যুট ইত্যাদি ঠাসা। বুঝতে পারা যায়, গৃহস্বামী পোশাক রসিক ছিলেন। ঘাঁটাঘাঁটি করেও আর কিছু পাওয়া গেল না। প্রথম স্টিলের আলমারিটা খোলা হল এবার। ব্রিফ আর ফাইলে ভর্তি। বড় মক্কেলদের দামি সমস্ত কাগজপত্র এখানে রয়েছে মনে হয়। লকারের মধ্যে রয়েছে এগারোখানা গালা দিয়ে মুখ আঁটা পুরু খাম। একটা তুলে নিল বাসব। ওপরে লেখা রয়েছে, শশাঙ্ক তরফদার। উইল।

অর্থাৎ শশাঙ্ক তরফদার নামে কোন ব্যক্তির উইল আছে এর মধ্যে। ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর, এই উইল তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের পড়ে শোনাবার দায়িত্ব অনুতোষ মিত্রর। বাকি খামগুলোতেও বিভিন্ন লোকের উইল রয়েছে। এবার দ্বিতীয় আলমারিটা খোলা হল। এর ভেতরকার চেহারা বেশ ছিমছাম। প্রথম তাকে সারি সারি সুদৃশ্য সমস্ত ডাইরি সাজান। ১৯৪০ থেকে মোট পঁয়ত্রিশখানা ডাইরি রয়েছে। ১৯৪০ সাল থেকে মিত্র ডাইরির প্রতি সিরিয়াসলি মনোযোগী হয়েছেন মনে হয়।

চুয়াত্তর সালের ডাইরিটা তাক থেকে নামাল বাসব। পাতা উল্টে গেল। ভাবাবেগের নামগন্ধ নেই কোথাও। সম্পূর্ণ বাস্তবমুখী ডাইরি। ব্যবসাগত কথা, মক্কেলদের সম্পর্কে, টাকা-পয়সার উল্লেখ, বাড়িতে পার্টি দেওয়ার কথা, বন্ধু-বান্ধব বা ছেলের সম্পর্কেও কিছু কিছু মন্তব্য—এই সমস্ত রয়েছে ডাইরিতে।

তবে একটা উল্লেখ বাসবকে সচকিত করল। যেমন, ৩রা জানুয়ারির পাতায় লেখা রয়েছে, তৃপ্তি মল্লিক—১০০০০ টাকা। আবার ১৬ই জানুয়ারির পাতায় লেখা রয়েছে, জেরিনা—৭৫০০। এদের নাম এবং নামের পাশে টাকার উল্লেখ মার্চ মাস পর্যন্ত মাঝে মাঝেই রয়েছে। মৃত্যুর আগের তারিখের পাতায় এসে বাসব এবার থামল।

২১শে জুলাই—

পার্টি একেবারেই জমল না। এমন কিন্তু আগে কখনও হয়নি। দানতোষ মেজাজ বিগড়ে না দিলে, আমি বোধহয় কিছুটা স্বাচ্ছন্দাবোধ করতাম। সন্ধ্যা যে একেবারে বৃথা গেছে, তা নয়। সুদীপ্ত তার অফিস সেক্রেটারিকে নিয়ে এসেছিল। স্বরূপা স্মার্ট মেয়ে। এই ধরনের মেয়েরা আমার চোখে আগে কেন পড়ে না, বুঝতে পারি না। কথায় কথায় জানতে পারলাম, শালিনীর ইউরোপ যাবার খুব ইচ্ছে। সাধ্য নেই বলেই সম্ভব হচ্ছে না। আমিও তো কন্টিনেণ্ট ট্যুরে যাচ্ছি। দেখা যাক—

সামন্তর হাতে ডাইরিটা দিয়ে বাসব বলল, মিত্র রসিক লোক ছিলেন। তারপর সে অন্যান্য তাকগুলো দেখতে লাগল।

দ্বিতীয় তাকে পাওয়া গেল দুখানা ব্যাঙ্ক বই। খান পাঁচেক খরচ হয়ে যাওয়া এবং দুখানা অর্ধেক খরচ হওয়া চেক বই। গার্ডার দিয়ে আটকানো একতাড়া চিঠি। চিঠিগুলো সমস্তই ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছে। অর্থাৎ ছেলের লেখা। দামি একটা অ্যালবাম। পারিবারিক এবং নৈসর্গিক ছবিতে অ্যালবাম ভর্তি। দুখানা ইন্সিওরেন্সের পলিসি। দুটো মিলিয়ে বীমার পরিমাণ এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা। টুকিটাকি আরো অনেক কিছু রয়েছে।

বাসব একে একে ব্যাঙ্ক বই দুটো দেখল। জমার অঙ্ক চোখ ঝলসানো। অর্ধেক খরচ হয়ে যাওয়া চেক বই দুটো বাসব এবার হাতে তুলে নিল। পাতা উল্টে উল্টে দেখা গেল, শেষ চেক কাটা হয়েছে মারা যাবার আগের দিন—২১শে জুলাই। পরিমাণ, পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা! লকারের মধ্যে কিন্তু টাকাটা পাওয়া গেল না। টাকা যে একেবারেই ওখানে নেই, তা নয়—আছে। মাত্র শ'আষ্টেক। এছাড়া রয়েছে মার্টিন মর্নির একটা রিভলবার। লাইসেন্সটাও আছে। বড় সাইজের নম্বর যুক্ত পেতলের একটা চাবি পাওয়া গেল। মনে হয়, ভল্টের চাবি। বাকি তিনটে তাকে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

বাসব আলমারির কাছ থেকে সরে এসে বলল, ২১শে জুলাই পঁয়ত্রিশ হাজার

টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তোলা হয়েছিল। টাকাটার সন্ধান পেলাম না। মনে হয়, ওটাই খুনের মোটিভ।

সামন্ত এতক্ষণ ডাইরিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। এবার মুখ তুলে বললেন, পাওয়া যাচ্ছে না! আপনি বলছেন, হত্যাকারী টাকাগুলো নিয়ে সরে পড়েছে?

তাই তো মনে হচ্ছে।

এমনও তো হতে পারে, টাকাটা মিত্র কাউকে দিয়েছেন।

হতে যে পারে না, তা নয়। তবে— আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে, মিত্র এত টাকা হঠাৎ ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছিলেন কেন? আপনার কথা মত যদি কাউকে দেবার জন্যই তুলে থাকেন—কি প্রয়োজনে তাকে এত টাকা দিতে গেলেন?

তাহলে এটাই হল এক নম্বর পয়েন্ট? আপনি আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

বাসব মৃদু হেসে বলল, পাচ্ছি। দুটো মেয়ের নাম ডাইরিতে ঘন ঘন উল্লেখ আছে। প্রতিবারই তাদের নামের পাশে টাকার উল্লেখ আছে। এতে বোধহয় একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের অনুতোষ মিত্রর বয়স একটু চড়ে গেলেও, নারীর প্রতি আকর্ষণ বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে মাঝে মাঝেই ওই মেয়ে দুটিকে তিনি নিজের কাছে পেতেন।

একজ্যাক্টলি। আমার মনে হয়, এই কারণেই তিনি মাঝে মাঝে বেয়ারাদের ছুটি দিয়ে দিতেন। মেয়েরা তাঁর সঙ্গে রাত কাটাতে আসছে, চাকর-বাকররা সে কথা যাতে জানতে না পারে, তাই বোধহয় এই ব্যবস্থা।

চিন্তিত গলায় সামন্ত বললেন, হতে পারে। এখানে একটা কথা তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

কি বলুন তো?

২১শে জুলাই রাত্রে বেয়ারাদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ হল, সে রাত্রে অনুতোষ মিত্র একা ছিলেন না।

তৃপ্তি মল্লিক বা জেরিনা অথবা অন্য কোন মেয়ে এসেছিল। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন? সেদিন পার্টি শেষ হবার পর ডাইরিতে তিনি যা লিখেছিলেন, তা থেকে অনুমান করা যায়, সুদীপ্তবাবুর অফিস সেক্রেটারির প্রতি তাঁর কিছুটা দুর্বলতা জন্মেছিল। মেয়েটির সম্পর্কে খোঁজ খবর করা দরকার।

এখন তাহলে আমরা—

এখানে আর কিছু করার নেই। নিচে যাওয়া যেতে পারে।

জানালা-দরজা বন্ধ করে দুজনে নিচে নেমে এল।

বিরূপাক্ষ সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর থালার মত বিশাল মুখ ঘামে চপচপ করছে। ভ্রূ-কুঁচকে থাকলেও, গলায় বিনয় ঢেলে দিয়ে তিনি বললেন, সকলে এসে পড়েছেন স্যার। ড্রইংরুমে ওঁদের বসিয়েছি।

বাসব পাইপ ধরাচ্ছিল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল সামন্তর দিকে তাকিয়ে, আপনি গিয়ে ওঁদের স্টেটমেণ্ট নিন। আমি একটু ঘুরে আসছি।

তার মানে! সামন্ত আকাশ থেকে পড়লেন: ঘুরে আসছেন মানে?

কাছাকাছিই থাকব। পরে আপনাকে সব কথা জানাচ্ছি।

বাসব বিরূপাক্ষ ঘোষালের মুখের সামনে ধোঁয়ার কুয়াশা সৃষ্টি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ফুটপাথে পা দিয়ে সে চারধার দেখে নিল। অনুতোষের বাড়ির একপাশে খানিকটা খালি জমি। বিশাল বিজ্ঞাপনস্ট্যাণ্ড বসানো তাতে। অন্যপাশে অর্ধেকটা তৈরি হওয়া একখানা বাড়ি। চারধারে ভারা বাঁধা। সামনে অবশ্য সেকেলে ধাঁচের একখানা দোতলা বাড়ি আছে।

বাসব রাস্তা পার হয়ে দোতলা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজার ওপর এনামেলের প্লেট লাগানো। তাতে লেখা রয়েছে: ষ্টিভ হার্পার। মেরিন ইঞ্জিনীয়ার। গৃহকর্তাকে আহ্বান জানাবার ব্যবস্থাও রয়েছে। বাসব কলিংবেল বাজাল। মিনিট খানেকের মধ্যেই স্মার্ট চেহারার মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক দরজা খুললেন। উনি যে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, সেটা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না। স্বাভাবিক কারণেই গৃহকর্তার দু-চোখে বিস্ময়।

বাসব মোলায়েম গলায় বলল, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমি পুলিশের পক্ষ থেকে আসছি। বর্তমানে একটা খুনের কেস আমাদের হাতে রয়েছে। সেই সম্পর্কে—

সামনের বাড়িতে একটা ইন্সিডেণ্ট ঘটেছে। আপনি কি—

আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন মিস্টার—

হার্পার। আমি অবাক না হয়ে পারছি না—সামনের বাড়িতে যদি একটা খুন হয়ে থাকে, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

বাসব মুখে হাসি টেনে বলল, কিছুই না। ওই বাড়ির সামনা-সামনি আপনি থাকেন; কিছু ইনফরমেশনের জন্য এসেছিলাম। অনুগ্রহ করে সাহায্য করুন।

ভ্রূ-কুঁচকে স্টিভ হার্পার বললেন, আমি যে আপনাকে কি ইনফরমেশন দেব বুঝতে পারছি না। আসুন, ভেতরে এসে বসুন।

সোফা ইত্যাদি দিয়ে মোটামুটি সাজানো ঘরখানা। বিশাল চেহারার একটা রেডিওগ্রাম রয়েছে একপাশে। বাসব বসল। গৃহকর্তাও বসলেন।

বলুন এবার।

সামনের বাড়ির অনুতোষ মিত্রকে আপনি চিনতেন?

মুখ চেনাচিনি ছিল। মাঝে-মধ্যে কথা হয়েছে।

এ মাসের একুশ তারিখে নিশ্চয় আপনার সকালেই ঘুম ভেঙেছিল। আপনি হয়তো জানালার সামনে-টামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন! ও-বাড়িতে কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেছেন?

একুশ তারিখে আমি কলকাতায় ছিলাম না। মাস কয়েক পরে মাত্র গতকাল ফিরেছি। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন সমুদ্রে ভেসে বেড়ানোই আমার কাজ।

একটু থেমে স্টিভ আবার বললেন, আমার স্ত্রীকে ডাকছি। তিনি হয়তো কিছু দেখে থাকতে পারেন। সকালে তাঁর জানালার সামনে-টামনে দাঁড়ানো অভ্যাস আছে।

তবে তো খুবই ভাল হয়। অনুগ্রহ করে তাঁকে একবার ডাকুন।

পামেলা, একবার এ-ঘরে এসো।

পামেলা হার্পার বোধহয় পাশের ঘর থেকে সব কিছুই শুনতে পাচ্ছিলেন। দ্রুতপায়ে এ ঘরে চলে এলেন। বয়স বছর পঁয়ত্রিশের বেশী হবে না। সুরূপা অবশ্য নন, তবে অত্যন্ত স্মার্ট হওয়ার দরুন দেখতে খারাপ লাগে না।

পামেলা, সামনের বাড়ির আইনজ্ঞ ভদ্রলোক খুন হয়েছেন তুমিই তো বলছিলে। ইনি তদন্তের ব্যাপারে জড়িত। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

ঠোঁটের কোণে হাসি জাগিয়ে পামেলা বললেন, আচ্ছা! কিন্তু আমি তো ওসব ব্যাপারের কিছুই জানি না।

আপনি যে কিছু জানেন না তা আমিও জানি। বাসব বলল, আমার প্রশ্নগুলো হবে একটু অন্য ধরনের। অনুগ্রহ করে যদি উত্তর দেন—

বলুন?

মিস্টার হার্পারের মুখে শুনলাম, আপনার ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা

অভ্যাস। একুশ তারিখেও নিশ্চয় তার ব্যতিক্রম হয়নি। সেই সময় রাস্তার দিকের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কি ?

হ্যাঁ। ওটাও আমার অভ্যাস বলতে পারেন। বিশেষে স্বামী বাড়ি না থাকলে আমার বেশ কিছু সময় জানালার পাশে বসেই কেটে যায়।

সেদিন ঠিক ক'টার সময় জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ?

ঘড়ি দেখিনি। আন্দাজ সাড়ে ছটা।

কতক্ষণ ছিলেন জানালার সামনে।

ঘণ্টাখানেকের কম হবে না।

এবার বলুন, ওই সময়ের মধ্যে কোন লোককে সামনের বাড়িতে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেছেন ?

দেখেছি।—বেশ সহজ ভাবেই মিসেস হার্পার বললেন, দুজন লোককে দেখেছি।

বাসব নড়েচড়ে বসল : বিস্তারিত ভাবে বলুন অনুগ্রহ করে।

জানালার সামনে দাঁড়াবার কয়েক মিনিট পরেই একজনকে সামনের বাড়ির ভেতর থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসতে দেখলাম।

তার বয়স কি রকম হবে ?

পঞ্চাশের ওপর তো বটেই।

বাড়ি থেকে বেরোবার পর সে কি মোটর ব্যবহার করেছিল ?

না, সে মোটরে চড়ে আসেনি। ফুটপাথ ধরে পশ্চিম দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছিল। মিনিট দশেক পরে একটা গাড়ি এসে থামল। চকোলেট রঙের ফিয়েট। একজন সুবেশ ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে চলে গেলেন।

তাঁর বয়েস আন্দাজ করতে পারেন ?

চল্লিশের নিচেই হবে। মিনিট কয়েক পরে তিনিও প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন। এদিক-ওদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে গাড়িতে চড়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফিয়েট গতি নিল।

তারপর কি হল ?

আর কিছু নয়। আধঘণ্টাটাক আরো আমি জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আর কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখি নি।

ধন্যবাদ। অনেক উপকার হল।

আরো দু-চার কথার পর বাসব ওখান থেকে বিদায় নিল।

অম্বুতোষ মিত্রর ড্রইংরুমে তখন জবানবন্দীর পালা চলেছে। সামন্ত সকলকে বসিয়েছেন পাশের ঘরে। একে একে ডাকছেন ড্রইংরুমে। তিনি প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, দ্রুতহাতে লিখে নিচ্ছেন বিরূপাক্ষ। বাসব এ বাড়িতে এসে, খোঁজা-খুঁজি করতে করতে রান্নাঘরে গিয়ে পৌঁছল। দুজন বেয়ারা আর একজন রাঁধুনি বিমর্ষ ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলছিল। বাসবকে দেখে থেমে গেল। এই লোকটি যে পুলিশের বড়সাহেবের সঙ্গে এসেছে, তা তারা লক্ষ্য করেছে।

বাসব কোন রকম ভূমিকা না করেই বলল, কয়েকটা প্রশ্ন তোমাদের করব। ঝামেলায় পড়তে যদি না চাও, ঠিক ঠিক উত্তর দাও।

বলাবাহুল্য, এতে কারো আপত্তি ছিল না। এরপর যে প্রশ্ন-উত্তরের পালা চলল, তা নিম্নরূপ। অবশ্য উত্তর একজনের মুখ থেকে এল না, এল তিনজনের মুখ থেকেই প্রয়োজনানুসারে।

প্রশ্ন : পার্টি শেষ হয়ে যাবার কতক্ষণ পরে তোমরা বাড়ি থেকে গিয়েছিলে ?

উত্তর। ঘণ্টাখানেক পরে। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পর সাহেব বললেন, তিনজনকে কাল দুপুর পর্যন্ত ছুটি দেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন : এরকম ছুটি তোমরা আগে পেয়েছ ?

উত্তর। অনেকবার।

প্রশ্ন : তোমরা ছুটিতে থাকলে সাহেব সকালে চা'টা খেতেন কিভাবে ? নিজে তৈরি করে নিতেন, না দোকান থেকে আনাতেন ?

উত্তর : বলতে পারব না।

প্রশ্ন : সেদিন তোমরা ক'টার সময় এখানে ফিরে এলে ?

উত্তর : বেলা এগারোটার পর। তখন পুলিশ এসে পড়েছিল। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে হুজুর। এমন চাকরি আর পাব না।

প্রশ্ন : মনিব হিসাবে মিত্র মশাই খুব ভাল ছিলেন বুঝতে পারছি। এবার বল তো, ফিরে আসবার পর তোমরা কি করলে ?

উত্তর : দারোগা সাহেব আমাদের ভেতরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বললেন। পরে আমাদের এজাহার নেবেন। আমরা এখানে চলে এলাম।

প্রশ্ন : এসে কি দেখলে ? রান্নাঘরের সমস্ত কিছু পরিপাটি করে সাজানো আছে ?

উত্তর : যেভাবে রেখে যাওয়া হয়েছিল, সেভাবে নেই।

প্রশ্ন : কি রকম ?

উত্তর : স্টোভ বেশ কিছুটা সরানো, চিনির কৌটোর মুখ খোলা, কিছু চিনি এধার-ওধার ছড়ানো।

প্রশ্ন : কেউ চা তৈরি করেছিল, কি বল ?

উত্তর : আজ্ঞে, কফি—

প্রশ্ন : কিভাবে বুঝলে ?

উত্তর : কফির শিশিটা স্টোভের কাছে রাখা ছিল।

প্রশ্ন : এবার যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর ভেবে চিন্তে দাও। তোমরা রান্নাঘরে আসার পর এমন কিছু দেখেছিলে কি—যা আগে এখানে ছিল না ?

তিনজন চিন্তিত হয়ে পড়ল।

প্রশ্ন : ছোটখাটো কিছু হলেও আমায় বল। পুলিশকে আগে জানাও নি বলে ভয়ের কিছু নেই। আমি কাউকে বলব না।

উত্তর : ছোট একটা কৌটো টেবিলের ওপর পড়েছিল। ওটা আগে কখনো দেখিনি।

প্রশ্ন : কি রকম কৌটো ?

উত্তর : প্লাস্টিকের। খুব ছোট।

প্রশ্ন : ওটা আছে, না ফেলে দিয়েছ ?

উত্তর : আছে, তাকের ওপরে তোলা আছে।

একজন গিয়ে নিয়ে এল। প্লাস্টিকের তৈরি ঘি রঙের ইঞ্চি দুয়েক লম্বা কৌটো। প্যাঁচ দেওয়া ঢাকনির ওপর লেখা রয়েছে 'অমৃত'—বিখ্যাত জর্দা এবং পানের মশলা বিক্রেতা। ঠিকানাও দেওয়া রয়েছে। মধ্য কলকাতার একটা ঠিকানা। বাসব এবার ঢাকনিটা খুলল। খালি। তবে অতি সামান্য গুঁড়ো গুঁড়ো কি তলায় লেগে রয়েছে। ঢাকনি বন্ধ করা কৌটোটা ফেলে, হতভম্ব বেয়ারা রাঁধুনির সামনে দিয়ে ড্রইংরুমের দিকে রওনা হল।

জবানবন্দী তখন শেষ হয়েছে। সকলে আবার একত্রিত হয়েছেন ড্রইংরুমে লং ডিসটেন্সে অমৃতোষ মিত্রর ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল দানতোষ। কিন্তু কথা কওয়া সম্ভব হয়নি; প্রিয়তোষ লণ্ডনে ছিল না। হাউস লেডিকে জানানো হয়েছে, সে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন দুঃসংবাদ জানানো হয়।

কারো জবানবন্দীতে এমন কিছু জানা যায় নি, যাতে হত্যাকারীর সন্ধান

পাওয়া যায়। পার্টির বিস্তৃত বিবরণ অবশ্য সকলেই দিয়েছেন। এই সূত্রেই বেরিয়ে পড়েছে দানতোষের টাকা চাওয়ার কথা এবং রবীন দত্তর উন্মাদ আশ্রমে টাকা জমা না দেওয়ার কথা। অমুতোষ ব্যাঙ্ক থেকে কেন পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তুলেছিলেন তার হদিস অবশ্য পাওয়া গেছে। উনি আগামী সপ্তাহে লণ্ডন রওনা হচ্ছিলেন। ওখানে তাঁর প্রচুর টাকার দরকার, অথচ সরকার অতি যৎসামান্য নিয়ে যাবার অনুমতি দিয়ে থাকেন। কাজেই তিনি হুণ্ডিওয়ালাদের সহযোগিতা গ্রহণ করবেন স্থির করেছিলেন। তাই টাকাটা তোলা হয়েছিল। এই সমস্ত কথা জানা গেল প্রদীপের মুখ থেকে।

বাসবের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল।

বাসব বলল, এই কেসে আপনারা কেউ আমাকে নিযুক্ত করেন নি। বলতে গেলে, মিস্টার সামন্ত ধরে নিয়ে এসেছেন আমাকে এখানে। এখন কেন জানি না, কেসটা সম্পর্কে আমি ইণ্টারেস্টেড হয়ে পড়েছি। আপনাদের আপত্তি না থাকলে পরে সকলের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে রইল।

এক মুহূর্ত নীরবতা।

তারপর সকলেই একে একে সম্মতি জানালেন।

সামন্ত বললেন, আপনি এখন তাহলে এঁদের দেওয়া স্টেটমেণ্ট দেখছেন না?

—দেখব। আপনার অফিসে বসে ধীরে সুস্থে দেখতেই সুবিধা হবে। কাল কোন সময় লালবাজার যাব বলুন?

—দুপুরের দিকে আসুন।

—বেশ। আপনার বোধহয় এখান থেকে বেরুতে দেরি হবে। আমি চলি।

বারটা বাজার কয়েক মিনিট পরে বাসব লালবাজারে পৌছাল। আগের দিন অমুতোষ মিত্রর বাড়িতে এই রকম কথা হয়েছিল। সামন্ত অফিসেই ছিলেন। মামুলি দুচার কথার পর স্টেটমেণ্টের কপি বার করে দিলেন। বাসব একাগ্র মনে যা পড়ে গেল কাটছাঁট করে তার বয়ান নিম্নরূপ—

নির্মল সোম—পেশায় ব্যারিষ্টার। দক্ষিণ কলকাতার ফার্ণরোডে থাকেন। অবস্থাপন্ন। অমুতোষ মিত্রর বাল্যবন্ধু। পার্টি উপলক্ষ্যে সবার আগে ওখানে পৌছান। লণ্ডন প্রবাসী মিত্রর ছেলে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে—সেই সম্পর্কেই কথাবার্তা হচ্ছিল। মিত্রর চরিত্র নিয়ে কিছু কানাঘুসো

তাঁর কানে গেছে এই পর্যন্ত, চাক্ষুস তিনি কিছুই দেখেন নি বা বন্ধুকে এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করে কখন বিব্রত করে তোলেন নি।

মিত্র খুন হবেন এ তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল তাঁর মত সদাশয় ব্যক্তির শত্রু থাকতে পারে ভাবাই যায় না। না, তিনি কাউকে সন্দেহ করেন না। পার্টি চলাকালীন কারুর সন্দেহজনক ব্যবহার লক্ষ্য করেননি। সেদিন প্রদীপ ভটচাজের গাড়িতে তিনি বাড়ি ফিরে গেছেন। তারপর আর কিছু জানেন না। পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়েই এসেছেন এ বাড়িতে।

দানতোষ মিত্র—অনুতোষের ছোট ভাই। উত্তর কলকাতার রামধন মিত্র লেন-এ থাকেন। কাঠের কারবারী। দাদার সঙ্গে নিয়মিত কিন্তু দেখা হয় না। পার্টিতে যোগ দিতে আসার পরই একান্তে দুজনের কথা হয়েছিল। দানতোষ হাজার কুড়ি টাকা চেয়েছিলেন ব্যবসার প্রয়োজনে। অনুতোষ রাজী হননি। আর কোন কথা সেদিন হয়নি দুই ভাইয়ের মধ্যে। উনি ভাবপ্রবণ এবং কড়া মেজাজের লোক ছিলেন।

দাদার চরিত্র যে নিষ্কলঙ্ক নয় একথা তিনি এধার-ওধার থেকে শুনেছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশ্য হাতে কিছু নেই। পার্টির সঙ্গে খুনের কোন সম্পর্ক নেই বলেই তিনি মনে করেন। তবে স্বভাবের দোষে দাদা যদি আগে শত্রু সৃষ্টি করে থাকেন, তবে তিনি অবাক হবেন না। পার্টি শেষ হবার পর রবীন দত্তকে সঙ্গে নিয়ে নিজের গাড়িতে বাড়ির পথ ধরে ছিলেন। অনুতোষের সঙ্গে আর তাঁর দেখা হয়নি।

সুদীপ্ত মুখার্জি—হাইফাই ইণ্টারন্যাশনালের প্রধান কর্মকর্তা। রিচি রোডে থাকেন। অনুতোষ মিত্রর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্টতা ছিল। সোজা অফিস থেকেই চলে এসেছিলেন পার্টিতে যোগ দিতে। সঙ্গে অফিস সেক্রেটারি শালিনী রাওয়ালকে এনেছিলেন। অনুতোষের কোন বৈলক্ষণ লক্ষ্য করেননি

সেদিন। তাঁর যে চরিত্র দোষ আছে এটাও তাঁর জানা ছিল না। কে তাঁকে খুন করে থাকতে পারে এ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই।

পার্টি শেষ হবার পর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নিজের গাড়িতেই বাড়ি ফিরেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছিল, এ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনুতোষের সঙ্গে আর তাঁর দেখা হয়নি। দুপুরের দিকে, যখন অফিসে—সেই সময় তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন।

কুন্তলা মুখার্জি—সুদীপ্ত মুখার্জির স্ত্রী। সময় কাটছে না বলেই অনুতোষের অফিসে চাকরি নিয়ে ছিলেন। স্বামীর অপেক্ষায় বহুক্ষণ বসে থাকার পর বাধ্য হয়ে চলে এসেছিলেন পার্টিতে। অনুতোষকে বেশ হাসি খুশী দেখেছিলেন। তাঁর কোন শত্রু থাকতে পারে এ কল্পনার বাইরে। অফিস সেক্রেটারিকে সঙ্গে করে আনার দরুন স্বামীর উপর কিছুটা রুষ্ট হয়েছিলেন—ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

পরের দিন যথাসময় অফিস গিয়েছিলেন। তখনই টেলিফোনটা পান। কেউ তাঁকে জানাল অনুতোষ মারা গেছেন কে যে লোকটা বুঝতে পারা যায়নি। কথাবার্তা যখন চলছে তখন প্রদীপবাবু এসে পড়েন। দুজনে সঙ্গে সঙ্গে চলে যান। শেক্সপিয়ার এভিনিউ-এর বাড়িতে গিয়ে দেখেন অনুতোষ মারা গিয়েছেন। দুজনে ভয় পেয়ে যান। পুলিশকে একথা সরাসরি জানাতে সাহস হয় না। পরিচয় না দিয়ে ফোন করে জানান হয় কথাটা।

প্রদীপ ভটচাজ—অনুতোষের জুনিয়ার। বেনেটোলা স্ট্রীটে থাকেন। পার্টিতে যথা সময় পৌঁছেছিলেন। অনুতোষের হাব ভাব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। তিনি বহুলোকের ঈর্ষার পাত্র ছিলেন এটা ঠিক, তবে তাঁকে খুন করতে পারে এমন কোন শত্রু যে থাকতে পারে এ একেবারে বিশ্বাসের বাইরে ছিল। পার্টি শেষ হবার পর নির্মল সোমকে ফার্ণ-রোডে পৌঁছে দিয়ে তবে বাড়ি ফিরেছিলেন।

পরের দিন যখন একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি ফোনে মিসেস মুখার্জিকে অনুতোষের মৃত্যু সংবাদ জানাচ্ছে তখন তিনি ওখানেই উপস্থিত ছিলেন। দুজনে তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে পড়েন। মৃত অনুতোষকে দেখে বুঝতে পারেন স্বাভাবিক মৃত্যু নয়—উনি খুন হয়েছেন। ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে যান। পুলিশকে তখন কথাটা জানালেও নিজের পরিচয় দেন নি। পরে নৈতিক দায়িত্বের কথা বিবেচনা করে, মিসেস মুখার্জির সঙ্গে পরামর্শের পর পুলিশকে সব কথা জানাচ্ছেন।

রবীন দত্ত—অনুতোষের শ্যালক। রাজবল্লভ স্ট্রীটে থাকেন। শেয়ার মার্কেটের দালাল। ভগ্নীপতিও মাঝে মাঝে সাহায্য-টাহায্য করতেন। তবে সুযোগ পেলেই কথা শোনাতে ছাড়তেন না। চরিত্র বিশেষ ভাল ছিল না। রাতে বেরাতে মেয়ে আমদানী হত নাকি বাড়িতে।

পার্টিতে পৌঁছেছিলেন দানতোষবাবুর সঙ্গে। অনুতোষ তখন খোস মেজাজেই ছিলেন। তবে খাওয়া-দাওয়ার পর ছোট্ট একটা কারণে তাঁকে ধমকে ছিলেন। এই ধরনের লোক শত্রু সৃষ্টি করে। তাদের মধ্যেই কেউ খুনটা করেছে। পার্টি শেষ হবার পর তিনি দানতোষের গাড়িতে বাড়ি ফিরেছিলেন। অনুতোষের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

শালিনী রাওয়াল—সুদীপ্ত মুখার্জির সেক্রেটারি ক্রীকরোতে বাবা মা'র সঙ্গে থাকেন। এক রকম জোর করেই সেদিন পার্টিতে মুখার্জি ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমটা বেশ অস্বস্তি বোধ ছিল। তবে গৃহকর্তার সহজ ব্যবহার সমস্ত কিছু সহজ করে আনে। তিনি ইংল্যাণ্ড যাওয়া নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

পার্টি শেষ হবার পর ট্যাক্সিতে করে বাড়ি ফেরেন। এই সময় পাড়ার একটা বখাটে ছেলে বিরক্ত করতে আমায় তাকে চড় মারতে হয়েছিল। বাড়ির ভেতরে যাবার পরই অনুতোষের ফোন পান। ইংল্যাণ্ড যাওয়ার সুযোগ করে দেবেন, এই রকম একটা কথা বলেন। দেখা

করতে বলেন সকালে! কিন্তু নানা কারণে সকালে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

বাসব স্টেটমেণ্টের কপিগুলো একপাশে সরিয়ে রাখলো।

—কি বুঝলেন?

সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে সামন্ত প্রশ্ন করলেন।

বাসব পাইপ ধরাল।

—চাকর-বাকরদের স্টেটমেণ্ট-এর মধ্যে ছিল না। পরে পড়ে দেখতে হবে। তবে—

—বলুন?

—এঁদের মধ্যে অন্ততঃ দুজন একটা ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেছেন।

—কোন ব্যাপারে?

—পার্টি থেকে চলে যাবার পর অনুতোষের বাড়ি আর আসেননি—এই ব্যাপারে। আমি অন্ততঃ জানি, দুজন আলাদা আলাদা ভাবে ওই বাড়িতে পরের দিন সকালে গিয়েছিলেন।

—তাই নাকি! কিন্তু—

—আপনাকে বলবো সমস্ত। তবে এখন নয়, পরে:

—বাসব উঠে দাঁড়াল।

—একি! চললেন নাকি?

—হ্যাঁ। অনেক কাজ পড়ে আছে।

লালবাজার থেকে বেরিয়ে বাসব 'হাই-ফাই এণ্টারপ্রাইজে' এসে পৌছাল। কতটুকুই বা পথ। পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হেঁটেই চলে এল। লালবাজার থেকে আসবার আগে অবশ্য সংশ্লিষ্ট সকলের ঠিকানা লিখে নিয়েছে।

অপ্রাসঙ্গিক নয় বলেই জানিয়ে রাখা ভাল, গত সন্ধ্যায় সেই জর্দার দোকানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। অনুতোষ মিত্রর রান্নাঘরের টেবিলের উপর পাওয়া 'অমৃত' লেখা কৌটটা দেখিয়েছিল মালিককে। তিনি চিনতে পেরেছিলেন। তারপর দুজনের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হয়েছিল।

সুদীপ্তকে অফিসেই পাওয়া গেল।

সসম্মানে বসাল। চা এসে পড়ল।

চা শেষ করার ফাঁকে দু'চারটে মামুলী কথা হল দুজনের মধ্যে।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, এবার কাজের কথায় আসা যাক। পুলিশকে

আপনি যা বলেছেন তা আমি জেনেছি। কাজেই ও প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া যেতে পারে। এখন আমি আপনার ব্যক্তিগত কথা কিছু শুনতে চাই।

সুদীপ্ত মৃদু হাসল।

—মনে হচ্ছে ইতিমধ্যে আপনি কিছু আঁচ পেয়েছেন ?

—মোটামুটি। অবশ্য আপনার যদি কোন আপত্তি থাকে তবে—

—আপত্তি করে লাভটা কি ? অনেকেই যখন জানে তখন আপনিও না হয় জানলেন। দেখুন, স্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল নয়। যতদিন যাচ্ছে ততই সে 'কোল্ড' হয়ে পড়ছে। ঝগড়া ঝাঁটি লেগেই থাকে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, যে কোনদিন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে পারে।

—শালিনী রাওয়াল না, কি যেন নাম মেয়েটির—ছাড়াছাড়ির মূলে সে থাকবে, নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারেন না ?

সুদীপ্ত সিগারেট ধরাল।

বলল, ওকে কেন্দ্র করে কিন্তু আমাদের মনান্তরের সূত্রপাত নয়। কুন্তলা সম্পর্কে হতাশ হবার পরই আমি শালিনীর উপর ঝুঁকেছি। আমি বাঁচতে চাই মিঃ ব্যানার্জি। অর্থ-সামর্থ সবই যখন আছে, তখন হা হুতাশ করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া বোকামি নয় কি ? তবে একটা কথা—

বলুন ?

আশুতোষ মিত্রর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমার পারিবারিক জীবনের কি সম্পর্ক ?

হয়তো কিছুই না। আসল কথা হল, একটা তদন্ত আরম্ভ করলে আশপাশের কিছু কিছু সংবাদ জেনে রাখা ভাল। ও প্রসঙ্গ এখন থাক। এবার বলুন তো, সেদিন যাঁরা পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কার কার মোটর আছে ?

এই বেখাপ্পা প্রশ্ন শুনে সুদীপ্ত অবাক হলেও উত্তর দিল, অনেকেরই আছে। যেমন ধরুন, আমার আছে। দানতোষবাবু, প্রদীপবাবু আর নির্মলকাকার আছে।

কার কি গাড়ি ?

আমার ফিয়েট। ওঁদের তিনজনেরই মার্ক টু। আপনার কি ধারণা, সেদিন যারা পার্টিতে উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যেই কেউ খুন করেছে ? এমনও তো হতে পারে, হত্যাকারী বাইরের কেউ।

পারে না যে, একথা এখনই জোর দিয়ে বলা যায় না। কথাটা কি জানেন,

কাছাকাছি যাদের পাওয়া যাচ্ছে, তদন্ত তাদের দিয়েই আরম্ভ করা যেতে পারে। তারপর অন্য পথের সন্ধান করতে হবে। আচ্ছা, আপনার গাড়ির রং কি চকোলেট ?

হ্যাঁ।

এবার আমি যে প্রশ্ন করব, তার সঠিক উত্তর চাই। একুশ তারিখ সকালে আপনি মিত্রর বাড়ি কেন গিয়েছিলেন ?

আমি!

অবাক হবার চেষ্টা করা বৃথা। আমার সাক্ষী আছে। সামনের বাড়ির মিসেস হার্পার আপনাকে মহা বিচলিত অবস্থায় অনুতোষের ওখান থেকে বেরোতে দেখেছেন।

সুদীপ্ত গুম হয়ে রইল।

বলুন মিস্টার মুখার্জি, চুপ করে থাকবেন না। এখনও এ সমস্ত কথা পুলিশ জানে না। তারা জানতে পারলে, আপনি কিন্তু বেশ বেকায়দায় পড়ে যাবেন।

আমি ওখানে গিয়েছিলাম। তখন অনুতোষ মিত্র মরে পড়ে আছেন। বিশ্বাস করুন, খুন সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

বিশ্বাসের কথা পরে আসছে। এখন বলুন, ওই সময় ওখানে কেন গিয়েছিলেন ?

অনেক কথাই তাহলে বলতে হয়। পার্টি থেকে ফেরার পথে একপ্রস্থ ঝগড়া হয়ে গেল কুন্তলার সঙ্গে। মনমেজাজ দারুণ খিঁচড়ে গিয়েছিল। ঘুম এল না। বারান্দায় পায়চারি করছিলাম। এই সময় ফোন এল। শালিনী আমাকে জানাল, কিছুক্ষণ আগে মিত্র ওকে ফোন করেছিলেন। ওর ইংল্যাণ্ড যাবার ব্যবস্থা তিনি করে দিতে পারবেন। কাল সকালে আলাপ-আলোচনার জন্য ও যেন তাঁর কাছে যায়।

তারপর কি হল ?

আমি একটু ঘাবড়ালাম। মিত্রকে ওপর থেকে যেমনই মনে হোক না কেন, ভেতরে ভেতরে একটু ঘোড়েল ধরনের। শালিনী যদি বিলেত যাবার টোপ গেলে, তাহলে আমার হাত থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যাবে। আমি ওকে বললাম, লোকটা একটু পাগলাটে ধরনের। নানা ধরনের প্রস্তাব অনেককেই দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত কোনটাই কার্যকরী হয় না। অবশ্য দেখা করে আসতে পার একবার। তবে সকালে নয়, একটু বেলায়।

সকাল হতেই তাই ওখানে পৌছলেন ?

হ্যাঁ। সাড়ে সাতটা আন্দাজ সময় ওখানে গেলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, মিত্তিরদাকে বলব, শালিনীকে যেন আশার কথা কিছু না শোনান—এই ধরনের আরো অনেক কিছু। গিয়ে দেখলাম, উনি মরে পড়ে আছেন। ভয়ানক ঘাবড়ে গেলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে এলাম ওখান থেকে। বিশ্বাস করুন, এই হল আসল ব্যাপার। অবশ্য পুলিশকে ত জানান উচিত ছিল। বুঝতেই পাচ্ছেন, হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা থাকায় ব্যাপারটা চেপে গেছি।

হুঁ। আপনার অফিস সেক্রেটারিকে এখন পাওয়া যাবে?

যাবে।

সুদীপ্ত ইণ্টার কাম-এর নব্ টিপল।

শালিনী—

ইয়েস—

এ ঘরে এস।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই শালিনী এসে উপস্থিত হল। বাসবকে দেখে থতমত খেলো সে। পুলিশ বা গোয়েন্দা সম্পর্কে অনেকেরই অ্যালার্জি থাকে। আরক্তিম মুখে বসল একপাশে। বাসব তখন পাইপ ধরিয়েছে।

সুদীপ্ত বলল, পরিচয় তো জানা আছে। ইনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

আমার সঙ্গে! আমি তো যা বলবার পুলিশকে বলেছি।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, পুলিশকে যা বলেছেন, আমি জানি। এখন অন্য ধরনের দু-চার কথা আমাদের মধ্যে হবে। মিস্টার মুখার্জি, আপনাকে কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যেতে হচ্ছে।

নিশ্চয়।

সুদীপ্ত রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে ঘরের মাঝ বরাবর গিয়ে থামল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, লাঞ্চের সময় তো হয়ে গেছে। চলুন না, দক্ষিণ হাতের কাজটা আমরা একসঙ্গে সেরে আসি। তারপর কথা হবে।

ও কাজ সেরে এসেছি। আপনি বরং খেয়ে আসুন।

সেই ভাল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরব। কোন অসুবিধা হবে না তো?

কিছুমাত্র না।

সুদীপ্ত বেরিয়ে গেল।

শালিনী জড়সড় ভাবে বসেছিল।

বাসব বলল, নার্ভাস হবার কিছু নেই। আমি পুলিশের লোক নই। কথায় কথায় হাতকড়া লাগাবার ক্ষমতা আমার নেই। আপনি সহজ ভাবে কথা বলুন, এতে কেসটার প্রতি সুবিচারই করা হবে।

বলুন, কি জানতে চান ?

সুদীপ্তবাবুর স্ত্রী আছে, আপনি তো জানেন। তবু তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবা কারণটা আমায় বলবেন কি ?

কুণ্ঠিতভাবে শালিনী বলল, প্রসঙ্গটা এত ব্যক্তিগত যে, আমার উত্তর দিতে সঙ্কোচ হচ্ছে। দেখুন, সমস্তটা মনের ব্যাপার। ওঁদের বনিবনা নেই, আপনি নিশ্চয় জানেন। আজ, নয় কাল ছাড়াছাড়ি হবেই। তখন---

বুঝলাম। আপনি ইংল্যাণ্ড যেতে চান, কথাটা অনুতোষ মিত্রকে বললেন কেন ?

উনি ইংল্যাণ্ড যাচ্ছেন, এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমি বলে ফেলেছিলাম, আমারও যাবার ইচ্ছে আছে। উনি প্রশ্ন করলেন, কবে ?

আমি বললাম, টাকা-পয়সা আগে জোগাড় করি, তারপর।

উনি আপনার ফোন নম্বর পেলেন কোথা থেকে ?

আমার কাছে চেয়ে নিয়েছিলেন।

ফোন করে আপনাকে বিলেত যাবার টোপটা দিলেন।

এক রকম তাই। ওই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবার জন্য পরের দিন সকালে ডাকলেন। ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি ফোন করলাম মুখার্জিকে। উনি বললেন, সকালে যেতে হবে না। নিতান্তই যদি যেতে হয়, একটু বেলায় যেও।

বেলায় গিয়েছিলেন ?

মিত্রর বাড়ির সামনাসামনি গিয়েছিলাম। ঢুকিনি।

কেন ?

একটু ইতস্তত করে শালিনী বলল, আমাদের পাড়ার লালওয়ানী বলে একটা ছেলে আছে, ভারি পাজি। আমাকে দেখলেই বিরক্ত করে। ওকে দেখলাম সামনের দিক থেকে আসতে। একলা পেয়ে যদি বাড়াবাড়ি করে—একটা খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে, তাড়াতাড়ি তাতে উঠে অফিসে চলে আসি।

হুঁ। আমার আর কিছু জানবার নেই। আপনি তো লাঞ্চে যাবেন ?

লাঞ্চ সঙ্গে আছে। অফিসে বসেই খেয়ে নেব।

তাহলে আপনি যান। আমি বসছি।

একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই শালিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাসব উঠে পড়ল চেয়ার থেকে। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে প্রায় অর্ধেক দেওয়াল জোড়া জানালা। জানালার ওপর ধবধবে সাদা প্লাস্টিকের ঝিলিমিলি। ঝিলিমিলির ফাঁক দিয়ে অতিব্যস্ত নেতাজী সুভাষ রোড দেখা যাচ্ছে। ওধারে গিয়ে রাস্তার দিকে কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইল বাসব, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। বট্‌ল গ্রীন রঙের ফোমে মোড়া সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর কাচ পাতা। একজন এক্সিকিউটিভের প্রয়োজন পড়ে এমন যা কিছু—সমস্তই রয়েছে ওখানে।

দেরাজগুলোর দিকে দৃষ্টি পড়তেই বাসব অবাক হল। ডান ধারের ওপরের দেরাজে আটকানো অবস্থায় চাবির রিংটা ঝুলছে। তাড়াতাড়িতে সুদীপ্ত মুখার্জি চাবিটা ফেলেই চলে গেছেন। আগের জায়গায় ফিরে যাবার জন্য দু-পা এগিয়ে বাসব থামল। দেরাজের মধ্যে কি আছে দেখবার জন্য মনে দুর্নিবার ইচ্ছে জাগল। যদিও এটা শিষ্টাচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। তবু—

এদিক-ওদিক তাকিয়ে নেবার পর বাসব একটু পিছিয়ে গিয়ে দেরাজ খুলল। প্রথমেই যা চোখে পড়ল, নিঃসন্দেহে তা বিস্ময়কর। লাল রঙের একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। বড় আকারের নয়, নতুন নয়—ব্যবহৃত। বাসব ঝটিতে ব্যাগটা খুলে ফেলল। ভেতরে যে গোটা কয়েক জিনিস ছিল, তা নেড়ে-চেড়ে দেখে নেবার পর ব্যাগ বন্ধ করল। এবার ঘরের চারধারে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। কোণের একটা ছোট টেবিলের ওপর একগোছা দৈনিক পত্র রয়েছে। ওর থেকে একটা সীট নিয়ে ব্যাগটা মুড়ে ফেলল। তারপর যেন কিছুই হয়নি, এমন মুখের ভাব করে বাসব বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দরজার পাশের টুলের ওপর বসেছিল বেয়ারা। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। বাসব তাকে জানাল, সাহেব এলে যেন বলে দেয় বিশেষ প্রয়োজনে সে চলে যাচ্ছে; পরে কোন সময় দেখা হবে।

একটু তাড়াতাড়িই 'হাই ফাই এণ্টারপ্রাইজ' থেকে বাসব বেরিয়ে পড়ল। এখন সুদীপ্তের সঙ্গে দেখা হয়ে যাক, এটা তার অভিপ্রেত নয়। সায়েন্স রেঞ্জের মধ্যে ঢুকে পড়ার পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এখন তার গন্তব্যস্থল ব্রাবোর্ন রোড। এই রাস্তার 'সুজাতা বিল্ডিং-এর' থার্ড ফ্লোরে দানতোষের অফিস।

অফিসে অবশ্য দানতোষকে পাওয়া গেল না। ঘণ্টাখানেক আগে তিনি কোন কাজে বেরিয়েছেন। দুজন কর্মচারি নিয়ে এক কামরার অফিস।

দানতোষ না থাকলেও রবীন দত্তকে পাওয়া গেল। অম্লতোষের শ্যালক রবীন দত্ত। বিরস মুখে তিনি বসেছিলেন। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। বাসবকে এখানে মোটেই আশা করেন নি তিনি। একরকম চমকে উঠলেন।

বাসব বলল, চিনতে পেরেছেন তাহলে। দানতোষবাবু কখন ফিরবেন বলতে পারেন?

আমি তো তারই অপেক্ষায় বসে আছি। মনে হচ্ছে আজ আর ফিরবে না। এই ফাঁকে আমাদের মধ্যে মিত্র মশাইয়ের খুন সম্পর্কে আলোচনা হলে কেমন হয়?

—আলোচনা!

রবীন বিলক্ষণ অবাক হলেন।

বললেন আবার, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলি। কেউ যখন আপনাকে এই কেস'এ অ্যাপয়েন্ট করেনি, তখন আপনি মশাই এত খেটে মরছেন কেন?

বাসব হাসল।

—প্রশ্নের মধ্যে মৌলিকত্ব আছে। দেখুন, অসংখ্য কেস'এ মক্কেলরা আমায় নিযুক্ত করেছে। প্রচুর রোজগার করেছি। তবুও শুধু মাত্র এটা আমার পেশা নয়—নেশাও। মাঝে মধ্যে এরকম দুচারটে কেস হাতে নিতেই হয়। কারণ আমি পুলিশের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রাখতে চাই। যাই হোক, এবার আমরা কাজের কথায় আসতে পারি, কি বলেন?

কাজের কথা বলতে কি বোঝাতে চাইছেন জানি না। মিত্র মশাই-এর মৃত্যু সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু জানা নেই। এটা কথার কথা নয়, সত্যি তাই। তবু পুলিশ ছাড়েনি। যা প্রশ্ন করেছে তার উত্তর দিয়েছি। নতুন কথা আর আপনাকে কি বলবো?

—এমনও তো হতে পারে, তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে নয়, তাঁর সম্পর্কেই জানতে চাইছি।

—তাঁর সম্পর্কে?

—ঠিক তাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি আমাকে সাহায্য করতে চান কিনা।

—এতে আপত্তি করার কি আছে। বলুন?

—ভাল কথা।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিল।

আপনি জানতেন, মারা যাবার আগের দিন আপনার ভগ্নীপতি ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাকা তুলে এনেছিলেন ?

—এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তো আমার জানবার কথা নয়। উনি দয়া করে আমার সঙ্গে সম্পর্কটা বজায় রেখেছিলেন। মাঝে মধ্যে দেখা হত এই পর্যন্ত।

—কিছু মনে করবেন না, উনি কি আপনাকে অর্থ সাহায্য করতেন ?

—মিথ্যে কথা বলবো না, মাঝে মাঝে করতেন। তবে অনেক কথাটথা শুনিয়ে। ভারী অহঙ্কারী লোক ছিলেন।

—আপনি এবং আর কেউ কেউ পুলিশকে জানিয়েছেন, অনুতোষ মিত্রর চরিত্র বিশেষ সুবিধার ছিল না। এ সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু বলুন।

রবীন দত্ত ভ্রূ-কুঁচকে কি ভাবলেন।

—এ ব্যাপারের সঙ্গে তদন্তর কি সম্পর্ক ?

—এই মুহূর্তে সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। তবে ওই যে বললাম, তাঁর সম্পর্কে যতদূর সম্ভব আমি জানতে চাই। অনুগ্রহ করে আপনি বলুন ?

দেখুন, লোকটার অনেক গুণ ছিল। তবে মারাত্মক একটা দোষ ছিল, মেয়ে মানুষদের প্রতি অসম্ভব দুর্বলতা। কতগুলি সঙ্গিনী তাঁর ছিল বলতে পারব না। তবে একজনকে আমি দৈবাৎ চিনে ফেলেছিলাম।

—কি রকম ?

রবীন দত্ত রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিলেন।

—আমার এক পয়সাওয়ালা বন্ধু বরানগরে একটা ফ্ল্যাট রেখেছেন। মাঝে মধ্যে আমরা ওখানে পেঁছাই। বুঝলেন না, একটু ইয়ে টিয়ে হয় আর কি। ওখানেই একবার ছুঁড়িটা গিয়েছিল। কথায় কথায় জানতে পারলাম, আমার ভগ্নীপতিও তার একজন মক্কেল।

—কি নাম মেয়েটির ?

—তৃপ্তি মল্লিক।

বাসব সচকিত হল। নামটা তার অজানা নয়। অনুতোষের ডাইরিতে এই নামের উল্লেখ একবার নয়, কয়েকবারই দেখেছে। নামটা যখন জানে ভদ্রলোক, ঠিকানাটাও অজানা থাকার কথা নয়। কিছুটা উত্তেজনা বোধ করতে লাগল।

—মেয়েটির সঙ্গে আলাপ তাহলে আপনার ভালমতই হয়েছিল, কি বলেন ?

—তা বলতে পারেন। আমাকেও ভবিষ্যতের খদ্দের ভেবেছিল আর কি। মন জুগিয়ে কথাটথা বলছিল আর কি। হাফ গেরস্থ। ওদের ওই ভাবেই পেট চলে, বুঝলেন না।

—মেয়েটির ঠিকানা কি?

—বিডন রো তে থাকে।

—অসুবিধা না থাকলে বাড়ির নম্বরটা বলুন।

—দেখা করতে চান নাকি? তাই বলুন। নম্বর? উহুঁ, নম্বরটা তো ঠিক মনে পড়ছে না। দাঁড়ান—দাঁড়ান—

টেবিলের উপর একটা পেটমোটা ফোলিও ব্যাগ পড়েছিল। সেটা খুলে ভেতরে হাত চালিয়ে দিলেন রবীন দত্ত। হাতড়ে হাতড়ে বার করে আনলেন চটি অ্যাড্রেস বইখানা। পাতা উল্টে উল্টে শেষ পর্যন্ত তৃপ্তির ঠিকানাটা বার করলেন।

বাসব ঠিকানাটা টুকে নিল।

আরো দুচার কথার পর বিদায় নিল।

প্রয়োজন হলে দানতোষের সঙ্গে পরে দেখা করবো। কেসটা আপাতদৃষ্টিতে যাই মনে হোক না কেন, জটিল যে নয় বাসব ক্রমেই বুঝতে পাচ্ছিল। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি কেসটা মিটিয়ে ফেলা যায় ততই ভাল। এর জন্য একটু বেশী মাত্রায় যদি খাটাখাটুনি করতে হয় ক্ষতি নেই।

ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা বিডন রো-এ পৌঁছল।

শ্যাওলা ধরা দোতলা বাড়ি। বয়স একশো বছরের কম হবে না। সুরকি-ঝরা এক-একটা ঘরে এক-একটা পরিবার বাস করে বোধহয়। উঠতি বয়সের কয়েকটা ছেলে গুলতানি করছিল। দেখেই মনে হয় এদের কোন কাজকর্ম নেই। সিগারেট ফুঁকছে আর হেসে হেসে কথা বলছে।

বাসব একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, এ বাড়িতে তৃপ্তি মল্লিক থাকেন।

সকলে চুপ। তারপরই হাসির বন্যা বয়ে গেল।

থাকেন বৈকি। কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন দাদা? কোন বারে-টারে না নিজের শোবার ঘরে?

ভারি গলায় বাসব বলল, খুনের তদন্তে মহিলাটিকে প্রয়োজন। আমি লালবাজার থেকে আসছি। ওঁকে কি একবার খবর দেওয়া সম্ভব হবে?

সকলে থতমত খেলো। অবস্থা এমন দাঁড়াবে কে জানত! ওদের মধ্যে একজন নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

ছোকরার পিছু পিছু প্যাসেজ পেরিয়ে বাসব একটা দরজার সামনে গিয়ে থামল। কয়েকবার কড়া নাড়তেই খুলে গেল দরজা। মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে যে যুবতীটি বেরিয়ে এল, রূপসী তাকে বলা চলে না; তবে চটক আছে। শরীরের গড়ন ভাল। পরনের তাঁতের শাড়িটা এখন আধময়লা।

ছোকরা বলল, ইনি লালবাজার থেকে এসেছেন।

বিরক্তির বদলে এবার বিস্ময় দেখা দিল যুবতীটির মুখে : আমার কাছে!

হ্যাঁ, খুনের কেস না কি আছে।

বাসব বলল, ভয় পাবার কিছু নেই। গোটা কয়েক প্রশ্নের উত্তর পেলেই আমি খুশি। যদি আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন, তাহলে বিপদে পড়বেন। লালবাজারে আপনাকে টেনে নিয়ে যেতে বাধ্য হবো। তখন—

আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। মানে···

পারবেন। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সমস্ত কথা হয় না।

আসুন।

ছোকরা কেটে পড়ল। মাঝারি সাইজের ঘর। পরিবেশ প্রায় দম আটকে আনে। সস্তা সমস্ত জিনিসপত্র। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিষ্কার ছবি চোখের সামনে ভাসছে। জরাজীর্ণ স্বাস্থ্যের একজন বিধবা মহিলা কতকগুলো টিনের কৌটো নিয়ে কি সব করছিলেন। অভিজাত চেহারার একজন পুরুষকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

মা, তুমি একটু বাইরে যাও।

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মহিলা বেরিয়ে গেলেন।

বলুন এবার।

অনুরোধ ছাড়াই বাসব একটা আধভাঙা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, অশুতোষ মিত্র মারা গেছেন আপনি জানেন?

জানি। খবরের কাগজে বেরিয়েছিল।

তাহলে এও জেনেছেন নিশ্চয়, তিনি খুন হয়েছেন? আমরাও একটা কথা জানতে পেরেছি, তাঁর কাছে আপনার প্রায়ই যাতায়াত ছিল—

বিবর্ণ মুখে অসংলগ্ন ভাবে তৃপ্তি বলল, মানে···ইয়ে···কিন্তু···

অস্বীকার করে ফল হবে না। প্রতিবার তিনি আপনাকে কত করে টাকা দিতেন তার হিসাবটাও আমাদের কাছে আছে।

এবার নিজেকে সামলে নিয়েছে তৃপ্তি। মোটামুটি সহজ গলায় বলল

অনুতোষবাবুদের মত ধনী লোকেদের কাছে আমার না গিয়ে উপায় নেই। দেখছেন তো সংসারের অবস্থা। চলবে কিভাবে?

আপনি কি পন্থায় রোজগার করেন, তা নিয়ে আমার বলার কিছু নেই। আমি খুন-জখম নিয়ে কারবার করি, সমাজ-সংস্কারক নই। যাই হোক, এবার আসল কথায় আসা যাক। আপনি ওঁর কাছে প্রায়ই যেতেন?

মাসে বার দুয়েক।

আর কেউ ওঁর কাছে যেত কিনা জানেন?

অনেকেই যেত। ওঁর একজন দালাল ছিল, সে মেয়ে ঠিক করে দিত।

আপনি যখনই ও-বাড়িতে গেছেন, চাকর-বাকরদের দেখতে পান নি বোধহয়?

না, আমাদের কারো যাবার কথা থাকলে উনি চাকরদের ছুটি দিয়ে দিতেন হাজার হোক, মানী লোক তো!

তা বটে। আপনার সঙ্গে শেষ কবে অনুতোষবাবুর দেখা হয়?

একটু ভেবে তৃপ্তি বলল, গত শনিবার।

উনিশ তারিখে?

হ্যাঁ।

তখন ওঁর মুড কেমন ছিল? কি ধরনের কথাবার্তা বলছিলেন?

মুড ভালই ছিল। আমি সেদিন রাত সাড়ে ন'টার সময় গিয়েছিলাম। বেশ হাসি-খুশি ছিলেন। আমাকে কফি করে আনতে বললেন।

প্রত্যেক বারই উনি আপনাকে কফি তৈরি করতে বলতেন?

হ্যাঁ, কফি খেতে উনি খুব ভালবাসতেন। ঘণ্টাখানেক আমাদের গল্প-গুজব হয়। কথা অবশ্য উনিই বেশী বলেছিলেন। তারপর—

তারপর আপনারা শুয়ে পড়েন। আচ্ছা, কি নিয়ে উনি এত কথা বলছিলেন।

বললাম না, ওঁর কাছে অনেক মেয়ে আসত। তাদের মধ্যে কে একজন ওঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। উনি রাজী হবেন কেন? দু-কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। এই সমস্ত কথা বলছিলেন।

আপনি কোন মন্তব্য করেন নি?

কেন মন্তব্য করতে যাব, বলুন? উনি ঠিকই করেছিলেন। পেটের দায়ে এই ব্যবসায় নেমেছি। আমাদের মক্কেলকে বিয়ে করার সাধ হওয়া উচিত নয়।

মেয়েটির নাম নিশ্চয় বলেছিলেন?

বলেন নি।

তার সম্পর্কে আর কোন কথা বলেছিলেন কি?

বলেছিলেন, তোমাকে আর ক'টাকা দিই। ওকে আমি অনেক বেশী দিয়ে থাকি। অথচ আজ পর্যন্ত রাত কাটায়নি আমার সঙ্গে। মাঝে মধ্যে ঘণ্টাখানেক করে সময় দিয়েছে।

বাসব উঠে দাঁড়াল।

ধন্যবাদ। আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।

চিন্তা-জড়িত গলায় তৃপ্তি বলল, অমুতোষবাবুর মত লোক মারা যাওয়ায় আমার খুব ক্ষতি হয়েছে। এরপর পুলিশ যদি টানাটানি করতে থাকে, তবে—

ভয় নেই। পুলিশ যাতে আপনার কাছ ঘেঁষতে না পারে, সে ব্যবস্থা আমি করব। আচ্ছা, চলি—

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বেলা তখন সাড়ে তিনটে।

কিছুটা ব্যস্তভাবে দানতোষ দাদার অফিসে প্রবেশ করলেন। অরবিন্দবাবু নিজের জায়গায় বসে কি লিখছিলেন। জুতোর শব্দে মুখ তুলে তাকালেন। ম্লান হাসি খেলে গেল। দাদার অফিসের এই ক্লার্কটিকে ভাল চোখে দেখেন না দানতোষ। গম্ভীর গলায় বললেন, নির্মলবাবুর ওখানে গিয়ে শুনলাম, উনি নাকি এখানে এসেছেন?

হ্যাঁ।

আর সব কোথায়?

প্রদীপবাবু আর মিসেস মুখার্জিও আছেন অফিস ঘরে।

অফিস ঘর অর্থাৎ অমুতোষ মিত্র যেখানে বসতেন। কথা আর না বাড়িয়ে দানতোষ প্লাইউডের দরজা ঠেলে অফিস ঘরে প্রবেশ করলেন। ছোট টেবিলটার তিনধারে তিনজন বসে। কোন বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনা চলেছে। পাল্লা খুলে যেতেই তিনজন দরজার দিকে তাকালেন।

নির্মল সোম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন—আসুন। ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন। আমরা এই অফিসের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

বুঝতে না পেরে দানতোষ কাঁধ নাচালেন।

বসুন। বলছি সব। আপনি তো জানেন, এই কার্যের প্রতি অমুতোষের

ছিল গভীর মমত্ববোধ। তার অবর্তমানে ফার্ম বন্ধ হয়ে যাক, এটা নিশ্চয় ঠিক হবে না। তাই আমরা বিবেচনা করছিলাম—

আপনারা তিনজন মিলে ফার্মটা চালাতে চান, এই তো? বেশ তো, চালান না। কে বাধা দিচ্ছে।

দানতোষ থামলেন। ওঁর কথা বলার ভঙ্গিতে নির্মল সোম অবাক।

কুন্তলা আর প্রদীপেরও এক অবস্থা।

উনি আবার বললেন, আমি আপনাকে যে জন্য খুঁজছিলাম, এবার তাই বলি। প্রিয়তোষের একটা চিঠি এসেছে। সে লণ্ডন থেকে ফিরবে না। বাপ মরে গেছে জেনেও এখন ফিরবে না।

প্রদীপ বলল, আর কি লিখেছে?

বাপের শ্রাদ্ধ করবে না, অথচ তাঁর টাকার ওপর লোভ ষোল আনা।

কি রকম?

আমায় লিখেছে, বাবার একমাত্র সন্তান যখন আমি, তখন বাবার যা কিছু আছে সবই আমার। আমি কোন প্রপার্টি রাখতে চাই না। নির্মল কাকার সঙ্গে পরামর্শ করে ভ্যালুয়েসন করুন। তারপর ক্রেতা ঠিক করে আমাকে লিখুন। আমি হপ্তাখানেকের জন্য ওখানে গিয়ে, টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে ফিরে আসব। —এই তো ব্যাপার। পড়ে দেখুন না চিঠিটা।

দানতোষ চিঠিখানা নির্মল সোমের দিকে এগিয়ে দিলেন।

চিঠি পড়ে সোম বললেন, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। আমি যতদূর জানি, অমৃতোষ উইল করেছিল। মনে হয়, ওটা এই ঘরের চেস্টের মধ্যেই আছে। উইল পড়ে দেখতে হবে, কি রকম বিলি-ব্যবস্থা ওতে করা হয়েছে।

কুন্তলা বলল, যদি দেখা যায়, তিনি সমস্ত কিছু ছেলেকে দিয়ে গেছেন?

তাতেও ঝামেলা এড়ানো যাবে না। উইল পড়ার সময় প্রিয়তোষের উপস্থিতি দরকার। সাক্সেসান সার্টিফিকেট এক হপ্তার মধ্যে পাওয়া যায় না। তার জন্য চাই লম্বা সময়। ব্যাঙ্ক-লকারে অনেক কিছু রয়েছে। সেগুলো বার করে আনতে গেলে প্রচুর লেখালিখি করতে হবে। কাজেই প্রিয়তোষকে কম করেও এক বছর থাকতে হবে। কলকাতায়।

আমি তাহলে সে কথাই লিখে দিই। দানতোষ দম নিয়ে বললেন, সেফটা খোলার কোন ব্যবস্থা করা যায় না?

কেন বলুন তো?

উইলটা তাহলে আমরা বার করতে পারতাম।

প্রিয়তোষ না আসা পর্যন্ত কাজটা ঠিক হবে না।

কুন্তলা বলল, আচ্ছা, উনি যে উইল করেছেন, তার নিশ্চয়তা কি? আপনার মত বন্ধুকে সাক্ষী হিসেবে সেই সময় কি আর ডাকতেন না?

নির্মল সোম কিছু বলার আগেই দরজায় টোকা পড়ল।

চারজন নড়েচড়ে বসলেন।

সোম বললেন, আসুন।

বাসব ঘরে প্রবেশ করল। তার মুখে হাসির আভাস।

উপস্থিত চারজনই সচকিত হলেন। কেউই এই সময় এই ভদ্রলোককে আশা করেন নি।

বাসব দাঁতে পাইপ চেপে, কারোর বলার অপেক্ষায় না থেকে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

আপনারা নিশ্চয় কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন? বাসব বলল, বাধা হিসাবে এসে পড়ায় দুঃখিত।

কুন্তলা বলল, তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা অনুতোষবাবুর উইল নিয়ে কথা বলছিলাম। সে কথা আপনার সামনে হতে পারে।

উইলটা আমি একবার দেখতে পারি?

নির্মল সোম বললেন, সে রকম অবস্থায় আমরা এখনও আসি নি। উইল আছে কি নেই, সেটাই হল কথা। তবে আমার মনে হয়, আছে।

খুঁজে দেখলেই হয়। আমরা ওঁর শোবার ঘরের আলমারি তিনটে খুলেছিলাম। অনেকগুলো পুরু খাম দেখেছি। কোন একটার মধ্যে থাকতে পারে।

কেশে নিয়ে নির্মল সোম বললেন, পারে। আবার এই ঘরে যে সেফটা দেখতে পাচ্ছেন, তার মধ্যেও থাকতে পারে। খোঁজাখুঁজির কাজটা পরে করলেও চলবে। আপনার খবর এবার বলুন কিছু?

বাসব মৃদু হেসে বলল, খবরের মধ্যে, বেগারই খেটে চলেছি। ভাল কথা, দানতোষবাবু, ঘণ্টা কয়েক আগে আমি আপনার অফিসে গিয়েছিলাম।

দানতোষ প্রায় চমকে উঠলেন, তাই নাকি! তা···ইয়ে···আপনার কি সেবা করতে পারি, বলুন?

এখন আর কিছু করতে হবে না। প্রদীপবাবু—

বলুন ?

অনুতোষবাবুর মারা যাবার সংবাদ কুন্তলাদেবী টেলিফোনে পাবার পরেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আপনি মিত্র বাড়ি গিয়েছিলেন—একথা পুলিশকে জানান নি কেন ?

ভীত গলায় প্রদীপ বলল, ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন, তখন মিস্টার মিত্র মারা গেছেন। মানে···

উনি ঠিকই বলছেন। আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কুন্তলা বলল, জানাজানি হয়ে গেলে, পুলিশ আমাদের নিশ্চিত ভাবে সন্দেহ করবে। কাউকে তাই আর কিছু বলা হয়নি।

অবশ্য অরবিন্দবাবু জানতেন। ফোন আসার সময় তিনি এখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি এসেছি কিছুক্ষণ আগেই। এতক্ষণ তাঁর পেট থেকে কথাগুলো বার করছিলাম। উনি বেশ বুদ্ধিমান লোক।

বাসবের কথা শেষ হবার পরই দরজায় টোকা পড়ল।

গলা চড়িয়ে নির্মল সোম বললেন, ভেতরে আসুন।

পুরন্দর সামন্ত ভেতরে এলেন। পিছনে বিরূপাক্ষ ঘোষাল।

বাসব বলল, ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন দেখছি।

বসতে বসতে সামন্ত বললে, ব্যাপার কি ? জরুরি তলব ?

ক্রমশ প্রকাশ্য। আগে একটা কথা বলে রাখি, ভবিষ্যতে আমাকে এমন জলবৎ তরলং কেসে নাক গলাতে বলবেন না।

তার মানে! কেসটা—

সলভ হয়ে গেছে। আপনাদের মত দীর্ঘ পথ হাঁটা আমার অভ্যাস নেই। আমি নিজের পদ্ধতি অনুসারে শর্টকাটে কাজ সেরেছি।

ঘরের বাকি চারজন এবং বিরূপাক্ষ ঘোষাল বিলক্ষণ অবাক হলেন। সামন্তর অবশ্য অবাক হবার মত অবস্থা নয়। বাসবকে তিনি ভালই চেনেন। অতীতে বহু কেস সে হেলায় নিষ্পত্তি করেছে।

টেবিলের ওপর পাইপটা বারকয়েক ঠুকে নিয়ে বাসব বলল, হৃদয়ের দিক থেকে অনুতোষ মিত্র যত উদারই হোন না কেন, চরিত্রের দিক থেকে ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। টাকার বিনিময়ে তিনি নর্মসহচরী সংগ্রহ করতেন। বিস্ময়ের ব্যাপার, বয়স এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। যা হোক, সেদিন—পার্টি শেষ হয়ে যাবার পর, তিনি বেয়ারাদের ছুটি দিয়ে দেন। যখনই কোন মেয়ে রাত কাটাতে

আসে, তখনই তাঁকে এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। সেদিনও একজনের আসবার কথা ছিল। আমি যতদূর অনুমান করছি, যে কোন কারণেই হোক সে আসেনি। হত্যাকারী ও বাড়িতে পৌঁছেছিল ভোরবেলা। রাতের সহচরী এসে থাকলে, নিশ্চিতভাবে হত্যাকারীর সঙ্গে তার দেখা হবার কথা। সেরকম ঘটলে ব্যাপারটা অনেক আগেই জানাজানি হয়ে যেত। ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছে, আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন? সকাল সাড়ে সাতটা বাজার বেশ কিছুক্ষণ আগে অনুতোষবাবুর সঙ্গে একজন দেখা করতে আসে। উনি অবাক হননি। আগন্তুক পরিচিত জন। তার পক্ষে ও সময় আসা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। দু-চার কথার পর মিত্র কফির কথা তোলেন। সকলেই সকালে গরম কিছু দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিতে চায়। আবার এমনও হতে পারে, আগন্তুকই প্রথমে কফির কথা তুলেছিল। হয়তো বলেছিল, 'চাকর-বাকর কাউকে দেখছি না। আমি বরং কফি করে নিয়ে আসি।' কফি তৈরি করার ব্যাপারে তার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। কারণ সেঁকো বিষ প্রয়োগের আর কোন উপায় ছিল না। এর পরের ঘটনা সরল পথেই এগিয়েছে। মিত্র কফি খাবার পরই অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। মনে হয়, তিনি ডাক্তারকে ফোন করার চেষ্টা করেছিলেন—আগন্তুক কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করে তাঁর ইচ্ছায় বাধা দিয়েছিল। আহত হয়ে তিনি গড়িয়ে পড়েন কার্পেটের ওপর এবং অজ্ঞান অবস্থাতেই মারা যান।

বাসব থামল। সকলের দৃষ্টি ওরই ওপর।

নির্মল সোম বললেন, এতদূর পর্যন্ত তো বেশ বোঝা গেল। তারপর—

তার পরের ঘটনাও বলব। আচ্ছা, একটা কথা কি আপনাদের মনে হচ্ছে না,এখন এখানে সুদীপ্তবাবুর উপস্থিতি দরকার? মিসেস মুখার্জি—

কুন্তলা বলল, বলুন?

আপনি মিস্টার মুখার্জিকে একবার ফোন করুন না? বলুন নিতান্ত অসুবিধা না হলে, তিনি এখানে চলে আসুন।

কোণের দিকের একটা ছোট টেবিলে ফোন সরিয়ে রাখা হয়েছিল। এগিয়ে গিয়ে কুন্তলা রিসিভার তুলে নিল—ডায়াল করতে গিয়ে থামল সে। তার হাবভাবে দ্বিধার জড়তা।

কি হল।

অফিসের ফোন কানেকশানে গোলমাল আছে।

বাসবের দৃষ্টি দ্রুত সকলের মুখের ওপর দিয়ে পিছলে গেল: এটাই আমি শুনতে চাইছিলাম। কানেকশানের গোলমাল আজ হয়নি, হয়েছে দিন সাত-আট আগে। অরবিন্দবাবু তো তাই বললেন। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই: ২১শে জুলাই ফোন করে আপনাকে অমুতোষ মিত্রর মৃত্যু-সংবাদ দিতে পারে না।

সেকি !!

প্রদীপ ঝটিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তা কি করে সম্ভব? আমি নিজের চোখে মিসেস মুখার্জিকে উত্তেজিত ভাবে ফোনে কথা বলতে দেখেছি।

আপনাকে দেখাবার জন্যেই ওই অভিনয়টুকু ওঁকে করতে হয়েছিল। আপনি আসছেন লক্ষ্য করেই উনি ডেড রিসিভারটা তুলে নেন। এবং এমন একটা দৃশ্যের সৃষ্টি করেন, যাতে মনে হয় কেউ একজন ফোন করে বলল মিত্র মারা গেছেন।

কিন্তু কেন?—নির্মল সোম বিস্মিত গলায় বললেন, কেন কুন্তলা এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল?

এখনো বুঝতে পারছেন না! উনি ঠাণ্ডা মাথায় অমুতোষ মিত্রকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। অফিসে আসার পর ওঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাড়াতাড়ি করার দরুন নিজের ভ্যানিটি ব্যাগটা ওখানে ফেলে এসেছেন। পুলিশের নজরে পড়লে পাকা ঘুটি কেঁচে যাবে। অথচ আবার গিয়ে ব্যাগটা নিয়ে আসতেও ভয় হচ্ছিল। অনেক বেলা হয়ে গেছে, কেউ দেখে ফেলতে পারে। প্রদীপবাবুকে আসতে দেখেই ফোনে মিত্রর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরিকল্পনাটা মাথায় এসে যায়। এটা খুবই স্বাভাবিক, 'বসে'র মৃত্যু সংবাদ পেয়ে প্রদীপবাবু স্থির থাকতে পারবেন না; ওখানে যেতে চাইবেন। কার্যক্ষেত্রে ঘটলও তাই। কিন্তু এত কাণ্ডর পরও মিসেস মুখার্জি ব্যাগটা উদ্ধার করতে পারলেন না।

কুন্তলা তখনো ছোট টেবিলটার পাশে একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তার রিসিভার। সুন্দর মুখের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে আরম্ভ করেছে। চোখ আধবোজা। সমস্ত রক্ত নেমে চলেছে নিচের দিকে।

ভারি গলায় নির্মল সোম বললেন, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কুন্তলার মত মেয়ে শেষ পর্যন্ত—! মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি অনেক কথাই বললেন, কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন নি। কোর্টে....

বাসব হালকা গলায় বলল, কোর্টে কি হবে, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা

নেই। তবে এইটুকু বলতে পারি, প্রমাণ আমার হাতে আছে। খোয়া-যাওয়া পঁয়ত্রিশ হাজার টাকাটা ফাইলপত্রের কোন বোঝার তলা থেকে পাওয়া যাবে। নিজের বাড়ির চেয়ে, লুকিয়ে রাখার পক্ষে এটাই আদর্শ জায়গা। এ ছাড়া সেই ভ্যানিটি ব্যাগটা আমি পেয়েছি। • সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণ করবার অবকাশ রয়েছে যে ওটা মিসেস মুখার্জির। ওর মধ্যেই আবার পাওয়া যাবে পানের মশলা রাখার চমৎকার একটা কৌটো, যার অর্ধেকটাই সেঁকো বিষে ভরা। ছোট-খাটো প্রমাণ আরো আছে। বিস্তারিত ভাবে বলার জায়গা এটা নয়।

কুন্তলার শরীর কাঁপছে। আর বিন্দু বিন্দু নয়, ঘামের বন্যা নেমেছে ওর মুখের ওপর। মুখের ভাব ক্রমেই বিবর্ণ হয়ে উঠছে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না সে ; বসে পড়ল কোন রকমে। তারপর শরীর গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর। সামন্ত দ্রুত এগিয়ে গেলেন। মুদিতনয়ন, ছন্দময় দেহটাকে একবার দেখে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন।

ঘোষাল, এক্ষুণি একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করুন। ওই সঙ্গে হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠান—গাড়ি নিয়ে চক্রবর্তী যেন এখুনি চলে আসে।

বিরূপাক্ষ ঘোষাল অবাক হয়ে এতক্ষণ বাসবের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। লোকটাকে আণ্ডার এস্টিমেট ঠিক হয়নি। ওপরওয়ালার কথায় দ্রুত ভুঁড়ি তুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপরটা পরিষ্কার করে নিয়ে, বাসব সামন্তর সাহায্যে ধরাধরি করে কুন্তলার অচৈতন্য দেহটাকে শুইয়ে দিল। তখন ঘরের আবহাওয়া অত্যন্ত ভারি হয়ে উঠেছে। কেউ কারোর দিকে তাকাচ্ছেন না। কে কি ভাবছেন, একমাত্র তাঁরাই জানেন।

স্টিয়ারিং-এ একটা মাপসই মোচড় দিয়ে গাড়িটাকে চমৎকার ভাবে মোড় ঘোরালেন সামন্ত। বাসবকে সঙ্গে নিয়ে তিনি অমুতোষ মিত্রর অফিস থেকে ফিরছেন। কুন্তলা ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠছিল। ওকে লালবাজারে নিয়ে যাবার আগে সুদীপ্তকে খবর দেওয়া হয়েছে শীল করে দেওয়া হয়েছে মিত্রর অফিস। পরে খুঁটিয়ে সার্চ করা হবে।

বাসব একমনে মিক্সচার পুড়িয়ে যাচ্ছিল।

সামন্ত মুখ না ফিরিয়েই প্রশ্ন করলেন, সবকিছু কিন্তু এখনো পরিষ্কার হল না। ভদ্রমহিলাকে আপনি সন্দেহ করলেন কিভাবে?

মিত্রর রান্নাঘর থেকে একটা প্লাস্টিকের কৌটো পেলাম। চাকর-বাকররা

বলল, ওটা আগে এখানে ছিল না। কৌটোর ওপর একটা জর্দা কোম্পানির ঠিকানা লেখা ছিল। গেলাম ওখানে। জানা গেল, এই ধরনের কৌটোতে অত্যন্ত দামি পানের মশলা ওঁরা বিক্রি করে থাকেন। আরো জানা গেল, এই মশলার ক্রেতা কম হওয়ায়, অধিকাংশ খদ্দেরকে ওঁরা চেনেন। কয়েকজনের নাম বলতেই কুন্তলা মুখার্জির নামটাও বেরিয়ে পড়ল। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গেলেন। কারণ কৌটোর ভেতরে গুঁড়ো গুঁড়ো কিছু পড়েছিল। পরীক্ষা করে দেখেছি, ওই গুঁড়ো সেঁকো বিষ ছাড়া কিছুই নয়। কফিতে বিষ মেশাবার সময় নার্ভাস হওয়া স্বাভাবিক। ওই নার্ভাসনেসই কৌটোটাকে রান্নাঘরের টেবিলে ফেলে রাখতে সাহায্য করেছে। যা হোক, এরপর আমি মিত্রর এক নর্মসহচরী তৃপ্তি মল্লিকের সঙ্গে দেখা করলাম। তার সঙ্গে কথা বলার পরই খুনের মোটিভ আমার কাছে পরিষ্কার হল। মনে হয়, কুন্তলা মুখার্জি ম্যালাঙ্কোলিয়া বা ওই ধরনের কোন রোগে ভুগছেন। নইলে তাঁর জীবন সহজ সরল খাতেই বইবার কথা।

আমি অনেক চিন্তা ভাবনার পর যে থিওরি খাড়া করেছি, এবার সে কথা বলি। কুন্তলা একদিন জানতে পারলেন, তাঁর স্বামী অফিস সেক্রেটারির ওপর ঝুঁকেছে। এর জন্য দায়ী সে নিজে, দিনের পর দিন নিজের ব্যবহারে স্বামী অতিষ্ঠ হয়েই যে অন্য পথ ধরেছেন, এ কথা তিনি বুঝলেন না। প্রচণ্ড রাগ হল তাঁর। স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্তে গিয়ে এবার পৌঁছলেন। অনুতোষ নিজের স্বভাব অনুসারে দু-চারবার ইশারা দিয়েছিলেন। কুন্তলা গ্রাহ্য করেন নি। এবার সাড়া দিলেন। দুজনের অন্তরঙ্গ কার্যকলাপ সময় অসময় দশজনের চোখের আড়ালে ভালই চলছিল। ক্রমে কুন্তলার মনে একটা পরিকল্পনা চেপে বসতে থাকে। ডাইভোর্স হলে সুদীপ্ত সঙ্গে সঙ্গে শালিনীকে বিয়ে করবে। সুখে-স্বাচ্ছন্দে কাটিয়ে দেবে জীবন। এরকম হতে দেওয়া হবে না—এ অসহ্য।

কাজেই পরিকল্পনা দানা বাঁধল। সুদীপ্ত থাকবে না। এমন কায়দায় কাজটা সারতে হবে, যাতে সমস্ত দোষটা গিয়ে পড়ে শালিনীর ঘাড়ে। তারপর কুন্তলা নিজে বিয়ে করবেন অনুতোষকে। বয়স একটু বেশী অবশ্য হোক। টাকার পাহাড়ের ওপর তো বসে থাকবেন। তখন তিনি জানেন না, অনুতোষ তাঁর মত বহু মেয়েকে খেলিয়ে থাকেন। অবশ্য কথাটা চাপা থাকল না। বেশী সোহাগ কাড়তে গিয়েই অনুতোষের বিদ্রূপে জর্জরিত হলেন। তখনই জানতে পারলেন, তাঁর মত মেয়েদের কিছুক্ষণ তৃপ্তি দেওয়ার জন্যই কামুক বৃদ্ধটির

প্রয়োজন—ভালোবাসা, বিয়ে এসমস্তই গৌণ বিষয়। বলা বাহুল্য, কুন্তলা এবার সমস্ত পুরুষ জাতটার ওপর চটলেন। অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন বলেই পরিকল্পনা একটু বদলাতে হল। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তোলা হয়েছে জানা ছিল। এক ঢিলে দুই পাখি মারার ব্যবস্থা করলেন তিনি। এরপর তো আপনি জানেনই, ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল। সেকথা আমি আগেই বলেছি।

ভ্যানিটি ব্যাগের ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো?

বাসব নড়েচড়ে বসে বলল, অম্লতোষবাবুর সামনের বাড়িতে এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবার থাকেন। আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। কথায় কথায় জানতে পারি, সেদিন সকাল সাড়ে সাতটার পর দুজন লোক মিত্রর বাড়ি থেকে ভীত চকিত ভাবে বেরিয়ে আসে। একজন মোটরে করে চলে যায়। অন্যজন পায়ে হেঁটে। পায়ে হাঁটা লোকটি অবশ্য রবীন দত্ত। কারণ ওই দলের মধ্যে ওঁরই একমাত্র গাড়ি নেই। গাড়ির বর্ণনায় দ্বিতীয় ব্যক্তিকে চেনা গেল, তিনি সুদীপ্ত মুখার্জি। এক্ষেত্রে ভাগ্য আমাকে কিছুটা সাহায্য করেছে। এমন একটা সময় এল, যখন সুদীপ্তবাবুর অফিসে আমি একা পড়ে গেলাম। তখনই ওঁর টেবিলের দেরাজ থেকে আবিষ্কার করতে পারলাম ভ্যানিটি ব্যাগটা। ব্যাগের ভেতরকার ছবি ইত্যাদি থেকে বুঝতে পারা গেল ওটা কার। শুধু তাই নয়, ওর মধ্যে পাওয়া গেল আরেকটা পানের মশলার কৌটো—যাতে কম করেও ভরিখানেক সেঁকো বিষ রয়েছে। বুঝলাম, নার্ভাসনেসের জন্য মারাত্মক দ্বিতীয় ভুলটা কুন্তলাদেবী করেছেন। এই সঙ্গে দুটো বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল। এক টেলিফোনে সংবাদ পাওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বাজে। দুই, ভ্যানিটি ব্যাগ ফেলে এসেছেন পরে মনে পড়ে যাওয়ার দরুণই, যে কোন ছুতোয় দুর্ঘটনাস্থলে আরেক-বার উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। মিস্টার সামন্ত, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ব্যাগটা সুদীপ্তবাবুর দেরাজে কেন ছিল? অন্য প্রয়োজনে সকালে তিনি গিয়েছিলেন অম্লতোষ মিত্রর সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখেন, মিত্র মরে পড়ে আছেন। মুখের কালচে অবস্থা দেখে বুঝতে অসুবিধা হয়নি খুন হয়েছেন। তারপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে ভ্যানিটি ব্যাগের ওপর। অতি পরিচিত ব্যাগ। ব্যাপারটা সহজেই আঁচ করে নেন। এবং ওটা সঙ্গে নিয়ে ওখান থেকে সরে পড়েন। স্ত্রীকে ঘাড় থেকে সহজেই নামাবার অস্ত্র তখন তিনি পেয়ে গেছেন।

আচ্ছা, সেঁকো বিষটা ভদ্রমহিলা সংগ্রহ করলেন কোথা থেকে ?

বলা মুশকিল। কোর্টে জেরার সময় হয়তো প্রকাশ পাবে। তবে আমার মনে হয়, মাঝে মাঝে পোর্ট কমিশনার্সের লাইনের ধারে বেদেরা এসে আড্ডা গাড়ে—ওদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকতে পারে।

সামন্ত মৃদু হেসে বললেন, ব্যাপারটা তাহলে মিটল ?

সমস্যা দেখা দেবে, আবার এইভাবেই মিটে যাবে। গাড়িটা থামান। এখানেই নামব।

এখানেই ?

ঘড়িটা মেরামত করতে দিয়েছি। দেখি, হল কিনা।

জীপের গতি মন্থর হয়ে আসতে লাগল।

•

অনুতোষ মিত্রর অফিস থেকে বাসব সোজা বাড়ি ফিরে এসেছিল। ধকল কম গেল না। আজ সকাল থেকেই ছুটোছুটির অন্ত ছিল না। যাহোক, তদন্তের কূলে একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছান গেছে। তবু মনটা একটু ভারী হয়ে রয়েছে। কুন্তলা মুখার্জির মত মহিলা হত্যাকারী না হলেই যেন ও খুশি হত।

সোফায় গা ঢেলে দিল বাসব।

শৈবাল সেন্টার টপের উপর পেসেন্স খেলছিল।

—কতক্ষণ এসেছো ডাক্তার ?

শৈবাল মুখ না তুলেই বলল, আধ-ঘণ্টাটাক। তোমার কতদূর ?

—তদন্ত শেষ। গলাটা একটু ভিজিয়ে নি। তারপর তোমাকে বলছি সব কথা। বাহাদুর—

বাহাদুর আসবার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল। ট্রাঙ্কসিগনাল।

বাসব দ্রুত ফোন ষ্ট্যাণ্ডের কাছে গেল। রিসিভার তুলে নিতেই অপারেটার জানাল, মাঝোল থেকে সৈকত নাগচৌধুরী কথা বলতে চাইছেন।

—হ্যালো···বাসব কথা বলছি···

—বহুদিন পরে কি বল···দিন কুড়িক হল ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরেছি···কলকাতা হয়েই এলাম···সময় কম থাকায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি···কিছু মনে কর না···

—তাতে কি হয়েছে···এবার কলকাতায় এলে কিন্তু···

—তুমি এখন ফ্রি আছো কিনা জানতে চাই···

—তা আছি···কেন বলতো···

সৈকতের হাসি ভেসে এল।

—বাঁচা গেল···আগামী পরশু ওখান থেকে তুমি রওনা হচ্ছ··তুফান এক্সপ্রেসে···মনে থাকবে তো···

—ব্যাপারটা কি···

—অনেকেই আসছেন···বাবা সকলকে নিয়ে আনন্দে কয়েকদিন কাটাতে চান এই আর কি···কি হে, আসছো তো···

—তোমার ঘোড়ায় লাগাম দেওয়া স্বভাবটা আজও গেল না·· অনেকদিন কলকাতা থেকে বেরুইনি এটাও একটা কথা, তাছাড়া তোমার সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা হবে···ঠিক আছে আসছি···

—পরশু তুফান এক্সপ্রেস···অন্যান্য অতিথিরাও ওই ট্রেনে আসছে···এখন ছাড়ছি···দেখা হলে অনেক কথা হবে···

বাসব রিসিভার নামিয়ে রাখল।

সৈকত এবং মাঝোল শহরটি পরিচয় দেওয়া বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মাঝোলকে ঠিক শহর বলা যায় না।

আবার গ্রামও নয়।

শহর ও গ্রামের মাঝামাঝি একটা জায়গা করে নিয়েছে বিহারের এই জনপদটি। মাঝোলের চারিদিকেই পাহাড়। পাহাড়ের মধ্যে দিয়েই এঁকে-বেঁকে এগিয়ে গেছে মুঙ্গের-পাটনা হাইওয়ে। হাইওয়ের দুপাশে দেবদারুর সমারোহ। তাছাড়া পাহাড়ের তরাই অঞ্চলে ঠাসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে আছে অজস্র বাওবাব আর মেহগিনি। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ মাঝোল ক্রমেই সমস্ত ভারতের স্বাস্থ্য সঞ্চয়কারীদের কাছে লোভনীয় হয়ে উঠছে।

অক্টোবর মাস থেকে এখানে জনসমাগম আরম্ভ হয়—এই মিছিল চলে মার্চ মাস পর্যন্ত। এই কমাসে মাঝোলে ভারতের সমস্ত প্রান্তের মানুষকেই দেখা যায়। দেখা যায়, ব্রীচেস বা কাউবয় ট্রাউজার পরে বাঙ্গালীরা চলেছেন বন্দুক হাতে নিয়ে শিকারের সন্ধানে। অথবা দেখা যাবে, প্রাকৃতিক লেকে হাল্কা নৌকা ভাসিয়ে প্রতিযোগিতায় মেতেছেন পাঞ্জাবের অধিবাসীরা। হোটেলের বারান্দায় বা পাহাড়ের কোলে হ্যারিংটন চেয়ারে চোখ বুজে বসে স্বাস্থ্যকর হাওয়ায়

অবগাহন করছেন এরকম বহু মহারাষ্ট্রের অধিবাসীকে দেখা যাবে, যে কোন শীতকালে মাঝোলে গেলে ।

অবশ্য মাঝোলের এই সুনাম খুব বেশী দিনের নয়। মাত্র বছর ত্রিশেক আগে বিহারের লোকেরাও এই অঞ্চলের নাম জানতেন না। মুঙ্গের জেলার শেষ প্রান্তে মাঝোল, এরপরই আরম্ভ হয়েছে পাটনা জেলা। ডেভিড স্টকপোর্ট ছিলেন তখন মুঙ্গেরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। শিকারের প্রতি তাঁর অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। প্রায়ই যেতেন নিজের প্রিয় মার্টিন হেনরী রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে শিকার করতে এখানে ওখানে। গোটা পনেরো বাঘের তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করেছিলেন। হায়না, হরিণ আর ভাল্লুক যে কত মেরেছিলেন, তা গুণে বলা শক্ত। তিনিই একদিন শিকার করতে গিয়ে মাঝোলে কয়লার সন্ধান পেলেন। তাঁর ধারণা হল এখানে বহু সহস্র একর জুড়ে কয়লার স্তর রয়েছে।

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

মুঙ্গেরে ফিরেই এই সংবাদ নিজের উপরওয়ালাকে জানালেন ডেভিড স্টকপোর্ট।

সরকারের টনক নড়ল। এক্সপার্টরা এলেন। এবং পরিশেষে ডেভিড স্টকপোর্টের কথাই সত্য প্রমাণিত হল। কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল এরপর, কোন বিদেশী ফার্মই এই অঞ্চল থেকে কয়লা তুলতে সম্মত হলেন না। কারণ-স্বরূপ তাঁরা বললেন, পাথর কেটে কয়লার স্তর বার করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। দ্বিতীয়তঃ, রেলপথ না থাকায় ব্যবসা মোটেই লাভজনক হবে না।

পরিস্থিতি যখন প্রায় অচল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন রণদাকান্ত রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হলেন। সরকারের কাছ থেকে এই অঞ্চলটি ইজারা নিয়ে কয়লা তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

তিন পুরুষের পাটের ব্যবসায় অর্জিত অপর্যাপ্ত অর্থ উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিলেন রণদাকান্ত নাগচৌধুরী। সহস্র রকমের বয়ে যাবার পথ থাকা সত্বেও টাকাগুলো নিয়ে বয়ে যাননি তিনি। তবে কেন জানা যায় না পাটের ব্যবসা ছেড়ে কয়লার ব্যবসায় মন দিয়েছিলেন। ঝরিয়ার কয়লাক্ষেত্রে এক সাহেবের কাছ থেকে কিনেছিলেন কয়লার খনি। যাই হোক, মাঝোলের কয়লা অঞ্চলেরও তিনি কর্তা হয়ে বসলেন। এবং বিদেশী কোম্পানীর ক্যাল-কুলেশনকে ভুল প্রতিপন্ন করে দিন দিন তিনি নিজের ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুললেন।

এরপর কত বছর কেটে গেছে।

কয়লার খনি নিয়েই শুধু ব্যস্ত থাকেননি রণদাকান্ত। স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতি নজর দিয়েছেন, মাঝোলকে মনোরম করবার চেষ্টায় সর্বদা ব্যাপৃত থেকেছেন।

তিনি এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন হাসপাতাল, পার্ক, রাস্তাঘাট, আরো কত কি। হঠাৎ কি ভাবে যেন স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে মাঝোলের নাম ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। তারপর থেকেই জলস্রোতের মত প্রতি বছর এখানে লোক আসছে বেড়াতে।

যৌবনের সে উদ্দামতা আর নেই রণদাকান্তর। বুড়ো হয়ে গেছেন। ধপধপে সাদা না হলেও তাঁর মাথার চুল বিশেষ কালো নেই। বলিষ্ঠ দেহ এখন বেশ কিছুটা শীর্ণ। আজীবন সুখী এই মানুষটির মুখের উপর এখন ছেয়ে রয়েছে ক্লান্ত ছায়া।

আরো কিছুদিন স্বাস্থ্য সম্পদে উজ্জ্বল হয়ে থাকতেন তিনি হয়তো, যদি সুজাতা তাঁকে ছেড়ে না যেতেন। রণদাকান্তর জীবনে এই একটি মাত্র ট্র্যাজেডি। স্ত্রী সুজাতাকে তিনি ধরে রাখতে পারেন নি। সৈকতের যখন মাত্র দশ বছর বয়স তখন রণদাকান্তকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সুজাতা।

দশ বছরের সৈকত এখন আঠাশ বছরের পূর্ণ যুবা। কলকাতা থেকে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট হয়ে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিল মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। দিন দশেক হল ভারতে ফিরেছে। মাঝোলেই আছে এখন। সৈকতই রণদাকান্তর একমাত্র সন্তান।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

ড্রইং রুমের কোচে গা এলিয়ে দিয়ে রণদাকান্ত নাগচৌধুরী একটা ফর্দ দেখছিলেন। কাছেই বিনীত ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর একান্ত সচিব সরোজ রুদ্র। এই শিক্ষিত উদ্বাস্তু যুবককে কলকাতা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তিনি।

ফর্দটা ভাল করে দেখে নিয়ে, সরোজের দিকে এগিয়ে ধরে রণদাকান্ত বললেন, ঠিক আছে। অতিথিদের যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। বাড়িতেই সকলের স্থান সংকুলান হয়ে যাচ্ছে না গেস্টহাউসেও ব্যবস্থা করতে হবে?

সরোজ বলল, বাড়িতেই সকলের স্থান সংকুলান হয়ে যাবে।

—ভাল। কালই তো সকলে আসছে, তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্ধ্যা সাতটার সময় তুফান এক্সপ্রেসে সকলে মোকামায় এসে পৌঁছাবেন।

রণদাকান্ত সিগার ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, দুখানা গাড়ি নিয়ে তুমি অপেক্ষা করবে ওখানে ওঁদের জন্যে। গোটা কয়েক ব্ল্যাঙ্কেট সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলো না। নইলে এই ঠাণ্ডায় গেস্টদের এতটা পথ মোটরে আসতে কষ্ট হবে। তুমি এখন যাও সরোজ।

সরোজ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, রণদাকান্ত আবার বললেন, সৈকতকে পাঠিয়ে দিও গিয়ে।

সরোজ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর নাগচৌধুরী সুজাতার অয়েল পেন্টিং-এর দিকে তাকালেন। নামী শিল্পীর আঁকা চিত্রটি অদ্ভুত প্রাণবন্ত। সুজাতা হাসছেন।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন রণদাকান্ত। আজ সুজাতা বেঁচে থাকলে কত সুখী হতেন। তাঁর আদরের সৈকত বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরেছে। শুধু কি তাই, তার বিয়ের ব্যবস্থাও পাকাপাকি করে ফেলেছেন রণদাকান্ত।

ছোটখাট উৎসবের আয়োজনও করেছেন।

কলকাতা থেকে কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এখানে আসবার জন্যে। তাঁরা আসছেন কাল সন্ধ্যায় তুফান এক্সপ্রেসে, সৈকতের ভাবী স্ত্রী সুচেতাও আসছে ওই সঙ্গে।

রণদাকান্ত ছেলেকে অত্যন্ত স্বাধীনতা দিয়ে মানুষ করেছেন। কৈশোর অতিক্রম করবার পর থেকেই তার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন বন্ধুর মত। ইংল্যাণ্ডে যাবার আগেই নিজের মনের কথা তাঁর কাছে প্রকাশ করেছিল সৈকত।

পাঠ্য জীবনে সুচেতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল ও। সেই পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পরিণত হতে খুব বেশী সময় নেয়নি। ছেলের আকাঙ্ক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে চাননি রণদাকান্ত। কেনই বা দাঁড়াবেন। সৈকতকে তিনি জানিয়েছিলেন, ইংল্যাণ্ড থেকে ও ফিরে এলেই ওদের বিয়ের ব্যবস্থা তিনি করবেন।

মেয়েটিকে রণদাকান্ত দেখেছেন।

পছন্দ হয়েছে তাঁর।

বেশ শ্রীময়ী সুচেতা।

অবশ্য অতিথিদের কাছে ভেঙ্গে কিছু জানান হয়নি। তাঁদের ধারণা অতীতে

কয়েকবার যেমন রণদাকান্ত সকলকে শিকার করবার জন্যে ডেকেছেন, এবারকার আমন্ত্রণও বুঝি সেই গোছেরই কিছু।

সৈকত ঘরে প্রবেশ করল।

একহারা লম্বা চেহারা ওর। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। সুশ্রী মুখ।

—আমায় ডাকছো বাবা? সৈকত বলল।

চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল রণদাকান্তর। তিনি বললেন হ্যাঁ। বস। কথা আছে।

বিসর্পিল গতিতে ধীরে ধীরে তুফান এক্সপ্রেস মোকামা স্টেশনে প্রবেশ করল। আসানসোল ছাড়বার পরই কিছু লেট হয়ে গিয়েছিল। তুফান অবশ্য মোকামায় ইন করেছে রাইট টাইমেই।

সরোজ একাই আসেনি অতিথিদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে। সৈকতও এসেছে। একে একে নেমে এলেন সকলে। তিনখানা প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে অতিথিরা নামলেন। ট্রেন থেকে প্রথমে যিনি নেমে সৈকতকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি ডাঃ দিবাকর গুপ্ত। তারপর প্ল্যাটফর্মের উপরই অভিনন্দনের বন্যা বয়ে গেল। সস্ত্রীক প্রশান্ত রায়, অরবিন্দ দত্ত, রত্নাদেবী, রজত ভৌমিক সকলেই ইংল্যাণ্ড থেকে যোগ্যতার সঙ্গে মাইনিং ডিগ্রী নিয়ে আসবার জন্যে অভিনন্দন জানালেন সৈকতকে। সুচেতা মুখে কিছু বলল না।

মিষ্টি করে হাসল শুধু।

অবশেষে ট্রেন থেকে নামল বাসব।

বাসবকে ট্রেন থেকে নামতে দেখে সৈকত বলল, আমি ভাবলাম তুমি বুঝি আর এলে না।

—কেন? তোমার এ ধারণা হবার কারণ।

তুমি হলে গোয়েন্দা মানুষ। হয়তো আমাকে ফোনে কথা দেবার পরই কোন রহস্যজনক কেস তোমার হাতে এল। তুমিও ছুটলে সেই রহস্যের পিছনে।

পাইপ ধরাতে ধরাতে বাসব বলল, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেরকম কোন ঘটনা ঘটেনি। ভাল কথা, এখানে আমার জন্যে কোন রহস্য ওৎ পেতে নেই তো?

সহাস্যে সৈকত বলল, নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তুমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠো এরকম কোন ঘটনা নিশ্চয় ঘটবে না এখানে।

স্টেশনের বাইরে দুখানা মোটর অপেক্ষা করছিল।

দুদলে বিভক্ত হয়ে অতিথিরা বসলেন দুখানা গাড়িতে।

চওড়া অ্যাসফাল্টে মোড়া রাস্তার উপর দিয়ে ছুটে চলল গাড়ি দুটো। আরোহীরা সকলেই নিজের পায়ের উপর কম্বল ফেলে নিয়েছেন। গায়ে অপর্যাপ্ত গরম কাপড় রয়েছে, তবুও প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় প্রত্যেকের শরীর কুঁকড়ে আসছে।

প্রায় দশটার সময় মাঝোলে পৌছালেন সকলে।

বাসব গাড়ি থেকে নেমেই চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। রণদাকান্ত নাগচৌধুরী শুধু কীর্তিমানই নন, রুচিবানও বটে। মার্বেল মোড়া তাঁর বিরাট প্রাসাদ দেখলে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। প্রাসাদের সামনে সযত্নে লালিত সুন্দর ফুল বাগান। বাগান ও প্রাসাদকে ঘিরে রেখেছে গ্রানাইটের শ্ল্যাব দেওয়া সুদৃশ্য বাউণ্ডারি ওয়াল।

পার্লারেই অপেক্ষা করছিলেন রণদাকান্ত। অতিথিদের স্বাগত জানালেন। কুশল প্রশ্ন বিনিময় হল। দীর্ঘ ট্রেন ভ্রমণে সকলেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। আলাপ আলোচনা খুব বেশী দূর অগ্রসর হল না। গৃহকর্তার অনুরোধে অতিথিরা তাড়াতাড়ি আহার সেরে নিয়ে নিজের নিজের নির্দিষ্ট ঘরে গেলেন বিশ্রাম করতে।

পরের দিন সারাটা দুপুর বাসব ও সৈকত একই সঙ্গে রইল। মাঝোলের যত্রতত্র ঘুরে বেড়াল দুজনে। খনি অঞ্চলেও গেল। কি পদ্ধতিতে কয়লা তোলা হয় তার নিখুঁত বর্ণনা দিল ওকে সৈকত। বাসবের কাছে সমস্তই নতুন অভিজ্ঞতা।

অতিথিদের মধ্যে ডাঃ দিবাকর গুপ্ত সারাটা দুপুর সঙ্গে নিয়ে আসা মোটা একটা ডাক্তারী বই পড়ে কাটালেন। রজত ভৌমিক শিল্পী লোক। ওয়াটার কালারে নাগচৌধুরীদের মার্বেল প্রাসাদের ছবি আঁকলেন বসে বসে। তাঁর ইচ্ছে আছে যাবার সময় ছবিখানা প্রেজেন্ট করে যাবেন রণদাকান্তকে। অরবিন্দ দত্ত ও প্রশান্ত রায় লাঞ্চ সেরেই বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়েছেন। বিগ গেমের সন্ধানে অবশ্য নয়। জঙ্গল হাজার গভীর হলেও এই দুপুর বেলা বিগ গেমের সন্ধান পাওয়া একরকম অসম্ভব। তাঁরা প্রাকৃতিক লেকের দিকেই গেলেন, যদি গোটা কয়েক সুরবাব বা নাক্টা মারতে পারেন।

বিছানায় কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করে সুচেতা মিসেস রায়ের ঘরে গেল। তিনি তখন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আনমনে তাকিয়ে ছিলেন বাইরের দিকে। দুপুর কেটে গেল দুজনের গল্পের মধ্যে দিয়ে। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে যে সুচেতা

আনমনা হয়ে পড়েনি তা নয়। এখনও পর্যন্ত সৈকতের সঙ্গে তার নিরিবিলিতে দেখা হয়নি। কোথায় যে টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে। রত্নাদেবীও সারাটা দুপুর কাটালেন নিজের ঘরে। রাত্রে তাঁর ভাল ঘুম হয়নি। দুপুরে টানা ঘুম দিয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিলেন।

বিকেলে চায়ের টেবিলে সকলে জড় হলেন।

চাপর্ব শেষ হবার পর আবার ছিটকে পড়লেন এদিকে ওদিকে। রণদাকান্ত অবশ্য চায়ের টেবিলে উপস্থিত ছিলেন না। বেলা দশটার সময় খনিতে গিয়েছিলেন, এখনও ফেরেননি।

বাড়ির পিছন দিকে, সুইটপির ঝাড়ের পাশে গিয়ে বসল সুচেতা ও সৈকত।

—আমার কথা বুঝি তোমার মোটেই মনে পড়ছিল না? সুচেতার গলায় অভিমানের আমেজ।

—তোমার স্বভাব এই তিন বছরেও পাল্টালো না সু। অভিমান সবসময় নাকের ডগায়।

—মিছিমিছি অভিমানকে দোষ দিলে তো চলবে না মশাই। সারাটা দুপুর বাইরে ঘুরে না বেড়িয়ে, আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাতে পারতে না বুঝি?

—পারতাম বই কি। কিন্তু বাসবকে নিয়ে না বেরুলেও তো ভাল দেখাত না। হাজার হোক সে আমার পুরনো বন্ধু। ও সমস্ত কথা থাক এখন। আমি তো ভেবেছিলাম তুমি নিজেই আসবে না।

সুচেতা সৈকতের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল, অবস্থা প্রায় সেই রকমেই দাঁড়িয়েছিল। দাদা বললেন, সামনে পরীক্ষা, তোর গিয়ে কাজ নেই। শেষে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে তবে এসেছি।

—অরবিন্দদার পরীক্ষা-পরীক্ষা বাতিক এখনও গেল না। কিন্তু তুমি কি এ বছর পরীক্ষা দিতে পারবে?

—কেন?

অল্প একটু হেসে সৈকত বলল, আমার কিন্তু মনে হয় পারবে না।

—কারণটা কি তাই বল না বাপু?

—বাবা এত ঘটা করে সকলকে এখানে কেন ডেকে এনেছেন জান? তোমার ও আমার বিয়ের কথাটা সকলের সামনে পাকাপাকি করে ফেলবেন বলে।

সুচেতা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হল না, বিশাল চেহারার এক ভদ্র-

লোককে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কাছাকাছি এসে ওদের দুজনকে দেখে থতমত খেলেন ভদ্রলোক।

দ্রুত গলায় বললেন, দুঃখিত, আপনারা এখানে আছেন জানতাম না।

সৈকত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি কি মেথর আসার প্যাসেজ দিয়ে ভেতরে এলেন বটুকবাবু?

ঠিকই ধরেছেন।

—সারা গায়ে চোর কাঁটা লাগিয়ে ওই ভাবে না এসে, মেন গেট দিয়ে ভেতরে এলেই তো পারেন।

চোর কাঁটা ছেয়ে যাওয়া নিজের কোটের দিকে তাকিয়ে, সলজ্জ হেসে বটুকবাবু বললেন, একটু শর্টকার্ট হয়, তাই ওপথ দিয়ে যাওয়া আসা করি। আপনারা কথাবার্তা বলুন, আমি চলি।

ভদ্রলোক দ্রুত প্রস্থান করলেন।

সুচেতা প্রশ্ন করল, কে উনি?

—বটুক চন্দ। এখানকার সানরাইজ হোটেলের মালিক। হোটেল খোলবার সময় বাবা ওঁকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন, তাই আমাদের প্রতি ওর সব সময় সবিনয় ভাব।

—চল, এবার এখান থেকে যাওয়া যাক। অন্ধকার হয়ে এল।

শীতকালে, এখানে সাড়ে পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে যায়।

ওরা মন্থর পায়ে বাড়িতে ফিরে এল। ড্রইংরুমে সকলে তখন সমবেত হয়েছেন। রণদাকান্তও ফিরে এসেছেন কাজকর্ম সেরে। মুখে চুরুট গুঁজে, কোচে গা এলিয়ে দিয়ে বারংবার দরজার দিকে তাকাচ্ছেন। বোধহয় সৈকতের অপেক্ষা করছেন।

উর্দীপরা বেয়ারা কফি পরিবেশন করে গেল অতিথিদের।

বিভিন্ন দরজা দিয়ে সৈকত আর সুচেতা ঘরে প্রবেশ করল। বসল দূরত্ব বজায় রেখে। অ্যাসট্রের উপর চুরুটের টুকরোটা রেখে, গলা ঝেড়ে নিয়ে রণদাকান্ত বললেন, তোমরা অনেকেই এর আগে কয়েকবার এখানে এসেছো। আমি শিকার পার্টির আয়োজন করেছি, কলকাতা থেকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছি কুড়ি পঁচিশ জনকে। এবার তোমরা সংখ্যায়ও কম, তাছাড়া আমার বন্ধুস্থানীয় কেউ নেই তোমাদের সঙ্গে। তোমরা সকলেই সৈকতের বন্ধু কিম্বা বিশিষ্ট পরিচিত। ওর ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসার আনন্দে তোমাদের এখানে

আহ্বান করেছি এটা ঠিক। তবে আরেকটা কারণ আছে। সে কারণটা কি তোমরা আন্দাজ করতে পারছো ?

গৃহকর্তার এই ধরনের প্রশ্ন শুনে সকলেই বিস্মিত হলেন। শুধু সুচেতা মুখ নিচু করে বসে রইল।

রণদাকান্ত আবার বললেন, আমিই কথাটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি। অরবিন্দ, বোনের বিয়ের কোন ব্যবস্থা করছো নাকি ? সসঙ্কোচে অরবিন্দ দত্ত বললেন, ও বিষয় তো আমার কোন চিন্তা থাকার কথা নয়। আপনিই তো···

—আমি একটা ইশারা তোমাকে পূর্বেই দিয়ে রেখেছি সন্দেহ নেই। তবু তুমি হলে গিয়ে মেয়ের ভাই। তোমার তো উচিত কথাটা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। যাক, তোমরা শুনলে খুশী হবে, অরবিন্দের বোন সুচেতাকে আমি পুত্রবধূ করবো বলে স্থির করেছি।

এই সংবাদে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করলেন।

সুচেতা ও সৈকত বিব্রত হয়ে পড়ল।

এই প্রসঙ্গ নিয়ে মিনিট পনেরো আলোচনা চলবার পর রণদাকান্ত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন।

বললেন, সুবিখ্যাত রহস্যভেদী বাসবের সঙ্গে তোমাদের সকলেরই আলাপ হয়েছে। ও অল্পদিনের মধ্যে বহু দুরূহ কেসে সাফল্য অর্জন করে খ্যাতিমান হয়েছে। আমি অনুরোধ করবো ও যদি নিজের অভিজ্ঞতার গল্প কিছু শোনায় তাহলে আমাদের এই সন্ধ্যা বেশ ভালই কাটে।

বটুক চন্দ্র ড্রইংরুমেই ছিলেন। তিনি বললেন, নাগচৌধুরী মশাই যথার্থই বলেছেন। গোয়েন্দা গল্প আমরা অনেক পড়েছি। কিন্তু সত্যিকারের গোয়েন্দা গল্প শোনার সুযোগ আমাদের কোথায়।

ঘরের অন্যান্যরাও এই প্রস্তাবে সমর্থন জানালেন। বাসব আপত্তি করল না। একটু চুপ করে থেকে, মনের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে ও আরম্ভ করল। সম্প্রতি যে কেস শেষ করেছে তারই গল্প বলে যেতে লাগল। সকলে একাগ্র মনে শুনছেন।

ঘণ্টা খানেক পার হয়ে গেল ক্রমে।

বাসবের গল্প বলার মাঝেই হঠাৎ প্রশান্ত রায় উঠে দাঁড়ালেন। সকলেই অবাক হয়ে তাকালেন তাঁর দিকে।

পরিষ্কার গলায় প্রশান্ত রায় বললেন, গল্পে এই ভাবে বাধার সৃষ্টি করায় আমি মর্মাহত। কাকাবাবু, আপনার একখানা গাড়ি কিছুক্ষণের জন্যে আমার

প্রয়োজন হবে। রণদাকান্ত দ্রুত গলায় বললেন, গাড়ি এত রাত্রে, কোথাও যাবে নাকি ?

প্রশান্ত চশমাটা নিজের নাকের উপর ঠিক মত বসাতে বসাতে বললেন, এখুনি একবার পাটনা যেতে হবে।

—কাল সকালে যেও বরং। তাছাড়া ডিনার টাইম হয়ে এল।

—আমার এখন না গেলেই নয়। বারটার মধ্যে ফিরতে পারবো আশা করি।

মিসেস রায় এবার বলে উঠলেন, এখন তোমার যাওয়াটা কোন মতেই উচিত হবে না। নতুন জায়গা, তাছাড়া···

—না, না, তুমি বুঝছো না তন্দ্রা। এখন না গেলে আমায় বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে। পোর্টিকোতে যে গাড়িখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে—আমি নিতে পারি কাকাবাবু ?

—নিশ্চয় পার। তোমার এই সময় পাটনা যাওয়াটা অবশ্য আমি অনুমোদন করছি না। তবে তুমি বলছো জরুরী কাজ রয়েছে। ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে যাও ?

—আমি একাই যেতে পারবো। পথ হারাবার ভয় নেই। পিচ ঢালা রাস্তাটাই তো সোজা পাটনা চলে গেছে।

কথাগুলি শেষ করেই প্রশান্ত রায় ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তন্দ্রাদেবীও তাঁকে অনুসরণ করলেন।

ঠাণ্ডা যেন আজ বেশী পড়েছে মনে হচ্ছে।

দোতলায় নিজের ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাসব পাইপ টানছিল। জানালায় অবশ্য কাচের শার্সি আঁটা রয়েছে। খাওয়া-দাওয়া সমাধা হয়েছে ঘণ্টা দেড়েক আগেই।

এতক্ষণ সৈকতের সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলছিল বাসব। চমৎকার বিলিয়ার্ড টেবিলটা এদের। সৈকতের হাতও চমৎকার। অনেকক্ষণ ধরে দুজনে খেলেছে। তারপর বাসব ফিরে এসেছে নিজের ঘরে।

কোথায় সশব্দে এগারটা বাজল।

কোল ফিল্ডের কাছে যে টাওয়ার আছে, তার চারপাশে চারটে ঘড়ি। শব্দ বোধহয় সেখান থেকেই এল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বাসবের মনে পড়ল, মিঃ রায় এখনও পাটনা থেকে ফিরে আসেননি।

তাঁর কি এখন পাটনা না গেলে সত্যিই চলতো না। জানালার কাছ থেকে

সরে আসবার আগে আরেকবার বাগানের দিকে তাকাল বাসব। নিটোল কালো অন্ধকারের মধ্যেও আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে গাছ-পালাগুলো। ঠিক এই সময় বাগানের গেটের কাছটা তীব্র আলোকিত হয়ে উঠল।

বাসব কাচের শার্সির উপর ঝুঁকে পড়ল, ধীরে ধীরে একটা মোটরকার গেট পেরিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকছে। মিঃ রায় পাটনা থেকে ফিরলেন। মোটর পোর্টিকোয় এসে থামল।

এবার শুয়ে পড়লেই হয়। অনেক রাত হয়ে গেছে। বাসব বিছানার দিকে কয়েক পা এগিয়েছে মাত্র—রাতের নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে কোথায় যেন বন্দুক গর্জে উঠল। পরমুহূর্তে একটা কাতর চিৎকার।

সচকিত হয়ে উঠল বাসব।

বাগানের দিক থেকেই শব্দটা এল!

আলনার উপর থেকে ওভার কোটটা তুলে নিয়ে, গায়ে গলিয়ে নিতে নিতে বাসব দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কয়েক পা গিয়েই সিঁড়ি। কয়েকটা করে সিঁড়ি একসঙ্গে অতিক্রম করে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পোর্টিকোয় এসে উপস্থিত হল।

ক্রাইসলার খানা দাঁড়িয়ে রয়েছে নির্দিষ্ট জায়গায়। এই গাড়িতেই মিঃ রায় পাটনায় গিয়েছিলেন। বাসব সবিস্ময়ে দেখল, কে একজন গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে পড়ে কি যেন করছে।

ঠেলা দিতেই চমকে মুখ ফেরালেন ভদ্রলোক—ডাঃ দিবাকর গুপ্ত। তাঁর মুখের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় তিনি অসংলগ্ন গলায় বললেন, দেখুন কি কাণ্ড—

বাসব ঝুঁকে গাড়ির মধ্যে তাকাতেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। ড্যাস বোর্ডের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল, ষ্টিয়ারিং-এর উপর মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছেন প্রশান্ত রায়। কপালের একপাশ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। রক্তে তাঁর সাদা ট্রাউজারের খানিকটা লাল হয়ে উঠেছে। কি মর্মান্তিক দৃশ্য।

গুলির আওয়াজে বাড়ির সকলের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সকলেই ঘটনাস্থলে ছুটে এলেন। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখবার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। বিপদের গুরুত্বে প্রত্যেকে নির্বাক, শুধু তন্দ্রাদেবী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন। বাসব প্রথমে কথা বলল, কাকাবাবু, পুলিশে খবর দেবার ব্যবস্থা করুন।

বাসবের কথায় রণদাকান্ত সম্বিত ফিরে পেলেন।

ভাঙা গলায় তিনি বললেন, একি হল বাসব! আমি যে ভাবতেও পারছি না। আমারই বাড়িতে শেষ পর্যন্ত···

—আপনি এত উতলা হবেন না। সরোজবাবু, আপনি এখুনি রিং করুন একবার পুলিশকে।

রণদাকান্তের একান্ত সচিব সরোজ রুদ্র কাছেই দাঁড়িয়েছিল, বাসবের কথা শুনে টেলিফোন করার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। স্তম্ভিতবৎ দাঁড়িয়ে থাকা সকলের উপর বাসব দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। সকলেই উপস্থিত রয়েছেন, শুধু একজন—হাঁ, অরবিন্দ দত্ত অনুপস্থিত।

কোথায় গেলেন তিনি? এতবড় ঘটনার পর তাঁর ঘটনাস্থলে দৃষ্টি পড়ল বাগানের দিকে। দেখা গেল গেটের দিক থেকে এগিয়ে আসছেন অরবিন্দ দত্ত। তাঁর কেমন যেন ত্রস্ত ভাব।

সুচেতা দৌড়ে ভেতরে গিয়েছিল। এক জগ জল নিয়ে ফিরে এল। তন্দ্রাদেবীর মুখের উপর জলের ছিটে দিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তুলল। হাত ধরে তাঁকে তুলে নিয়ে গেল তাঁর ঘরে।

রত্নাদেবী আগেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন। এই রক্তাক্ত ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর মন বোধহয় চায়নি। অন্যান্যরাও একে একে স্থান ত্যাগ করলেন। ঘটনাস্থলে রইল শুধু বাসব ও সৈকত। পুলিশের অপেক্ষায় ওরা ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই থানা-ইনচার্জ রাজেন শুক্লা দেখা দিলেন।

এই তরুণ পুলিশ কর্মচারীটি কর্তব্যপরায়ণ হিসেবে এ অঞ্চলে সুখ্যাত। সৈকতের মুখ থেকে ঘটনাটা শুনলেন তিনি।

—ভদ্রলোক তাহলে বেশ কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছেন। ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন।

—আমরা ওঁর দেহ পরীক্ষা করিনি। সৈকত বলল, গুলি খেয়ে উনি মারা গেছেন কি, আহত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় এখনও বেঁচে আছেন বলতে পারব না।

একজন কনেষ্টবলকে পাঠিয়ে অবিলম্বে ডাঃ তারানাথকে ডেকে পাঠালেন শুক্লা। তারানাথ মাঝোলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। হন্তদন্ত হয়ে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন তারানাথ। সতর্কতার সঙ্গে প্রশান্ত রায়ের দেহ পরীক্ষা করে বললেন, স্কাল একেবারে ভেঙ্গে গেছে। একটু তেরছা ভাবে কপালের

ডান পাশে গুলি লাগে। খুলি ভেদ করে গুলি বেরিয়ে গেছে, বোধহয় আটকে আছে মোটরের শক্ত ছুডে।

ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন, গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি বোধহয় মারা গেছেন ?

—নিশ্চয়ই। খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছিল। কপাল ও রগের উপরকার গভীর পোড়া দাগটা লক্ষ্য করুন।

আরো দুচার কথা বলে ডাক্তার বিদায় নিলেন।

সৈকত এই সময় ইন্সপেক্টরের সঙ্গে বাসবের আলাপ করিয়ে দিলেন।

শুক্লা আনন্দিত হলেন। খবরের কাগজের দৌলতে বাসবের কীর্তি-কলাপের কথা অজানা ছিল না তাঁর।

তিনি সাগ্রহে বললেন, আপনি উপস্থিত রয়েছেন, ভালই হল।

এই খুনের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করলে খুশী হব।

সহাস্যে বাসব বলল, আপত্তি নেই। আমার সাধ্যমত সাহায্য আপনাকে নিশ্চয়ই করব।

—এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ?

—তলিয়ে কিছু ভাবিনি। তবে এখন এইটুকু বলতে পারি, মৃতদেহের পজিশন দেখেই অবশ্য বলা সম্ভব হচ্ছে, হত্যাকারী পোর্টিকোতেই দাঁড়িয়েছিল। মিঃ রায় গাড়ি নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গুলি করে।

—হত্যাকারী যে দাঁড়িয়েছিল একথা আপনি জোর দিয়ে বলছেন কি ভাবে। এমনও তো হতে পারে, পোর্টিকোতে গাড়ি থামার পর হত্যাকারী কোথাও থেকে ছুটে এসে গুলি করেছিল ?

—আপনি যা বলছেন, প্রথমে এই সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু তা ঘটেনি। আমি বুঝিয়ে বলছি আপনাকে। হত্যাকারী যদি প্রশান্তবাবুর জন্যে এখানে অপেক্ষা না করতো তাহলে তিনি গাড়ির মধ্যে বসেই মৃত্যুবরণ করতেন না। অন্ততঃ এক মিনিটও সময় পেতেন অর্থাৎ হত্যাকারী ছুটে আসতে আসতে তিনি গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন নিশ্চয়ই। তা তিনি পারেন নি, এর অর্থ এই নয়কি, হত্যাকারী তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল এবং পোর্টিকোতে ঢোকবার সময় তিনি তাঁকে দেখতেও পেয়েছিলেন।

সৈকত বলল, দেখতে যদি পেয়ে থাকেন তবে প্রশান্তবাবু সতর্ক হলেন না কেন ?

—দুটো কারণে তাঁর পক্ষে সতর্ক হওয়া সম্ভব হয়নি। প্রথম, হত্যাকারী নিশ্চয়ই রিভলবার বাগিয়ে দাঁড়িয়েছিল না। দ্বিতীয়, সে তাঁর এত পরিচিত ব্যক্তি ছিল যে তাকে কোন রকম সন্দেহ করার তিনি কারণ খুঁজে পাননি। আমার মতে, তাঁর অতি পরিচিত হত্যাকারীকে গভীর রাত্রে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রশান্তবাবু বেশ অবাক হয়েছিলেন। গাড়ি থামিয়েই বিস্মিত ভাবে তার দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন, হয়তো প্রশ্নও করেছিলেন একটা। হত্যাকারী সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালায়। তিনি যে মুখ ফিরিয়েছিলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, গুলি কানের উপর বা রগে না লেগে কপালের একপাশে লেগেছে।

প্রশংসার দৃষ্টিতে বাসবের দিকে তাকিয়ে শুক্লা বললেন, আপনার বিশ্লেষণ ক্ষমতা অদ্ভুত। আমার সৌভাগ্য যে এই কেসে আপনাকে আমি কাছে পেয়েছি। খুন করার পর হত্যাকারী কোথায় গিয়ে আত্মগোপন করে বলে আপনার ধারণা?

—যদি ডাঃ গুপ্ত প্রশান্তবাবুকে খুন না করে থাকেন তবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বর্তমানে একটু শক্ত।

—ডাঃ গুপ্ত! কি রকম?

বাসব ইন্সপেক্টরকে বলল, ঘটনাস্থলে ছুটে আসার পর ডাঃ গুপ্তকে ও কি ভাবে দেখেছিল।

ইন্সপেক্টর বললেন, ওই সময় ডাঃ গুপ্তর উপস্থিতি আমি অত্যন্ত সন্দেহজনক বলে মনে করছি।

—সন্দেহজনক বইকি। এ সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।

বাসব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মৃতদেহ পরীক্ষা করল। ইন্সপেক্টর শুক্লা প্রশান্ত রায়ের পকেটগুলো তল্লাস করলেন। পকেটের মধ্যে থেকে পাওয়া গেল, পেন্সিল কাটা ছুরি, পার্স, রুমাল ও কোয়ার্টার সাইজের ফটোগ্রাফ একখানা।

প্রশান্ত রায়ের পার্সটা পরীক্ষা করে দেখলেন ইন্সপেক্টর। দশটাকা, পাঁচটাকা ও এক টাকার নোট মিলিয়ে টাকা সাতচল্লিশ রয়েছে তাতে।

বাসব তখন ইন্সপেক্টরের কাছে ছিল না। গাড়ির পিছন দিকে গিয়ে পেট্রোল ট্যাঙ্কের মুখ খুলে, একটা কাঠি ডুবিয়ে পরীক্ষা করছিল কতখানি তেল আছে ট্যাঙ্কে। কাঠির ভেজা অংশ দেখে মনে হল আধ গ্যালনের বেশী তেল নেই।

হঠাৎ বাসবের দৃষ্টি পড়ল কেরিয়ারের তলাকার ঘাস জমিটার উপর। রিভলবার পড়ে রয়েছে একটা। রুমালে মুড়ে সন্তর্পণে অস্ত্রটা তুলে নিল। হাতের ছাপ থাকলে নষ্ট যাতে না হয়ে যায় তাই এই সতর্কতা। ইন্সপেক্টর বাসবের হাত থেকে রুমালে মোড়া রিভলবারটি নিয়ে পকেটস্থ করলেন।

—এখানকার কাজ মোটামুটি এখন শেষ হয়েছে বলা চলে। এবার সকলকার এজাহার নেওয়া চলতে পারে। তবে তার আগে ডেডবডি পোস্ট-মর্টমে পাঠান দরকার।

গৃহকর্তাকে জানিয়ে মৃতদেহ পোস্টমর্টমে পাঠালেন ইন্সপেক্টর। তারপর সকলের এজাহার নেবার জন্যে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন।

নাগচৌধুরীদের বিরাট বাড়িতে মৃত্যুর মতই স্তব্ধতা বিরাজ করছে। আচম্বিতে এই অঘটন ঘটে যাওয়ায় সমস্ত হাসি আনন্দের উপর কে যেন যবনিকা টেনে দিয়েছে। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলছে না। নিজের ঘরে আশ্রয় নিয়ে চিন্তার অতল সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

পুলিশের পক্ষ থেকে সকলকে জেরা করা হয়েছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন সূত্রই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। খুন করে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হত্যাকারী হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন। জেরার উত্তরে ডাঃ গুপ্ত বলেছেন, পোর্টিকোর কাছেই তাঁর ঘর, শব্দ শুনে তিনি ওখানে গিয়ে পড়েছিলেন।

তবে একটা উল্লেখযোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ঘটনাস্থলে কুড়িয়ে পাওয়া রিভলবারটা প্রশান্ত রায়ের নিজেরই। তন্দ্রাদেবী একথা জানিয়েছেন পুলিশকে। নাগচৌধুরী হাউস থেকে বিদায় নেবার সময় ইন্সপেক্টর শুক্লা সকলকে জানিয়ে গেছেন, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন মাঝোল ত্যাগ না করেন।

বাসব নিজের ঘরের ডেকচেয়ারে বসে আকাশ পাতাল ভাবছিল। সত্যি, তন্দ্রাদেবীর কথা ভাবলে দুঃখ হয়। পতিপ্রাণা শান্ত মহিলা—বিদেশে এসে কি শোচনীয় দুর্বিপাক। তাঁকে সান্ত্বনা জানাবার কোন ভাষা নেই। কলকাতায় তাঁর ভাই-এর কাছে খবর পাঠানো হয়েছে।

ডেক চেয়ারের পাশেই টিপয়। তার উপর পেন্সিল কাটা ছুরি, রুমাল, ফটোগ্রাফ ও পার্স রাখা রয়েছে—প্রশান্ত রায়ের পকেট থেকে পাওয়া এই জিনিসগুলো ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে চেয়ে নিয়ে এসেছে বাসব।

পরীক্ষা করে রিভলবারের উপর থেকে কোন হাতের ছাপ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বাসব অবশ্য এ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। হত্যাকারী ইচ্ছে করেই রিভলবারটা ওখানে ফেলে গেছে হয়তো পুলিশকে বিপথগামী করাই তার উদ্দেশ্য। চেম্বারে পাঁচটা গুলি রয়েছে এক নম্বর গুলি দিয়ে প্রশান্ত রায়কে খুন করা হয়েছে কি অন্য কোন রিভলবারের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।

সৈকত ঘরে এল। তাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, বাবা অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। আমাদের বাড়িতে শেষ পর্যন্ত এই রকম ঘটনা ঘটবে কে জানত!

বাসব সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, মিঃ রায়ের এইভাবে খুন হওয়া সত্যি আশ্চর্যের বিষয়।

—পুলিশ যা করছে করুক। তুমি ভাই একটু ইণ্টারেস্ট নাও। যা হবার তা অবশ্য হয়ে গেছে, এখন এই হত্যাকাণ্ডের নিষ্পত্তি না হলে আমাদের। পরিবারের সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে।

—আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না সৈকত। তুমি সকলকে জানিয়ে রাখবে তাঁরা যেন আমার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

—বেশ।

বাসব টিপয়ের উপর থেকে ছবিখানা তুলে নিয়ে বলল, এই ছবিটা কার বলতে পার?

সাত আট বছরের বাচ্চার ছবি। সেলার স্যুট পরা, মিষ্টি মুখের অধিকারী সে। ছবিটা এক নজর দেখে নিয়ে সৈকত বলল, না। কোথায় পেলে এই ছবি?

—প্রশান্তবাবুর পকেটে ছিল। আজ সন্ধ্যায় আমি সকলকে কিছু কিছু প্রশ্ন করব। এখন তোমাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন করতে চাই।

—স্বচ্ছন্দে করতে পার।

সিগারেটে ঘন ঘন বার কয়েক টান দিয়ে বাসব বলল, প্রশান্তবাবুর সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ?

—বছর ছয়েকের। ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়।

—ভদ্রলোক কি কাজ কর্ম করতেন?

—মাইকার ব্যবসা করতেন।

—প্রশান্তবাবু তাহলে ধনী লোক ছিলেন।

—বিয়ের পর তাঁর অবস্থা ফিরে যায়। আগে অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। শ্বশুরের সহযোগিতায় ব্যবসায় নেমে টাকা করেন।

—কতদিন আগে বিয়ে করেছিলেন তিনি ?

—আমার ইংল্যাণ্ড যাবার বছর দুয়েক আগে। তা ধর গিয়ে বছর পাঁচেক হল।

—সুচেতাদেবীর সঙ্গে তোমার আলাপ হয় কোথায় ?

—ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবেই। অরবিন্দদা ওখানকার সেক্রেটারি ছিলেন। সেই সূত্রে ও ওখানে যাওয়া আসা করত হঠাৎ একদিন আলাপ হয়ে গেল। তারপর···

বাসব মৃদু হেসে বলল, বুঝেছি। আপাততঃ তোমাকে আর কোন প্রশ্ন করব না।

বিকেলে বাসব একাই বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অজস্র চিন্তা ওকে বিমনা করে তুলেছে। হঠাৎ বাসবের দৃষ্টি পড়ল, তারের বেড়ার উপরকার সুন্দর আইভি লতার ঝোপের উপর। ওখানে কি একটা আটকে রয়েছে। তাই তো, এগিয়ে গিয়ে দেখল বেড়ার একধারে লাল রংয়ের কাপড়ের একটা টুকরো আটকে রয়েছে। টুকরোটা ইঞ্চি তিনেকের হবে।

বেড়ার উপর থেকে কাপড়ের টুকরোটা তুলে নিয়ে নিজের পকেটে রাখল বাসব।

আরো কিছুক্ষণ বাগানে ঘুরে বেড়িয়ে বাড়িতে ফিরে এল ও। ড্রইংরুমে দেখা হল সৈকতের সঙ্গে। সৈকত চুপচাপ বসেছিল।

বাসব বলল, এবার আমি নিজের কাজ আরম্ভ করতে চাই। তুমি ডাঃ গুপ্তকে প্রথমে ডেকে দাও।

সৈকত ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দিবাকর গুপ্ত এলেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা তাঁর। মাথায় সুচিক্কণ টাক। মুখ অসম্ভব গম্ভীর।

—আপনাকে একটু বিরক্ত করব ডাঃ গুপ্ত।

—বিলক্ষণ। বলুন ?

—আমার ধারণা আপনিই বোধহয় প্রথম প্রশান্তবাবুকে মৃত অবস্থায় দেখেন। এত দ্রুত আপনি কি ভাবে ওখানে পৌঁছালেন ?

—এ প্রশ্নের উত্তর পুলিশকে আমি আগেই দিয়েছি। শব্দ শুনে গিয়েছিলাম ওখানে।

—পুলিশকে যে স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন তা আমি পড়েছি, কিন্তু ওই উত্তরে আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না। আমার এই একটা প্রশ্নের মধ্যেই অনেকগুলো প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। যেমন ধরুন, কেন আপনি জেগে ছিলেন, কি ধরনের শব্দ আপনি শুনতে পেয়েছিলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে আর কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন কিনা, ইত্যাদি।

দিবাকর গুপ্ত চুপ করে রইলেন।

বাসব আবার বলল, আপনাদের পূর্ণ সাহায্য না পেলে এই জটিল কেসের সমাধান কোন মতেই হবে না ডাঃ গুপ্ত।

ডাঃ গুপ্ত বললেন, এবার আমি আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সব সময় প্রস্তুত বাসববাবু। আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি যথাযথই দিচ্ছি। খাওয়া দাওয়ার পর নিজের ঘরে বসে রেডিওতে বি.বি.সি. শুনছিলাম। হঠাৎ মনে হল, করিডরে কি যেন একটা পড়ল। উঠে গেলাম দেখবার জন্য, ঘর থেকে বাইরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ কানে এল। ছুটে বাইরের বারান্দায় আসতেই ওই দৃশ্য চোখে পড়ল। তখন কাউকে সেখানে দেখিনি।

—করিডরে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দটা কি ধরনের?

—শব্দটা···হাল্কা লোহা জাতীয় কোন জিনিস পড়ে গেলে যে ধরনের শব্দ হয়, ঠিক সেই ধরনের।

প্রায় এক মিনিট জানালার দিকে তাকিয়ে কি ভাবল বাসব, তারপর প্রশ্ন করল, আপনি কোথায় প্র্যাকটিশ করেন?

—আমি রিসার্চ করি। মেনেনজাইটিসের একটা অব্যর্থ সিরাম বার করবার চেষ্টা করছি।

—ও। ইয়ে···মানে···আপনার···

ডাঃ গুপ্ত হাসলেন—কি ভাবে আমার সংসার চলে বলছেন?

—হ্যাঁ।

বাবা মারা যাবার সময় বেশ কিছু রেস্ত রেখে গেছেন, তাই দিয়েই চলে যায় হেসে খেলে।

বাসব প্রশ্নের মোড় ঘোরাল, প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?

—প্রশান্ত আমার ছোট বেলাকার বন্ধু। আমার সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গতা ছিল তার।

—আপনার বন্ধুকে কে এইভাবে খুন করতে পারে, এ সম্বন্ধে কোন ধারণা আপনার আছে?

—না। আমি অনেক ভেবেও এ সম্বন্ধে কোন ধারণা খাড়া করতে পারিনি।

—বাসব পকেট থেকে সেই ফটোগ্রাফখানা বার করে বলল, এটা কার ছবি বলুন তো?

—চিনতে পারছি না।

—আপনাকে আর আটকে রাখব না। দয়া করে রত্নাদেবীকে গিয়ে পাঠিয়ে দিন।

দিবাকর গুপ্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রায় দশ মিনিট পরে রত্নাদেবী এলেন। দীর্ঘাঙ্গী স্বরূপা মহিলা। সুগায়িকা তিনি। বেতারে ও জলসায় গান গেয়ে থাকেন। এই অঘটনে কেমন মনমরা হয়ে পড়েছেন। দুচোখ লাল হয়ে রয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় প্রচুর কেঁদেছেন বোধহয়।

বাসব তাঁকে বসতে অনুরোধ করল। একটা কোচে বসতে বসতে রত্নাদেবী বললেন, আমায় ডেকেছেন?

—হ্যাঁ। শুনেছেন বোধহয় হত্যা তদন্তের ভার আমার উপর এসে পড়েছে। গোটা কয়েক প্রশ্ন আপনাকে করব।

—বেশ তো, করুন।

দুর্ঘটনার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

—রজতবাবুর ঘরে। তাঁর আঁকা ছবি দেখছিলাম।

—গুলির শব্দ শুনে আপনারা দুজনেই বোধহয় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন?

—আমি একলাই বেরিয়ে এসেছিলাম।

—কেন?

—রজতবাবু সে সময় ঘরে ছিলেন না।

—রজতবাবুর অনুপস্থিতেই আপনি তাঁর ঘরে গিয়েছিলেন ছবি দেখতে?

—হ্যাঁ।

—সেদিন রাত্রে খাওয়ার টেবিলে আপনাকে দেখতে পাইনি কেন বলুন তো?

—গা গুলাচ্ছিল বলে খেতে যাইনি।

—নাগচৌধুরীদের সঙ্গে আপনার আলাপ কি সূত্রে বলবেন কি?

রত্নাদেবী শান্ত গলায় বললেন, সুচেতা কিছুদিন আমার কাছে গা
শিখেছিল, তখনই আলাপ হয়ে যায় সৈকতবাবুর সঙ্গে।

বাসব ফটোগ্রাফখানা এগিয়ে ধরল, বলল, কার ছবি এখানা বলতে পারে

—না।

—প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল?

না।

—কিছু মনে করবেন না। আপনি কি বিবাহিতা—

—আপনার প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য না হয়ে পারছি না। আমার সিঁথি
সিঁদুর না দেখেও কি বুঝতে পারছেন না?

—মেয়েরা অনেক সময় আজকাল সিঁথিতে সিঁদুর দেয় না। তাই···

হাসলেন রত্নাদেবী। হাসিটা করুণ দেখাল।

—আমি কুমারী বাসববাবু। গান-বাজনা নিয়ে থাকি, বিয়ে কর
অবকাশ আর পেলাম কোথায়।

বাসব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আর বিরক্ত করব না চলুন আপনাকে এগি
দিয়ে আসি।

পাশাপাশি দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। টানা বারান্দার শেষ প্রা
রত্নাদেবীর ঘর। ঘরে ঢুকে যাবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি বললেন, কবে নাগাদ ছা
পাব বলতে পারেন।

—সঠিক বলা দুষ্কর।

রত্নাদেবী ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলে, বাসব কয়েক পা পেছিয়ে এসে এক
দরজায় টোকা দিল।

—আসুন।

আহ্বান পেয়ে দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে গেল বাসব। মাঝারি সাইজে
ছিমছাম ভাবে সাজান ঘরখানা। বিরাট একটা ফ্লাওয়ারভাস রাখা টেবিলে
সামনে, কার্পেট পাতা মেঝের উপর মুহ্যমানের মত বসে রয়েছেন তন্দ্রা রায়
আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর চেহারার অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। মিসেস রা
মুখ তুললেন। মনের সমস্ত বেদনা যেন চোখের কোণেই জমাট বেঁধে রয়েছে।

বাসব কার্পেটের উপর বসে পড়ে মৃদু স্বরে বলল, আপনাকে সান্ত্বনা জানাবা
ভাষা আমার নেই মিসেস রায়। তবে আপনার স্বামীর হত্যাকারীকে খুঁ
বার করবার দায়িত্ব আমি নিয়েছি।

—তন্দ্রাদেবী নীরব রইলেন।

সেই দায়িত্বের খাতিরে আপনাকে একটু বিরক্ত করব। তন্দ্রাদেবীর চোখে
শ্ন দৃষ্টি ফুটে উঠল।

—আপনি বলতে পারেন, সেদিন মিঃ রায় পাটনা গিয়েছিলেন কেন?

না। তিনি আমায় কিছু বলেন নি।

—আচ্ছা, আপনার স্বামী কি সব সময় নিজের কাছে রিভলবার
খতেন?

না। কালে-ভদ্রে সঙ্গে নিয়ে বেরুতেন।

—কোথায় ছিল অস্ত্রটা?

আঙুল নির্দেশ করে তন্দ্রাদেবী বললেন, ওই ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে।
খানে এসে উনি ওটা ওর মধ্যেই রেখেছিলেন।

—ও। আচ্ছা, একটা কথা ভেবে বলুন তো। দুর্ঘটনার দিন কোন সময়
উ আপনার ঘরে ঢুকেছিল কিনা জানেন?

একটু ভেবে নিয়ে তন্দ্রাদেবী বললেন, ডাঃ গুপ্ত বোধহয় একবার আমার
র ঢুকেছিলেন।

—কি রকম?

—আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম। ফিরে আসবার সময় দেখলাম তিনি
থেকে বেরিয়ে গেলেন। অবশ্য তাঁর মুখ আমি দেখতে পাইনি।

—তখন কটা?

রাত সাড়ে নটা হবে বোধহয়।

—হুঁ। আচ্ছা মিসেস রায়, আপনার স্বামী খুব ল্যাভেণ্ডার পছন্দ
রতেন, তাই না?

—কই, না তো?

একটা রুমাল বার করে বাসব বলল, এটা মিঃ রায়ের পকেটে পাওয়া গেছে।
তে ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ রয়েছে।

মিসেস রায় রুমালখানা ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, এটা তাঁর নয়।
নি রঙিন রুমাল ব্যবহার করতেন না।

রুমালের সঙ্গে পকেট থেকে সেই ছেলেটির ফটোগ্রাফখানাও বার করেছিল
সব।—দেখুন তো একে চেনেন কিনা?

এক নজর দেখে নিয়ে তন্দ্রা রায় বললেন, চিনতে পারলাম না।

—ছবিখানা কিন্তু আপনার স্বামীর পকেটেই পাওয়া গেছে। ভাল ক
দেখুন চিনতে পারেন কিনা।

—আমি ঠিকই বলছি। ছেলেটিকে চিনি না। আর কোন প্রশ্ন করল
বাসব। বিদায় নিল মিসেস রায়ের কাছ থেকে।

পরের দিন দুপুরে থানায় গেল বাসব। সৌভাগ্যক্রমে শুক্লা থানা
ছিলেন। সাদরে বসালেন ওকে। চা আনতে আদেশ দিলেন। সিগারে
প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, কতদূর এগুলেন ?

বাসব সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, এগুচ্ছি গুটি গুটি পা পা করে।

—এদিকে আমি সদরে আপনার কথা বলে পাঠিয়েছিলাম কর্তাদের কা
তাঁরা এই তদন্তে আপনার সাহায্য নিতে প্রস্তুত আছেন।

—ধন্যবাদ। আপনি কতদূর ?

—বেশী এগুতে পারিনি। তবে আজ নতুন একটা সংবাদ পেয়েছি।

—কি সংবাদ ?

একজন পাহারাদারের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, দুর্ঘটনার দিন রা
পৌনে এগারটার সময় সে একজনকে নাগচৌধুরী হাউসের মধ্যে প্রবেশ কর
দেখেছে। সেই লোকটির মুখ পাহারাদার দেখতে পায়নি। তার গা
ওভারকোট ছিল, মাথায় হ্যাট ছিল এইটুকুই শুধু বলতে পেরেছে।

—হুঁ। পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠেছে।

—ছবিটা সম্বন্ধে কিছু করতে পারলেন ?

—কিছুই না। ছবিখানা কার জানা গেলে রহস্য কিছুটা পরিষ্কার হ
বোধহয়। কেউই নাকি চেনেনা ছেলেটাকে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওঁ
মধ্যে একজনও ওর পরিচয় জানেন অথচ অস্বীকার করে যাচ্ছেন। আরেক
কথা, ল্যাভেণ্ডার মাখানো রুমাল মিঃ রায় ব্যবহার করতেন না, তবু তাঁর পকে
ওই রুমালখানা গেল কিভাবে ?

শুক্লা মাথা নেড়ে বললেন, এই দুটো প্রশ্নের সমাধান আগে দরকার। খু
খুন করবার পর কিভাবে গা ঢাকা দিয়েছিল, সে বিষয় কিছু ভেবেছেন ?

—হত্যাকারীকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই কাজ করতে হয়েছিল। যত
আন্দাজ করছি, গুলি করবার পর সে পালায়নি। বারান্দায় যে বড় বড় থ
আছে তারই কোন একটার পিছনে লুকিয়ে পড়েছিল। তারপর সকলে
হলে, ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে নেওয়ায় আমরা কিছু ধরতে পারিনি।

—একথা স্বীকার করতেই হবে হত্যাকারী অত্যন্ত রিস্ক নিয়েছিল। যাই হোক, পোস্টমর্টমের রিপোর্ট এসেছে। রিপোর্ট দেখলে আপনি অবাক হবেন।

শুক্লা রিপোর্টখানা এগিয়ে দিলেন। বাসব তাতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিস্মিত ভাবে মুখ তুলল। শুক্লা ঘাড় নাড়লেন।

থানা থেকে বেরিয়ে বাসব ঘুরতে ঘুরতে নাগচৌধুরী প্যালেসের পিছন দিকে এসে উপস্থিত হল। জায়গাটা খুব পরিচ্ছন্ন নয়। গরুর গাড়ি যাতায়াত করায় কোন রকমে একটা রাস্তার সৃষ্টি হয়েছে।

বাসব লক্ষ্য করল, নাগচৌধুরী প্যালেসের বাউণ্ডারি ওয়ালে ছোট দরজা রয়েছে একটা। ওই পথ দিয়ে মেথর যাওয়া আসা করে বোধহয়।

বাসব দরজার দিকে এগিয়ে যাবার সময় মাটি থেকে কুড়িয়ে পেল একটা মিজরাব। সেতার বাজাতে গেলে এই জিনিসটার বিশেষ প্রয়োজন হয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে মিজরাবটা পিছন থেকে কে বলে উঠল, এখানে কি করছেন মশাই ?

চমকে মুখ ফিরিয়ে বাসব দেখল 'সানরাইজ' হোটেলের মালিক বটুকবাবু। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বাসবের। মৃদু হেসে ও বলল, ঘুরে ফিরে দেখছি এধারটা।

—দেখুন দেখুন, যদি কোন সূত্রটুত্র পেয়ে যান।

—সূত্রের সন্ধানে আমি এখানে এসেছি আপনাকে কে বলল ?

নির্বিকার গলায় বটুকবাবু বললেন, কে আবার বলবে। এ সমস্ত তো আন্দাজে বুঝে নিতে হয় মশাই।

—আপনি এখানে কি মনে করে বটুকবাবু ?

—রণদাবাবুর বাড়িতে যাবার এই তো আমার পথ। হোটেল থেকে শর্ট-কার্ট হয় আর কি। কোন সূত্র পেলেন নাকি ?

—না। তেমন কিছু···

—আপনাকে বোধহয় আমি কিঞ্চিৎ সাহায্য করতে পারব। ওই দেখুন, কি দেখছেন ওখানে ?

বটুকবাবুর আঙুল দিয়ে নির্দেশ করা জায়গাটা দেখল বাসব—মোটরের টায়ারের ছাপ রয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারল না কি বোঝাতে চাইছেন তিনি। মোটরের টায়ারের ছাপে অস্বাভাবিকত্ব কোথায়।

—আপনি স্থানীয় লোক নন তাই জানেন না—বটুকবাবু বললেন, এটা

পথই নয়। জোর করে গরুর গাড়ি চালান হয় এখান দিয়ে। মোটর যাওয়া-আসা করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া দেখছেন, গাড়িটা খুব বেশী দূর এগোয়নি।

বাসব দেখল টায়ারের দাগ বাউণ্ডারি ওয়ালের পিছনে এসেই থেমে গেছে।

—বটুকবাবু, মনে হচ্ছে আপনি যেন কিছু ইঙ্গিত করছেন?

ঠিকই ধরেছেন। আরেকটা কথা বললে আমার ইঙ্গিত আরেকটু পরিষ্কার হবে বোধহয়। সেদিন মিঃ রায় পাটনা যাবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরুলেও তখুনি পাটনা যাননি। এক ঘণ্টার উপর আমার হোটেলের একটা কেবিনে গিয়ে বসেছিলেন।

বাসবের মনের মধ্যে চিন্তা দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল।

—কিন্তু আপনি একথা জানলেন কিভাবে? মিঃ রায় যখন বেরিয়ে যান তখন তো আপনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

—তাতো ছিলামই। আমি যখন হোটেলে ফিরি তখন দেখি মিঃ রায় হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছেন। তিনি আমাকে দেখতে পাননি। আমি অবাক হয়ে ম্যানেজারের কাছে খোঁজ-খবর নিতেই, ম্যানেজার বলল, ওই ভদ্রলোক ঘণ্টাখানেকের উপর এখানে ছিলেন।

—আর কিছু জানেন বটুকবাবু?

—না মশাই। আপনি বুদ্ধিমান লোক, এর মধ্যে থেকেই অনেক সূত্র পাবেন আশা করি। আসুন ভেতরে যাই। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। এই শীতে বৃষ্টিতে ভিজলে নিউমোনিয়া নির্ঘাৎ।

বাসব আকাশের দিকে তাকালো। কালো মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। বৃষ্টি নামল বলে। বটুকবাবু মেথরের প্যাসেজের দিকে এগিয়ে গেলেন, বাসব তাঁকে অনুসরণ করল।

বেলা তখন দেড়টা হবে।

খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আগে। বাসব চিন্তিত মুখে নিজের ঘরে পায়চারি করছে। বহুদিন পরে বেশ জটিল রহস্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে ওকে। দুটো জিনিসই ওর কাছে এখন সম্পূর্ণ অন্ধকারে। এক, খুনের মোটিভ কি? দুই, খুনী কে?

খুনের মোটিভ সম্বন্ধে যদি কোন আঁচ পাওয়া যেত, তাহলে অবশ্য রহস্য

অনেক সরল হয়ে যেত। মোটিভ সম্বন্ধে প্রচুর চিন্তা করে দেখেছে বাসব। প্রশান্ত রায়ের পূর্বের অবস্থা হীন হলেও বর্তমানে মোটামুটি ধনী ব্যক্তি ছিলেন। এখানে উপস্থিত প্রত্যেক অতিথির সঙ্গে তাঁর আলাপ থাকলেও, এমন কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, যাতে প্রমাণিত হয় তিনি মারা গেলে অমুক ব্যক্তি তাঁর অর্থের অধিকারী হবে।

তবে কি অর্থ ই অনর্থের মূল নয়?

বাসব সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ভাবতে লাগল। মোটিভ নেই অথচ একটা খুন হয়ে গেল তা কখনই হতে পারে না। মোটিভ একটা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেটা কি? তারপর ওই বাচ্চা ছেলের ফটোগ্রাফখানা, ওখানাই বা প্রশান্ত রায়ের পকেটে ছিল কেন? তাছাড়া ওই ছবিখানা যে কার সে কথাও কেউ বলতে পারছে না। বিচিত্র রহস্য।

বাসব সিগারেটে ঘন ঘন বার কয়েক টান দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চিন্তাকে এখন আর প্রশ্রয় দেবে না। বরং এই সময় যে কাজগুলো হয়নি, সেগুলো সেরে নেওয়া ভাল অর্থাৎ এখনও যাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা হয়নি তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেওয়া।

বাসব রজত ভৌমিকের ঘরের দরজায় গিয়ে করাঘাত করল।

ভৌমিক তখন একটা পেন্সিল স্কেচ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

মুখ তুলে বললেন, কে?

-ভেতরে আসতে পারি?

কণ্ঠস্বরেই মানুষটিকে চিনতে পেরেছিলেন ভৌমিক। উঠে গিয়ে দরজার অর্গল মুক্ত করে দিয়ে বললেন, আসুন বাসববাবু—

বাসব ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, ছবি আঁকছিলেন?

—কি আর করি বলুন। এখানে যখন আটকে পড়া গেছে তখন এই বিরাট অবসরে ছবির সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ। বসুন—

বাসব একটা গদী মোড়া চেয়ারে বসে পড়ে অর্ধ-সমাপ্ত ছবির দিকে তাকিয়ে বললে, মনে হচ্ছে যেন, নাগচৌধুরী হাউসের সামনের বাগানে যে স্ট্যাচুটা রয়েছে—

ঠিকই ধরেছেন। সেই স্ট্যাচুরই স্কেচ করছি। তারপর কেসটার সম্বন্ধে কতদূর কি হল মশাই?

—এখনও আমি এবং পুলিশ পক্ষ অন্ধকার হাতড়েই বেড়াচ্ছি। ওই খুন

সম্পর্কেই আপনার কাছে এলাম। গোটা কয়েক প্রশ্ন করব। অবশ্য আপনার সময় কিছু নষ্ট হবে।

—সেজন্য আপনি চিন্তা করবেন না মিঃ ব্যানার্জি। হোক সময় নষ্ট। আপনি আমায় কি বলতে চান বলুন।

—বাসব নড়ে চড়ে বসে নিজের প্রশ্ন আরম্ভ করল, যখন প্রশান্ত রায় খুন হন অর্থাৎ রাত্রি এগারটা আন্দাজ আপনি কোথায় ছিলেন ?

দ্রুত গলায় রজত ভৌমিক বললেন, কেন, নিজের ঘরে।

—কি করছিলেন ?

—ছবি আঁকছিলাম।

—ও। সেই ছবিটা একবার দেখাবেন।

—নিশ্চয়ই। এই দেখুন না।

টেবিলের উপর থেকে ছবিখানা তুলে বাসবের দিকে এগিয়ে ধরলেন ভৌমিক। ১৪×৮ ইঞ্চি সাইজের কাগজের উপর আঁকা ছবিখানা। মেয়ের মুখ। এখনও অর্ধসমাপ্ত। মুখের ছায়াময় কঙ্কাল বলে মনে হয়।

ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বাসব বলল, রত্নাদেবীর সঙ্গে তো আপনাব আলাপ আছে, না ?

…আছে। এখানে আসবার সময় ট্রেনে আলাপ হয়।

—প্রশান্তবাবুকে আপনি ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন ?

—ঘনিষ্ঠ বলতে যা বোঝায় সে রকম আলাপ অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমার ছিল না। তবে মুখ চেনাচিনি ছিল। কোথাও দেখা সাক্ষাত হলে আমরা কুশল প্রশ্ন বিনিময় করতাম।

—এই মুখ চেনাচিনি আপনাদের কিভাবে হয় ?

একটু থেমে উত্তরটা মনের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে ভৌমিক বললেন, অরবিন্দ দত্তের মাধ্যমেই আমাদের আলাপ হয়েছিল। আপনি জানেন কিনা জানি না, অরবিন্দবাবু কলকাতার একটা রাইফেল ক্লাবের পাণ্ডা বিশেষ। ওই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্রশান্তবাবুর শ্বশুরমশাই। একজন নিয়মিত ডোনারও। আমি ওঁরই ছবি আঁকতে যেতাম ওখানে। অরবিন্দবাবু একদিন মিঃ রায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

—অরবিন্দবাবুর সঙ্গে প্রশান্ত রায়ের বুঝি খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল ?

—ছিল, তবে—

—থামলেন কেন ?

রুমাল দিয়ে নিজের মুখ ভাল করে মুছে নিয়ে রজত ভৌমিক বললেন, বললাম না মিঃ রায়ের শ্বশুরমশাই রাইফেল ক্লাবের একজন বড় ডোনার ছিলেন। তিনি একদিন শ্বশুরের এই বদান্যতা বন্ধ করে দিলেন। এ ব্যাপারেই তাঁর সঙ্গে অরবিন্দবাবুর মতান্তর হয়েছিল।

প্রায় পাঁচ মিনিট বাসব কোন কথা বলল না। বসে রইল চুপচাপ। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়ালো। খোলা জানালার পাশে মাঝারি সাইজের একটা টেবিল ছিল। তার উপরকার জিনিসপত্রগুলো নাড়াচাড়া করল—ফিরে এসে বসল আবার নিজের চেয়ারে।

—আচ্ছা মিঃ ভৌমিক, প্রশান্তবাবু খুন হওয়া সম্পর্কে আপনি কাউকে সন্দেহ করেন ?

—কাকে করব বলুন ?

—আপনি ল্যাভেণ্ডার ব্যবহার করেন কি ?

এই অদ্ভুত প্রশ্নে ভেবাচেকা খেলেন রজত ভৌমিক। তিনি বললেন, ল্যাভেণ্ডার। কই না তো !

—একটু ভেবে বলুন।

—যা আমি মোটেই ব্যবহার করি না, সে সম্বন্ধে ভেবে আর কি বলব !

বাসব আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার পাশের টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেল। টেবিলের উপর অনেক কিছুর সঙ্গে প্রসাধন সামগ্রীও ছিল। তার মধ্যে থেকে একটা সুদৃশ্য শিশি তুলে নিয়ে বলল, এটা যেন ল্যাভেণ্ডারের শিশি বলেই মনে হচ্ছে ? দেখুন তো ?

বিস্মিত ভঙ্গীতে রজত ভৌমিক বাসবের হাত থেকে ল্যাভেণ্ডারের শিশিটা নিলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, তাইতো ! ল্যাভেণ্ডারের শিশিই। কিন্তু আমার ঘরে কি ভাবে এল ?

—সত্যকে মিথ্যে দিয়ে কেন ঢাকছেন ?

—বিশ্বাস করুন, এই শিশিটার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। ল্যাভেণ্ডার দূরের কথা, জীবনে সেণ্টই ব্যবহার করলাম না।

—আপনার কথা বিশ্বাস করে নিলেও, এই শিশিটা পায়ে হেঁটে আপনার ঘরে এসেছে তাও নিশ্চয় বিশ্বাসযোগ্য নয়।

—আমিও আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি কেউ নিশ্চয়ই রেখে গেছে শিশিটা। কিন্তু

কি ব্যাপার বলুন তো? হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই ল্যাভেণ্ডারের শিশির যোগ আছে নাকি?

—শিশিটার আছে কিনা বলতে পাচ্ছি না। তবে ল্যাভেণ্ডারের হয়তো কোন যোগাযোগ আছে।

বাসব শিশিটা পকেটস্থ করে বলল, চললাম। শিশিটা নিয়ে যাচ্ছি।

রজত ভৌমিককে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে ও ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দায় পা দিয়েই আবার পাশের ঘরে নক্ করল।

—ভেতরে আসুন।

বাসব ঘরে প্রবেশ করল।

সামনেই দাঁড়িয়ে সুচেতা।

—আমি আপনার অপেক্ষা করছিলাম বাসববাবু।

—আমার।

হ্যাঁ?

—কেন বলুন তো?

আপনি সকলকেই খুন সম্বন্ধে জিগ্যেসবাদ করছেন, আমাকে আর দাদাকে কি আর বাদ দেবেন? বাসব মৃদু হেসে বলল, আপনি খুবই বুদ্ধিমতী।

—বলুন কি জানতে চান আমার কাছ থেকে?

—গোটা কয়েক সাধারণ প্রশ্নের উত্তর পেলেই আমি খুশী হব। আপনি প্রশান্ত রায়ের সঙ্গে নিশ্চয় পরিচিত ছিলেন?

—ছিলাম। কলকাতার এক রাইফেল ক্লাবে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। উনি নিজের স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে যেতেন।

—আপনি রাইফেল ক্লাবে যেতেন কেন?

—আমার দাদা ওখানকার সেক্রেটারি ছিলেন। যেতাম মাঝে মাঝে।

—মিস দত্ত?

—বলুন?

—আপনি যখন রাইফেল ক্লাবে ঘোরাঘুরি করেছেন তখন আশা করা যায় গান হ্যাণ্ডেল করতে পারেন?

হেসে উঠল সুচেতা।—আমাকেই সন্দেহ করলেন শেষ পর্যন্ত!

বাসব দৃঢ় গলায় বলল, আমার প্রশ্নের উত্তর এ নয়।

—হ্যাঁ পারি।

—আপনি এ-বাড়ির বৌ হতে চলেছেন। আপনার সঙ্গে সৈকতের কিভাবে আলাপ পরিচয় হয় তা আমি জানি। প্রশ্নের মোড় ওধারে ঘোরাব না। এখন অনুগ্রহ করে বলুন, দুর্ঘটনার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

—কেন, এই ঘরে।

বাসব পূর্ণ দৃষ্টিতে সুচেতার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি যদি বলি সেই সময় আপনি এ ঘরে ছিলেন না।

সুচেতা উত্তেজিত ভঙ্গীতে বলল, প্রকারান্তরে নয়, আপনি পরিষ্কার ভাবেই আমাকে মিথ্যাবাদী বললেন।

—আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন মিস দত্ত। আমি যা জানি তাই আপনাকে বললাম।

—আপনি ভুল জানেন। আমি সে সময় ঘরে ছিলাম। এই সময় ঘরে প্রবেশ করলেন অরবিন্দ দত্ত।

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দীর্ঘ পেশল দেহ তাঁর। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মধ্যে।

তিনি ভ্রূ কুঁচকে বাসবের দিকে তাকালেন। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

বিরক্তি সহকারে অরবিন্দ দত্ত বললেন, আপনারা একি কাণ্ড করে তুলেছেন মশাই?

নির্লিপ্ত গলায় বাসব প্রশ্ন করল, কোন কাণ্ডর কথা বলছেন?

—পুলিশের কাণ্ডকারখানার কথা বলছি। আমরা আর কতদিন এইভাবে নজরবন্দী হয়ে থাকব?

—আমি যতদূর শুনেছি, আপনারা সকলেই দিন দশেক হাতে নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছেন। কাজেই এত তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হবার তো কোন কারণ নেই। ভেবে নিন না, পুলিশের নজরবন্দীতে আপনারা নেই। খেয়ে-দেয়ে বেড়িয়ে দশ দিন কাটিয়ে এখান থেকে চলে যাবেন।

—ভেবে নিতে চাইলেই কি সব কিছু ভেবে নেওয়া যায়। তাছাড়া সকলকে আটকে রেখে তো লাভ নেই। যারা সন্দেহের বাইরে তাদের ছেড়ে দিলেই হয়।

বাসব অল্প একটু হেসে বলল, কিন্তু সন্দেহের বাইরে যে কেউ নেই। এমন কি আপনিও—

—আমি! আকাশ থেকে পড়লেন অরবিন্দ দত্ত।—আমি কি করলাম। আপনারা আমাকে কেন সন্দেহ করছেন?

আপনাকে সন্দেহ করার বিশেষ কারণ রয়েছে মিঃ দত্ত।

—কোন কারণ নেই।

—আছে।

—আমার সম্পর্কে কোন কথা জোর করে বললেই যে আমি মেনে নেব, তা ভেবে নিয়ে থাকলে ভুল করেছেন। এখন বলবেন কি আমাকে সন্দেহ করার কারণ ?

—বলব বইকি। প্রশান্তবাবু খুন হওয়ার পর, আমরা যখন গাড়ি বারান্দায় উপস্থিত রয়েছি, তখন বাগানের গেটের দিক থেকে আপনাকে আসতে দেখা গিয়েছিল। আপনার আচরণে ত্রস্তভাব ফুটে উঠেছিল। এর কারণ কি মিঃ দত্ত ?

বাসবের কথা শুনে অরবিন্দ দত্ত একটু থতমত খেলেন।

—আমি…আমি…

—যে সময়ে মানুষের লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমাবার কথা, সেই সময় অন্ধকার বাগানের মধ্যে আপনি কি করছিলেন ?

—বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বেড়ান আমার অনেক দিনের অভ্যাস।

—এই প্রচণ্ড শীতে রাত এগারটার সময় বেড়াতে বেরিয়েছিলেন ! কথাটা অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমাকে সত্যি কথাটা বললেই ভাল করবেন।

—আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলেছি।

—যাক, এবার আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে আসি কি বলেন ? বাসব বলল, প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল সংবাদ পেয়েছি। তিনি…

—ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল না। মোটামুটি পরিচয় ছিল বলতে পারেন।

—ওই হল। তারপর আপনাদের মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হয়। বিশদ কারণটা যদি আমাকে জানান তাহলে বিশেষ ভাল হয় মিঃ দত্ত।

—খুনের তদন্তর সঙ্গে এই সমস্ত কথার যে কি সম্পর্ক আমি বুঝতে পারছি না।—ওহো, প্রশান্ত রায়ের সঙ্গে রাইফেল ক্লাবে একবার আমার বচসা হয়েছিল, তাই কি আমাকেই খুনী ঠাওরালেন ?

—দেখুন অরবিন্দবাবু, আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছাধীন। তবে সঠিক ভাবে যদি সমস্ত কথা বলেন তবে আমার তদন্তের সুবিধা হবে।

অরবিন্দ দত্ত প্রায় দুমিনিট চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আমাদের রাইফেল ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রামেশ্বর বসু। প্রশান্ত রায় তাঁর জামাই। ওখানেই মিসেস রায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় এবং পরিশেষে বিয়ে। ক্লাবের সেক্রেটারি হিসেবে মিঃ রায়কে মোটামুটি চিনতাম। তাঁকে ভালই লাগত। হঠাৎ একদিন তিনি একটা কাণ্ড করে বসলেন! প্রতি বছরেই রামেশ্বরবাবু মোটা টাকা ডোনেসান দিতেন ক্লাবকে। সেবার মিঃ রায় শ্বশুরের এই বদান্যতা বন্ধ করে দিলেন। এই নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তারপর থেকে আমরা দুজনে দুজনের সঙ্গে কথা বলতাম না।

বাসব পকেট থেকে ফটোগ্রাফখানা বার করল। মেলে ধরল দুজনের সামনে।

—দেখুন তো—বলতে পারেন এই ছবিখানা কার?

—না।

অরবিন্দ অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। সুচেতাও।

বাসব আর কোন প্রশ্ন করল না। ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন ইন্সপেক্টর শুক্লা। কলকাতা যাওয়ার কোন অসুবিধাই হল না বাসবের। যাওয়ার আগে সৈকতকে বলে গেল দিন পাঁচেকের মধ্যেই ফিরবে। ও যেন অতিথিদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

বাসব কলকাতায় পৌঁছাল বেলা সাড়ে এগারোটার সময়। বাড়ি গিয়ে খাওয়া দাওয়া সারতে সারতে প্রায় দুটো বেজে গেল। তারপর ও বেরুল লালবাজারের উদ্দেশ্যে। অফিসেই ছিলেন মিঃ সামন্ত ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের দুঁদে অফিসার তিনি। বাসবকে দেখে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা জানালেন।

সহাস্যে বললেন, বিনা প্রয়োজনে নিশ্চয়ই আসেননি?

বাসবও সহাস্যে বলল, বলা বাহুল্য।

মিঃ সামন্ত সিগারেটের কেসটা এগিয়ে ধরে বললেন, প্রয়োজনটা শুনি। দেখি মুশকিল আসান করতে পারি কি না।

বাসব একটা সিগারেট তুলে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করল। তারপর পকেট থেকে প্রশান্ত রায়ের পকেটে পাওয়া রুমালটা বার করে বলল, এই রুমাল যে ধোপা কেচে ছিল তার সন্ধান চাই।

রুমালটা নেড়ে চেড়ে দেখে সামন্ত বললেন, মার্কাটা বেশ পরিষ্কার উঠেছে।

কিন্তু এই বিরাট শহরে কোন ধোপা এই মার্কা ব্যবহার করে তা খুঁজে বার করা এক আধ ঘণ্টার কর্ম নয়। অন্ততঃ ছদিন সময় দিতে হবে।

—বেশ, ছদিনই সময় নিন। সাদা কথা রজক প্রবরের সন্ধান চাই।

—তা না হয় করে দেওয়া গেল। এবার বলুন তদন্তটা কি।

বাসব আদ্যপান্ত সমস্ত ঘটনাটা বলল। এইভাবে ঘণ্টা ছয়েক ওখানে কাটিয়ে বিদায় নিল।

লালবাজার থেকে ফিরে এসে ছপুরের বাকী সময় ঘুমিয়ে কাটাল বাসব। সারাটা রাত ট্রেনে এসেছে। ট্রেনে জেগে বসেছিল তা নয়। তবু আরেকটু ঘুমিয়ে নিলে শরীর চাঙ্গা হবে। বিকেল উতরে যাবার পর বাসব বাড়ি থেকে বেরুলো। প্রশান্ত রায়ের পকেটে পাওয়া বাচ্চা ছেলের ছবিখানা নিজের পকেটে ভরে নিয়ে ও বেরিয়েছে।

বাসব খুটিয়ে দেখেছে, ফটোগ্রাফখানা গ্লসি পেপারে প্রিণ্ট করা। উল্টো দিকের সাদা অংশ রবার স্ট্যাম্প দিয়ে যে দোকানে ছবি তোলা হয়েছে সেই দোকানের ঠিকানা লেখা রয়েছে। বাসব এখন যাবে সেই ফটোগ্রাফারের কাছে। যদি কোন সূত্র ওখানে পাওয়া যায়।

ফটো ডি মোনিকো থিয়েটার রোডে।

খুব বড় দোকান নয়। মাঝারি গোছের। সুদৃশ্য কাচের শো কেস আছে। বাসব গিয়ে দোকানে ঢুকলো। কাউণ্টারের লোকটি অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলছিল। তার সঙ্গে কথা শেষ করে বাসবের সামনে এসে বলল, বলুন—?

—আমি দোকানের ওনারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—আমিই ওনার। বলুন?

বাসব নীচু গলায় বলল, একটা খুনের তদন্তে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।

তারপর নিজের পরিচয় দিল। দোকানদার বাসবের নাম শুনেছিলেন। শুনেছিলেন বলা ঠিক হবে না। পড়েছিলেন। খবরের কাগজেই পড়েছিলেন ওর নাম। তিনি বেশ ভীত ভাবে বললেন আমার দোকানে খুনের তদন্ত করতে এসেছেন। আমি কিন্তু……

—আপনি ভয় পাবেন না। এই তদন্তের সঙ্গে আপনার কোন যোগ

নেই। কিছুদিন আগে একটি বাচ্চা ছেলের ছবি এখানে তোলা হয়। আমি সেই ছবির সম্পর্কেই গোটা কয়েক কথা আপনার কাছ থেকে জেনে নেব।

দোকানদার মুখ ফিরিয়ে বললেন, প্রভাত, কাউন্টারে এসে দাঁড়া। আমি একটু অফিস ঘরে যাচ্ছি। আসুন—

তিনি বাসবকে নিয়ে খুপরি মত একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। দুজনে দুটো চেয়ার অধিকার করে বসবার পর বাসব ছবিখানা এগিয়ে ধরে বলল, এই ছবিখানা আপনার স্টুডিওতে তোলা হয়েছিল। এই ছেলেটির বিষয় কিছু বলতে পারেন?

দোকানদার ছবিখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, রাবার স্ট্যাম্প রয়েছে যখন তখন ছবিখানা আমাদেরই তোলা। কিন্তু প্রত্যহ এত ছবি তোলা হয় যে কোন কিছু বলা দুষ্কর। দাঁড়ান, দেখছি চেষ্টা করে যদি কছু বলা যায়। প্রভাত—

—আজ্ঞে—

প্রভাত খুপরিতে প্রবেশ করল।

—আমাদের তোলা ছোটদের ছবির যে অ্যালবাম আছে, তাতে দেখতো এই ছবিখানা আছে কিনা। থাকলে লেজারটা নিয়ে এস।

প্রভাত ছবি নিয়ে চলে গেলে তিনি আবার বললেন, আমাদের স্টুডিওতে যে ছবিই তোলা হোক না কেন, এক কপি করে রেকর্ড হিসেবে নম্বর দিয়ে রেখে দেওয়া হয়।

মিনিট দশেক পরে প্রভাত একটা বিরাট লেজার নিয়ে উপস্থিত হল। বলল, এ ছবির ডুপ্লিকেট অ্যালবামে আছে স্যার। দু'হাজার বাহাত্তর নম্বর।

লেজার খুলে দু'হাজার বাহাত্তর নম্বর ছবির পরিচয় পাওয়া গেল, তোলা হয়েছে প্রায় এক বছর আগে। ঠিকানা, দীপক। C/o, প্রশান্ত রায়···নং কালী চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৩৪।

ঠিকানা দেখে বাসব বিস্মিত হল। কারণ প্রশান্ত রায়ের বাড়ি লেক প্লেসে। তাকে তাঁর শ্বশুর বাড়ি তৈরী করে দিয়েছিলেন সেখানে।

যাই হোক, খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। বাসব দোকানদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওখান থেকে বিদায় নিল। তখন প্রায় সাড়ে ছটা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ড্রাইভারকে টালিগঞ্জের দিকে যাবার নির্দেশ দিয়ে চিন্তার সমুদ্রে ডুব দিল বাসব। দীপক নামে ছেলেটি কে? প্রশান্ত রায়ের সঙ্গে কি সম্পর্ক? কালী চৌধুরী লেনে গিয়ে পড়তে পারলেই কি অনেক রহস্য আর রহস্য থাকবে না।

টালিগঞ্জে পৌছাবার পর, কালী চৌধুরী লেন খুঁজে বার করা খুব সহজ হল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। নামে লেন হলেও খুব সংকীর্ণ নয় পথটা। নির্দিষ্ট নম্বরের বাড়িতে গিয়ে দেখল, তালা ঝুলছে। তালার এবং দরজার অবস্থা দেখে মনে হয় বেশ কয়েকদিন থেকে বন্ধ রয়েছে।

বাসব পাশের বাড়ির দরজায় গিয়ে নক করল। এক ভদ্রলোক বেরিয়ে আসতেই প্রশ্ন করল, ও বাড়ির ওরা কোথায় গেলেন বলতে পারেন?

—তাতো বলতে পারবো না।

—প্রশান্ত রায় তো থাকেন ওখানে?

ভদ্রলোক বললেন, ও বাড়িতে প্রশান্ত রায় বলে কেউ থাকে না। একজন মহিলা থাকেন। আমি মশাই এ পাড়ায় নতুন এসেছি। সঠিক কিছু বলতে পারব না। তবে এসে অবধি মাঝে মাঝে একটা বাচ্চা ছেলে ছাড়া আর কোন পুরুষ মানুষ দেখিনি।

—ও। দেখুন, বিশেষ কারণে ওদের খোঁজ খবর নিতে এসেছি। আচ্ছা বলতে পারেন, যে মহিলা ওই বাড়িতে থাকেন তাঁর সঙ্গে এ পাড়ার কারুর সঙ্গে হৃদ্যতা আছে কিনা?

ভদ্রলোক একটু চিন্তা করে বললেন ওই দূরে হলদে রং-এর বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন। ওখানে কনক সেন থাকেন। তাঁর সঙ্গে পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলার ভাবসাব আছে দেখেছি।

বাসব ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে হলদে রং-এর বাড়ির দিকে এগুলো। হলদে রং-এর বাড়ির দরজার গোড়ায় গিয়ে দেখল নেমপ্লেট লাগান, ডাঃ মিস কনক সেন। কলিং বেলও রয়েছে। বাসব বেল পুস করল। বার দুয়েক বেল পুস করতেই দরজা খুলে গেল। মধ্য বয়স্কা একজন মহিলা দরজার ও প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে।

—আসুন।

বাসব ঘরের মধ্যে গেল।

কথায় বলে পুলিশের অসাধ্য কিছু নেই যাকে প্রয়োজন ঠিক সেই ধোপাকেই খুঁজে বার করেছে পুলিশ। মিঃ সামন্ত বাসবকে ফোন করলেন।

হেসে বললেন, আপনার রজকপ্রবর লালবাজারে উপস্থিত। চলে আসুন তাড়াতাড়ি।

—বলেন কি! এখনও কিন্তু দুদিন পার হয়নি।

—তাহলে বুঝে দেখুন, আমাদের কর্মতৎপরতা।

বাসব জোরে হেসে উঠল। তারপর বলল, এখুনি আসছি।

ধোপার নাম লোটান। কালো, বেঁটে, সিঁটকে চেহারা লোটানের। বারান্দার একধারে বসে ঠক ঠক করে কাঁপছিল সে।

তাকে বোঝান হয়েছে ভয়ের কিছু নেই, গোটা কয়েক প্রশ্ন করেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তবু লোটানের কাঁপুনি গেল না।

বাসব তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, রুমালে যে মার্কা আছে তা তোমারই?

—আজ্ঞে বাবু।

—তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে যাও তাহলেই হবে। যে বাবুর ওই রুমালখানা তাঁর নাম কি?

—নাম বলতে পারব না। বাবুর বাড়ি থেকে কাপড় নিয়ে আসি, ধুয়ে দিয়ে আসি আবার। নাম কি করে জানব বাবু?

—রুমালে একরকম গন্ধ আছে লোটান, তুমি শুঁকেছো?

ওই বাবুর সমস্ত রুমালেই ওই আতরের গন্ধ থাকে বাবু।

—নাম তো বলতে পারলে না, বাড়িটা দেখিয়ে দিতে পারবে নিশ্চয়ই?

—তা পারব বাবু।

—তাহলে তাই দেখিয়ে দেবে চল। মিঃ সামন্ত, লোটানকে সঙ্গে নিয়ে চললাম। কলকাতা ছাড়ার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব।

—বেশ তো।

বাসব লোটানকে সঙ্গে নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে পড়ল।

তারপর যখন নিজের হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরল বাসব, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সমস্ত কাজ শেষ করেই ফিরতে পেরেছে। ওর মুখে সাফল্যের হাসি। কিন্তু ওর আর বেশীক্ষণ কলকাতা থাকবার উপায় নেই। মাত্র দু ঘণ্টা পরে আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস ছাড়ছে শেয়ালদা থেকে। ওই ট্রেনটাই অ্যাভেল করবে বাসব।

ইন্সপেক্টর শুক্লা থানাতেই ছিলেন। বাসবকে দেখে সহর্ষে বললেন, কখন ফিরলেন কলকাতা থেকে।

—এই তো মিনিট কুড়ি হল। বেশ সন্তোষজনক কাজকর্মই কলকাতায় হয়েছে।

—তাই নাকি ?

বাসব বলল, শুধু তাই নয়। আজ সন্ধ্যাবেলাতেই এই হত্যা নাটকের উপর আমি যবনিকা ফেলতে পারব।

—বলেন কি ? আপনি জানতে পেরেছেন, কে খুনী ?

—পেরেছি মিঃ শুক্লা। সন্ধ্যার সময় সকলের সামনে তার নাম প্রকাশ করে দেব। আপনি নাগচৌধুরী হাউসের সকলকে ছটার পর ড্রইংরুমে উপস্থিত থাকতে বলবেন।

—বেশ।

সন্ধ্যা হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। তন্দ্রা রায়ের ঘরে সমবেত হয়েছে সকলে। তাঁর মনের অবস্থা বিবেচনা করে তাঁকে টানা-হেঁচড়া না করে ড্রইংরুমের পরিবর্তে তাঁর ঘরেই শেষ পর্যন্ত সকলকে আহ্বান করেছে বাসব।

ঘরে উপস্থিত রয়েছেন, রণদাকান্ত নাগচৌধুরী, সৈকত, তন্দ্রা রায়, সুচেতা, রত্নাদেবী, রজত ভৌমিক, অরবিন্দ দত্ত ও ডাঃ দিবাকর গুপ্ত। ইন্সপেক্টর শুক্লাও আছেন। কারুর মুখে কথা নেই। সকলের মুখে থমথমে ভাব।

বাসব বলল, আপনারা সকলেই উপস্থিত রয়েছেন। এবার আমি আপনাদের কাছে সেই রক্তাক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, প্রকৃত পক্ষে যা ঘটা উচিত ছিল না।

রণদাকান্ত বললেন, তুমি বুঝতে পেরেছো বাসব, কে হত্যাকারী ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। হত্যাকারীকে বোধহয় আমি বহু আগেই ধরতে পারতাম যদি প্রত্যেকে আমার কাছে সত্যি কথা বলতেন।

ডাঃ দিবাকর গুপ্ত বললেন, আপনি বলতে চান আমরা সকলে আপনার কাছে মিথ্যে স্টেটমেণ্ট দিয়েছি।

...নির্ভেজাল মিথ্যে কথা বলেছেন এ কথা বলছি না। তবে কিছু সত্যের অপলাপ যে করেছেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যেমন আপনার কথা ধরা যেতে পারে।

—আমার কথা।

চমকে উঠবেন না ডাঃ গুপ্ত। আমার কথা আগে শুনুন। আপনি নিজের টটমেণ্টে বলেছেন, হাল্কা লোহা জাতীয় জিনিস পড়ে যাবার শব্দ শুনে আপনি র থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পান রিভলবারের শব্দ।

—একজ্যাক্টলি।

—যদি তাই হবে, তবে এরকম একটা ঘটনার পর অন্য কিছু না করে গাড়ির ধ্যে ঝুঁকে পড়ে কি করছিলেন ?

—না, মানে···

আমি যদি বলি, আপনি মৃত মিঃ রায়ের পকেট থেকে সে সময় কিছু বার রে নেবার চেষ্টা করছিলেন।

ডাঃ গুপ্ত ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, আপনি বোধহয় আমাকে অনর্থক অপমানিত রতে পারেন না।

বাসব বলল, নিশ্চয়ই পারি না। প্রমাণ না পেয়ে কোন কথা বলছি না। ামি আরো প্রমাণ পেয়েছি আপনি একজন ল্যাভেণ্ডারের প্রথম শ্রেণীর ভক্ত। থচ সে কথাটাও আমার কাছে অস্বীকার করেছিলেন।

—কথাটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয় যা আপনাকে না বলায় খুব ক্ষতি হয়েছে।

—তাই যদি হবে তবে আপনি নিজের ল্যাভেণ্ডারের শিশি রজতবাবুর ঘরে রখে এসেছিলেন কেন ? এর নিশ্চয়ই কোন সঙ্গত কারণ আছে ডাঃ গুপ্ত।

দিবাকর গুপ্ত দমে গেলেন। ধরা গলায় বললেন, এতে প্রমাণ হচ্ছে কি ামি প্রশান্তকে খুন করেছি ?

বাসব সে কথায় কান না দিয়ে বলল, এই রুমালটা চিনতে পারেন ? ্যাভেণ্ডার মাখানো এই রুমাল আপনারই। প্রশান্ত রায় খুন হবার পর, এই মালখানাই আপনি মোটরের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে তাঁর পকেট থেকে তুলে নেবার ষ্টা করছিলেন এমন সময় আমি গিয়ে পড়ি।

—ও রুমালখানা আমার নয়।

—অস্বীকার করবার মিথ্যে চেষ্টা করছেন। রুমালে যে ধোপার মার্কা াছে, কলকাতায় সে সম্বন্ধে পুলিশের সাহায্যে খোঁজ নিয়েছিলাম। আপনার াটানের সন্ধান পাওয়া গেছে। সে আপনার বাড়ি আমাকে দেখিয়ে দেয় বং স্বীকার করে ল্যাভেণ্ডার দেওয়া রুমাল আপনি নিয়মিত ব্যবহার করে াকেন।

এবার দিবাকর গুপ্ত ভেঙ্গে পড়লেন, বিশ্বাস করুন বাসববাবু, আমি খুন সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

—আপনি অস্থির হবেন না ডাঃ গুপ্ত। আমাকে সকলের সঙ্গে কথা শে করে নিতে দিন।—বাসব রজত ভৌমিকের দিকে তাকিয়ে বলল, সেদিন আমা বলেছিলেন, খুন হওয়ার আগের মুহূর্ত অবধি আপনি নিজের ঘরে ছবি আঁকছিলেন—

—হ্যাঁ। ছবিটা আপনি দেখেছেন?

—দেখেছি বই কি। কিন্তু আপনি তো সে সময় বাড়ি ছিলেন না!

—ছিলাম না?

না। রত্নাদেবী আপনাকে ঘরে গিয়ে দেখতে পাননি। আপনি ওই সময় বাগানের মধ্যে গিয়ে কি করছিলেন?

রজত ভৌমিকের মুখে দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠল। তিনি গম্ভীর গলা বললেন, আমার বিরুদ্ধে এমন কোন প্রমাণ নেই যাতে আপনি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন। তাছাড়া ব্যক্তিগত আলোচনা আমি পছন্দ করি না।

—বিশেষ তা যখন প্রত্যাখ্যানের ইতিহাস।

—মিঃ ব্যানার্জী—

—রাগ করছেন? আমি সব জানি মশাই।

কি বলতে গিয়েও বললেন না ভৌমিক। তাঁর মুখে ভাবান্তর পরিলক্ষিত হল। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল কপালে।

অরবিন্দ দত্ত বলে উঠলেন, আমার এসব ভাল লাগছে না। আমি স্পষ্ট ভাবে জানতে চাই হত্যাকারী কে?

বাসব নির্লিপ্ত গলায় বলল, আপনিও হতে পারেন।

—আমি। আমার স্বার্থ?

—মিঃ রায়ের শ্বশুর আপনাদের রাইফেল ক্লাবের বড় ডোনার ছিলেন। বলতে গেলে তাঁর অর্থের আনুকূল্যেই আপনাদের ক্লাবের যা কিছু সমৃদ্ধি। মিঃ রায় শ্বশুরের এই বদান্যতা বন্ধ করে দেন। আপনি ওখানকার একজন কর্তাব্যক্তি। মিঃ রায়ের উপর আক্রোশ হওয়াটা আপনার অস্বাভাবিক নয়।

—চমৎকার! আপনার বাহাদুরী আছে বলতেই হবে।

বিদ্রূপ করে কোন বিষয়ে আমাকে টলিয়ে দেওয়া একটু কষ্টকর। শুনুন মিঃ দত্ত, সেদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বাগানে বেড়াতে যাওয়ার কৈফিয়ত

আমি বিশ্বাস করিনি, আপনি জানেন। এখন জেনে নিন, প্রকৃত কারণটাও আমার অজানা নেই। আপনি আড়ি পেতে দুজনার কথা শুনছিলেন।

—আড়ি পেতে! আমি?

—অবুঝ হওয়ার চেষ্টা করবেন না। আপনি সুচেতাদেবী আর…

বাসবের কথা শেষ হবার আগেই তীব্র গলায় সুচেতা বলল, আমি মোটেই সেদিন রাত্রে বাগানে যাইনি।

—এই কাপড়ের টুকরোটা চিনতে পারেন?

বাসব লাল রং-এর এক টুকরো কাপড় দেখিয়ে বলল, আপনারই শাড়ীর ছেঁড়া অংশ। আমি বাগানের তারের বেড়া থেকে খুলে এনেছি। না—না অস্বীকার করবেন না। শীতের ঐ অন্ধকার রাত্রে আপনি যার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন, তাঁকে আমি চিনি। আর আপনার দাদা সেই সময় আড়াল থেকে আপনাদের কথা শুনছিলেন।

—প্লিজ বাসববাবু, আর কিছু বলবেন না—সুচেতার গলা কাঁপছে।

—কিন্তু…ওকি রত্নাদেবী আপনি চলে যাচ্ছেন যে?

সকলে একসঙ্গে দৃষ্টি ফেরালেন দরজার দিকে। ত্রস্ত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়েছেন সুগায়িকা রত্নাদেবী।

—আপনি চলে যাচ্ছেন? আবার বলল বাসব।

—অসুস্থতা বোধ করছি, বসে থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর।

কিন্তু চলে যাওয়া যে আপনার এখন হবে না।

—কেন?

আপনার উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন। আপনি ঘটনাটাকে বেশী গোলমেলে করে তুলেছেন। সমস্ত কথা যদি পরিষ্কার ভাবে বলতেন, তাহলে গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরতাম না।

রত্নাদেবী কিছু বললেন না।

—আপনি আমায় বলেছিলেন দুর্ঘটনার সময় রজতবাবুর ঘরে ছিলেন। তা আপনি ছিলেন না। একবার ওই ঘরে ঢুঁ মেরেই বাড়ির পেছন দিকের বাগানে চলে গিয়েছিলেন।

বাসব সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, আপনারা শুনলে অবাক হবেন, প্রশান্ত রায় সেদিন পাটনা যাননি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ বটুক সোমের রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসেছিলেন তারপর গিয়েছিলেন বাড়ির পিছন দিকের বাগানে।

উদ্দেশ্য রত্নাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। ঘরের মধ্যে চাঞ্চল্যের ঢেউ উঠল। তন্দ্রা রায় বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। রত্নাদেবী দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন নত মুখে।

…আপনি ফটোগ্রাফের মধ্যেকার বাচ্চা ছেলেটির বিষয় অজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। আপনি তাকে নাকি চেনেন না। কিন্তু মা হয়ে নিজের ছেলের পরিচয় এইভাবে অস্বীকার করা কি আপনার উচিত হয়েছে।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

সৈকত প্রশ্ন করল, রত্নাদেবী বিবাহিতা?

বিবাহিতা তো বটেই। তাঁর স্বামীর নাম শুনলেও কম আশ্চর্য হবেন না আপনারা।

এবার ভেঙ্গে পড়লেন রত্নাদেবী।—না—না আমায় আর দগ্ধে মারবেন না মিঃ ব্যানার্জী। আমার অনুরোধ…

বাসব শান্ত গলায় বলল, আমি মর্মাহত রত্নাদেবী। এখন আর আমি চুপ করে থাকতে পারব না। আমাকে বলতেই হবে আপনি প্রশান্ত রায়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছিলেন।

ঘরের মধ্যে বোধহয় বাজ পড়ল। রত্নাদেবী নিজের হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কান্নার বেগ সামলাবার চেষ্টা করলেন। তন্দ্রা রায় উত্তেজিত গলায় বললেন, আপনি কি বলছেন বাসববাবু। উনি রত্নাদেবীকে বিয়ে করেছিলেন?

—ওদের দুজনের একটি ছেলেও আছে। তার ছবি আপনি দেখেছেন। আমি আপনার মানসিক অশান্তি ঘটানোর জন্য দুঃখ বোধ করছি। কিন্তু আমার উপর যে গুরু দায়িত্ব রয়েছে, তার দরুন সমস্ত সেন্টিমেন্টকে ঊর্দ্ধে রেখে আমাকে প্রকৃত তথ্য সকলের সামনে তুলে ধরতেই হবে।

বাসব মুখ ফিরিয়ে বলল, ওয়েল ইন্সপেক্টর, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন হত্যাকারী কে? ঘরের মধ্যে পরিপূর্ণ নীরবতা নেমে এল কিছুক্ষণের জন্যে। রণদাকান্ত শুধু উসখুস করছেন।

—হত্যাকারী যে যথেষ্ট চতুর তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রথমেই যে প্রশ্ন সকলের মনে জেগেছে—বাসব বলতে লাগল, তা হল প্রশান্ত রায় খুন হলেন কেন? তাঁর মৃত্যুতে কেউ লাভবান হয়নি। আমাকেও প্রথমে এই প্রশ্ন বিভ্রান্ত করেছিল। ক্রমে সমস্ত সরল হয়ে এল আমার কাছে। তাঁকে খুন করা হয়েছে হিংসার বশবর্তী হয়ে। দিনের পর দিন কারুর মনে হিংসার ইন্ধন

জুগিয়েছিলেন প্রশান্ত রায়, তাই এক বিশেষ মুহূর্তে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হতে হল। হত্যাকারী একজন প্রথম শ্রেণীর লক্ষ্যবিদ। রিভলবার চালনায় তার হাত খুবই পাকা। হয়তো কোন প্রতিষ্ঠানে সে এবিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিল।

করুণ কণ্ঠে অরবিন্দ দত্ত বললেন, আপনি কি আমায় মিন করছেন! বিলিভ মি···

—শান্ত হয়ে বসুন! আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।

রণদাকান্ত বললেন, আমি তো মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

তন্দ্রা রায় বললেন, আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, উনি আমার আগে আর কাউকে বিয়ে করেছিলেন ?

বাসব বলল, অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই। প্রমাণ এখানেই বর্তমান। তাছাড়া এসমস্ত আপনার অজানা ছিল না মিসেস রায়।

—আমার অজানা ছিল না।

—না। আপনি সমস্ত কিছু জানতেন।

আহত গলায় তন্দ্রা রায় বললেন, আপনি আমায় মিথ্যেবাদী বলতে চান ?

—অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে।

—আমি আর এক মুহূর্তে এখানে থাকতে চাই না। আজ উনি নেই, তাই আমায় এভাবে অপমানিত হতে হল।

দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

—দাঁড়ান। ঘর থেকে আপনার যাওয়া হবে না। আপনার মনের অবস্থা অনুমান করে নিতে কষ্ট হচ্ছে না। এ অভিনয় ছাড়া আর কোন পথ আপনার সামনে খোলা নেই। ইন্সপেক্টর, আপনি হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিন। শ্রীমতী তন্দ্রা রায় সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিকেই নিজের স্বামী প্রশান্ত রায়কে খুন করেছেন।

তীব্র গলায় প্রতিবাদ করে উঠলেন তন্দ্রা, আমি—আমি—আমার স্বামীকে খুন করেছি! কেন—কেন—

—আগেই বলেছি—প্রতিহিংসা। আপনি একদিন জানতে পারলেন আপনার স্বামী বহু পূর্বেই বিবাহিত, আপনাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্য হল আপনার বাবার বিপুল অর্থের প্রতি মিঃ রায়ের লোভ। মনের মধ্যে আগুন জ্বলতে লাগল আপনার। চরম হল যখন একই স্থানে আমন্ত্রিত হলেন তিনজন। স্বামীর হাবভাবে আপনি ক্রমেই উত্তেজিত হতে লাগলেন। এতদিন অবচেতন

মনে যে ইচ্ছা উঁকি-ঝুঁকি মারছিল, এখন বিশেষ আকারে তা শেকড় গেড়ে বসল। সেদিন প্রশান্তবাবুর পাটনা যাওয়ার নামে কোথায় যাচ্ছেন তা আপনার কাছে অজানা ছিল না। আপনি মনস্থির করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পোর্টিকোতে গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে—

তন্দ্রা রায়ের সুন্দর মুখের উপর ক্রমেই কুৎসিত ভাব ফুটে উঠছে। তিনি অকারণেই হাঁপাতে আরম্ভ করলেন। প্রায় চিৎকার করে বললেন, আমি আমার স্বামীকে খুন করেছি তা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না।

—সে জন্যে আমার কোন ব্যস্ততাও নেই, সে দায়িত্ব পুলিশের। তবে আপনার বিরুদ্ধে মোক্ষম একটা প্রমাণের সন্ধান বোধহয় আমি পুলিশকে দিতে পারব।

বাসব পকেট থেকে রিভলবার বার করে তুলে ধরল।—

এই সেই রিভলবার সেদিন যা গাড়ির তলায় পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই অস্ত্র আপনি ঘটনাস্থলে ফেলে এসেছিলেন। কাজে লাগিয়ে ছিলেন অন্য একটা রিভলবার। আপনার আগে বোঝা উচিত ছিল এই কারচুপি আমরা সহজেই ধরে ফেলব। অগত্যা অন্য রিভলবারটার সন্ধান আমায় করতে হয়েছে। আপনার অলক্ষ্যে এঘরে আজ আমি এসেছিলাম। ফ্লাওয়ার ভাসটার মধ্যে অভীষ্ট বস্তুর সন্ধান পেয়েছি।

বাসব কোণের টেবিলের উপর রাখা ফ্লাওয়ার ভাসের দিকে এগিয়ে গেল। তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলবার বার করে আনল। বলল, এই সেই রিভলবার যা দিয়ে খুন করা হয়েছে। প্রশান্তবাবুর শরীরে যে গুলি পাওয়া গেছে এরসঙ্গে হুবহু মিলে যাবে। রিভলবারের উপর আপনার হাতের ছাপ আছে এবং আমার ধারণা এর লাইসেন্স বোধহয় আপনারই নামে।

তন্দ্রা রায় আর কিছু বললেন না। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন। তারপর হেসে উঠলেন। তীক্ষ্ণ, উচ্চ-গ্রামে হেসে চললেন অবিরত।

বৃষ্টি হচ্ছে। শীতের বেগ যেন আরো বেড়ে গেছে। ড্রইংরুমে সকলে একত্রিত হয়েছেন। মিসেস রায় আর ইন্সপেক্টর ছাড়া আর সকলেই আছেন। তখন সন্ধ্যা। রণদাকান্ত বললেন, শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল মেয়েটা!

ডাঃ গুপ্ত বললেন, খুন করার পর শোচনীয় মনের অবস্থা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন মিসেস রায়, ধরা পড়ে যাবার পর আর মেণ্টাল ব্যালেন্স রাখতে পারেননি, এসব ক্ষেত্রে এই রকমই হয়।

সৈকত বলল, ভাবতেও পারা যায় না। আচ্ছা, বাসব, তুমি কি ভাবে বুঝতে পারলে মিসেস রায়ই হত্যাকারী?

—কিছু অনুমান আর কিছু প্রমাণের উপর নির্ভর করে।

রণদাকান্ত বললেন, ওভাবে নয়। তুমি সমস্ত আমাদের খুলে বল।

বাসব মৃদু হেসে আরম্ভ করল, সকলের স্টেটমেণ্ট নেবার পর আমার মনে হল, অনেকেই আমার কাছে অনেক কথা চেপে গেছেন। ডাঃ গুপ্ত বলছিলেন, তিনি করিডরের কাছে হাল্কা লোহার কোন জিনিস পড়ার শব্দ পেয়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেওয়া যায়, হত্যাকারী যখন মিঃ রায়ের জন্যে করিডরে অপেক্ষা করছিল, সেই সময় তার হাত থেকে রিভলবার মাটিতে পড়ে যায়। শব্দ তারই। কিন্তু ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা রিভলবারের কোথাও চটা ওঠার দাগ দেখতে পেলাম না। আরো কয়েকটা জিনিস আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। যেমন একটা বাচ্চার ফটোগ্রাফ আর ল্যাভেণ্ডার মাখানো রুমাল। ও রুমালখানা মিঃ রায়ের ছিল না। এদিকে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে তারের বেড়ায় লাল শাড়ীর ছেঁড়া টুকরো আটকে থাকতে দেখলাম। আমার মনে পড়ল এই ধরনের শাড়ী আমি সুচেতাদেবীকে দুর্ঘটনার দিন পরতে দেখেছি। তিনি ঐ রাত্রে বাগানে কি করছিলেন? তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, মিঃ রায় পাটনা যাননি। বাড়ির পিছন দিকের বাগানের ওপাশের পোড়ো জমিতে টায়ারের দাগ দেখতে পেলাম। ওধারে নাকি কখনই মোটর যায় না। তাছাড়া বটুক চন্দ বললেন, প্রশান্তবাবু তাঁর হোটেলে গিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। সহজেই বুঝতে পারা যায় হোটেল থেকে বেরিয়ে তিনি মোটর নিয়ে ঐ পোড়ো জমিতে গিয়েছিলেন।

আমি তিনজনকে বিশেষ ভাবে সন্দেহ করলাম। এক, ডাঃ গুপ্ত। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে কি করছিলেন? দুই, অরবিন্দ দত্ত। দুর্ঘটনার পর তাঁকে বাগানের দিক থেকে কেন আসতে দেখা গিয়েছিল। তিন, রত্নাদেবী। তাঁর কথাবার্তা এত অসংলগ্ন কেন? মিসেস রায়ের উপর সন্দেহের কোন প্রশ্নই উঠে না। তবে তাঁর একটা কথা আমার মনে খটকা লাগাল। আমার প্রশ্নের উত্তরে এক জায়গায় তিনি বললেন, তিনি নাকি সাড়ে নটার সময় বাথরুম থেকে ফেরার পথে ডাঃ গুপ্তকে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেদিন পৌনে দশটা অবধি আমরা ডাইনিং হলে ছিলাম। খেতে গিয়েছিলাম নটার সময়। কাজেই মিসেস রায়

তাঁর ঘর থেকে ওই সময় ডাঃ গুপ্তকে বেরিয়ে যেতে দেখতে পারেন না। যে ক্ষেত্রে দুজনেই তখন ডাইনিং হলে।

কলকাতায় গিয়ে অনেক বিষয় আমাকে খোঁজ খবর নিতে হল। ধোপার মারফত জানতে পারলাম রুমালটা ডাঃ গুপ্তর। রত্নাদেবীর পরিচিতা কনক সেন জানালেন, রত্নাদেবী প্রশান্ত রায়ের স্ত্রী। ছেলেও আছে। ছেলেটি কার্শিয়াংএ পড়াশুনা করে। এদিকে জানা গেল মিসেস রায় একজন ভাল সুটার এবং লাইসেন্স যুক্ত রিভলবার আছে। সন্দেহ এবার আমার মনে দানা বাঁধল। নিদারুণ হিংসাতেই তিনি যে একাজ করেছেন সহজেই বুঝতে পারলাম। তখন বাকী রইল শুধু প্রমাণ। প্রমাণও পাওয়া গেল। মিসেস রায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর ঘর সার্চ করলাম। আমি জানতাম নিজের রিভলবার তিনি বাক্সর মধ্যে রাখবেন না। কারণ সার্চ হলে যাতে পাওয়া না যায়। তাই কমন প্লেসেই তিনি অস্ত্রটা রেখেছিলেন। অতি সহজেই ফ্লাওয়ার ভাসের মধ্যে আমি তাকে আবিষ্কার করলাম। তাতে টোল খাওয়া এবং চটা ওঠার দাগ ছিল।

বাসব একটু দম নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল, এবার শুনুন ঘটনাটা কি ভাবে ঘটেছিল। অবশ্য এর মধ্যে অনেকখানিই আমার অনুমান। প্রশান্ত রায় যখন রত্নাদেবীকে বিয়ে করেন তখন তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না। ছেলে হওয়ার পর তাঁর আর্থিক অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠল। স্বামী স্ত্রীতে মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন ছেলেকে মানুষ করবার জন্যে। কিন্তু অভাবের জন্যে পদে পদে বাধা পড়তে লাগল। এই সময় কোন সূত্রে তন্দ্রাদেবীর সঙ্গে প্রশান্তবাবুর আলাপ হয়। তিনি রত্নাদেবীর সঙ্গে পরামর্শ করে আলাপের সূত্রটা গাঢ় করে ফেলেন এবং দুজনের বিয়েও হয়ে যায় শেষে। এইভাবে বিরাট অভাবের হাত থেকে তাঁরা পরিত্রাণ পান। কিন্তু খুব বেশীদিন ব্যাপারটা চাপা রইল না মিসেস রায়ের কাছে। মনের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল তাঁর এবং—। যাই হোক দুর্ঘটনার রাত্রে তন্দ্রা রায় নিজের পরিকল্পনা মত করিডরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মোটর পোর্টিকোতে আসার আগেই তিনি সেখানে গিয়ে দাঁড়ান। এত রাত্রে ওখানে স্ত্রীকে দেখে প্রশান্তবাবু নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিলেন—এই বিস্ময়ের মধ্যেই মিসেস রায় গুলি চালান। এবং পায়ের শব্দ পেয়ে অর্থাৎ ডাঃ গুপ্ত ঘটনাস্থলে পৌছবার আগেই থামের আড়ালে চলে যান। বাসব নিজের বক্তব্য শেষ করল। সকলে প্রশংসার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন।

সৈকত বলল, তুটো প্রশ্ন কিন্তু ভাই এখনও আমার মনকে নাড়া দিচ্ছে।

—কোন তুটো প্রশ্ন ?

—অরবিন্দবাবু সেই রাত্রে বাগানে কি করছিলেন এবং কেন, আর ডাঃ গুপ্তর রুমাল প্রশান্ত রায়ের পকেটে গেল কি ভাবে ?

—অরবিন্দবাবু বাগানে গিয়েছিলেন নিজের বোনের উপর নজর রাখতে। তিনি জানতে পেরেছিলেন ও সময় বাগানে সুচেতাদেবীর সঙ্গে রজতবাবুর কথা হবে। রজতবাবু সুচেতাদেবীর সম্পর্কে একটু ইণ্টারেস্টেড। তিনি ভেবেছিলেন অরবিন্দবাবুই বোনের বিয়ে এখানে দিতে চান, তিনি জানতেন না সুচেতাদেবী সৈকতের বিশেষ পরিচিতা। অগত্যা রজতবাবুকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলতে হয় সুচেতাদেবীকে।

রজত ভৌমিক মাথা নত করলেন।

—ডাঃ গুপ্তর রুমাল কিভাবে প্রশান্ত রায়ের পকেটে গিয়েছিল বলতে পারব না। উনি নিজেই আমাদের বলতে পারেন।

ডাঃ গুপ্ত বললেন, সন্ধ্যাবেলায় প্রশান্ত আমার কাছ থেকে রুমালটা নেয় চশমার লেন্স পরিষ্কার করবার জন্যে। তারপর ভুল ক্রমে আর ফিরিয়ে দেয় না। তুর্ঘটনার পর আমিই প্রথমে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হই। আমার কেমন ভয় হয়। প্রশান্তর পকেটে আমার রুমাল দেখে পুলিশ যদি আমাকে সন্দেহ করে ? আমি তাড়াতাড়ি রুমালটা ওর পকেট থেকে বার করে নিতে যাই, এমন সময় বাসববাবু সেখানে গিয়ে পড়েন।

এই সময় ঢং ঢং করে নটা বাজল দেওয়াল ঘড়িতে। রণদাকান্ত নাগচৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন। ডিনারের সময় হয়েছে। একে একে সকলেই উঠে পড়লেন।

কিন্তু···

ঘর থেকে কেউই বেরিয়ে যেতে পারলেন না। একটা ব্যথাতুর দৃশ্য সকলকে অনড় করে দিল।

ফুলে ফুলে কাঁদছেন রত্নাদেবী।

ছিন্নমূল লতার মত তাঁর দেহ কোচের উপর পড়ে রয়েছে। তিনি কাঁদছেন, ফুলে ফুলে কেঁদে চলেছেন। তাঁকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা কারুর নেই। সকলে মমতাময় দৃষ্টি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন শুধু।

॥ দুই ॥

সুবীর সামন্ত।

কাঠের রেলিংয়ের ওপর কোন রকমে ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঠগড়ার মধ্যে।

লোকে লোকারণ্য আদালত গৃহে অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছে। একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে সকলেই উৎসুক।

ম্রিয়মান সুবীর ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে।

পাব্লিক প্রসিকিউটার রণদাকান্ত চৌধুরী তখন নাটকীয় ভাবে বলে চলেছেন। সকলের দৃষ্টি তাঁরই ওপর নিবদ্ধ। নিশ্চুপ আদালত গৃহে তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে। তিনি বলছেন—ইওর অনার, এ বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই যে, আসামী সুবীর সামন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে ও পূর্বপরিকল্পিত ভাবে নিজের স্ত্রী অপর্ণা সামন্তকে হত্যা করেছেন। সুতরাং ভারতীয় দণ্ডবিধি ১২০ বি ও ৩০২ ধারা অনুসারে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে। এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—

কিন্তু কথা তাঁর শেষ হল না। আসামী পক্ষের ব্যবহারজীবি নির্মল পালিত তীব্র স্বরে প্রতিবাদ করে উঠলেন, আই অবজেক্ট ইওর অনার। কোন রকম সাক্ষ্য প্রমাণ না পেয়েই মিস্টার চৌধুরী আমার মক্কেলের সম্বন্ধে এই ধরনের উক্তি করে মোটেই সুবিবেচনার পরিচয় দিচ্ছেন না।

প্রবীণ বিচারপতি হাতের ইসারায় নির্মল পালিতকে বসতে ইঙ্গিত করে রণদাকান্ত চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, প্রসিড—

হাসিতে সম্পূর্ণ মুখখানা ভাসিয়ে মিঃ চৌধুরী আবার আরম্ভ করলেন, পুলিশের রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায় যে প্রায় রাত বারটার সময় অসুস্থা অপর্ণা সামন্তকে তেতলার ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়। সে সময় ওই ঘরে একমাত্র আসামী মিস্টার সামন্তরই উপস্থিত থাকা সম্ভব। অবশ্য পুলিশ এসে দেখতে পায় আসামী মিস্টার সামন্ত নিচে মৃতদেহের পাশে মুহ্যমানের মত বসে রয়েছেন। আমার মাননীয় বন্ধু মিস্টার পালিত সাক্ষ্য প্রমাণের কথা বলছিলেন এবং তিনি আসামীকে ইতিপূর্বে নিরপরাধ হিসেবে

উল্লেখ করেছেন। ইওর অনার এই সূত্রে আমি নিজের সাক্ষীদের তলব করবার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

মাননীয় বিচারপতি ঘাড় নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন।

—আমার প্রথম সাক্ষী হলেন মৃতা মিসেস সামন্তের ভ্রাতা মিস্টার অশোক রক্ষিত।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই অশোক রক্ষিত সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন।

বয়স ৩৪।৩৫-এর মধ্যেই। বেশ উঁচু এবং চওড়া চেহারা। গায়ের রঙ বেশ কালো। মাথার চুল কিছুটা পাতলা হয়ে এসেছে।

অশোক রক্ষিত গীতা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবার পরই রণদাকান্ত চৌধুরী তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন।

—ওয়েল মিস্টার রক্ষিত; মৃতা মিসেস সামন্ত আপনার বোন ছিলেন?

—হ্যাঁ। সহোদর বোন—

—হত্যার দিন রাত্রে আপনি ওই বাড়িতেই ছিলেন কি?

—ওটা আমাদের নিজস্ব বাড়ি। দিন কুড়িক আগে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমরা অপর্ণাকে এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম।

—আপনার বোন যেদিন হত হন, সেদিনের সমস্ত কথা আপনার অবশ্যই মনে আছে?

—সে দৃশ্য ভোলা যায় না।

—ঘটনাটা আমাদের একবার বলবেন কি?

এক মুহূর্ত নীরব রইলেন অশোক রক্ষিত। সমস্ত ঘটনাটা যেন মনের মধ্যে গুছিয়ে নিলেন।

তারপর বললেন, সেদিন অপর্ণার শরীর অন্যান্য দিনের চেয়ে ভালই ছিল। ওর ঘর থেকে প্রায় সাড়ে আটটার সময় আমি নিজের ঘরে চলে আসি। প্রচণ্ড গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল মাঝরাত্রে, তাড়াতাড়ি নিচে এসে দেখি অপর্ণা রক্তাক্ত শরীরে উঠোনে পড়ে রয়েছে। তার দেহে তখন প্রাণ নেই। বাড়ির অন্যান্য সকলে তখন সেখানে উপস্থিত।

—হুঁ। আপনি রাত্রে যখন অপর্ণাদেবীর ঘর থেকে চলে আসেন, তখন সুবীরবাবু সেখানে ছিলেন কি?

—না। তবে প্রত্যহ রাত্রে ওই ঘরেই থাকতো। তাই অপর্ণাকে জানালা দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে তার কোন অসুবিধা হয়নি।

রণদাকান্ত চৌধুরী রুমাল দিয়ে নিজের মুখটা ভাল করে মুছে নিয়ে বললেন, সুবীরবাবু নিজের স্ত্রীকে হত্যা করলেন কেন ? এ সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?

একটু ইতস্ততঃ করলেন অশোক রক্ষিত। তারপর বললেন, আমাদের এই পারিবারিক কেচ্ছা খবরের কাগজের দৌলতে আজ অবশ্য কারুরই অজানা নয়। আপনিও জানেন প্রকৃত কারণটা কি। আমি ও বিষয়ে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি।

—আপনি মিথ্যে সঙ্কোচ বোধ করছেন মিস্টার রক্ষিত। প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটন করার মধ্যে কুণ্ঠার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আপনি বলুন ?

একটু থেমে অশোক রক্ষিত বললেন, আমার পিসতুতো বোন সুপর্ণার সঙ্গে সুবীরের ঘনিষ্ঠতা ছিল দীর্ঘ দিন ধরে। অপর্ণার সঙ্গে তার বিয়ের পরও ওদের অন্তরঙ্গতা অব্যাহত ছিল। অপর্ণা এ ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেনি। ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই থাকত এবং—

—হিয়ার ইজ দি পয়েন্ট ইওর অনার নিজের পথ সম্পূর্ণ পরিষ্কার করবার জন্যে অর্থাৎ সুপর্ণাদেবীকে অন্তরঙ্গ ভাবে পাবার জন্যে আসামী সুবীর সামন্ত নিজের গুরুতর মানসিক রোগাক্রান্ত স্ত্রীকে উপর থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে এইটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে অপর্ণাদেবী নিজেই উপর থেকে পড়ে গেছেন। কিন্তু বাড়ির লোকদের সতর্কতার জন্যে আসামীর সে পরিকল্পনা সার্থক হয়নি। ধন্যবাদ অশোকবাবু, আপনাকে আর আমার জিজ্ঞাস্য নেই।

অশোক রক্ষিত কাঠগড়া থেকে নেমে যাওয়ার পরই রণদাকান্ত চৌধুরী আবার বললেন, এবার আমার দ্বিতীয় সাক্ষী গৌর বসাককে আহ্বান করছি।

মুহূর্ত পরেই সাক্ষী-মঞ্চে গৌর বসাক এসে দাঁড়ালেন। আদালতের আনুষ্ঠানিক কাজগুলো হবার পর মিঃ চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, গৌরবাবু, আপনি তো রক্ষিতদের পরিবারিক বন্ধু, তাই না ?

—হ্যাঁ। দীর্ঘদিন ধরে এই পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা।

—আসামীকে নিশ্চয়ই চিনতেন ?

—বিলক্ষণ। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ হৃদ্যতাই আছে।

—সুবীরবাবুর মত ভদ্র যুবক এরকম কাজ করতে পারে আপনি কোনদিন ভেবেছিলেন ?

—না। তাঁকে শান্ত, সংযত ও রুচিবান বলেই জানতাম।

—ওয়েল মিস্টার বসাক, আপনি একথাও নিশ্চয়ই জানতেন বিবাহিত হয়েও সুবীরবাবু অসঙ্গতভাবে সুপর্ণাদেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন ?

গৌর বসাক উত্তর দেবার আগেই নির্মল পালিত উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র কণ্ঠে বললেন, আই অবজেক্ট মি লর্ড। অসঙ্গত কথাটা এখানে ব্যবহার করা মোটেই সঙ্গত হচ্ছে না।

প্রবীন বিচারপতি সংযত ভাষায় প্রশ্ন করতে অনুরোধ করার পর আবার প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হল।

—আপনি জানতেন সুবীরবাবু সুপর্ণাদেবীকে ভালবাসেন ?

—একথা কে না জানে, আমিও জানতাম।

সুপর্ণাদেবীর সঙ্গে ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও মিস্টার সামন্ত অপর্ণাদেবীকে বিবাহ করেছিলেন কেন, বলতে পারেন ?

সুবীর সামন্তের দিকে বারেক তাকিয়ে নিয়ে গৌর বসাক সসঙ্কোচে বললেন, মানে···এবিষয়ে আমার কিছু বলাটা···

—কিছু মাত্র অন্যায় হবে না মিস্টার বসাক। আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন।

—সুবীরবাবু অপর্ণাকে বিয়ে করেছিলেন তার বাপের টাকা দেখে। আন্তরিকতার কোন প্রশ্নই এখানে ওঠেনি।

—আপনি কি কোনদিন সুবীরবাবুর কোন সন্দেহজনক কথাবার্তা বা ব্যবহার লক্ষ্য করেছেন ?

—এদান্তে অবশ্য খুবই তিরিক্ষি হয়ে উঠেছিলেন। প্রায়ই স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হত। একদিন···

—একদিন কি, বলুন ?

—একদিন আমায় বলছিলেন, আর পারা যায় না। এর একটা হেস্ত-নেস্ত করতেই হবে। এর দুদিন পরেই অপর্ণা হত হল।

—থ্যাঙ্কস মিস্টার বসাক। এবার আপনি যেতে পারেন।

এরপরে সুবীর সামন্তের শ্বশুর বিনয় রক্ষিত আর তাঁদের ম্যানেজার হরিশঙ্কর সেনকে পর পর ডাকা হল।

জেরার মুখে তাঁরা যা বললেন তার সারমর্ম হল, জামাইয়ের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। প্রায়ই খিটিমিটি লেগে থাকত। এদান্তে অপর্ণা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ার পর ওদের দুজনের সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে পড়েছিল।

এবিষয়ে তাঁদের কোনই সন্দেহ নেই যে সুবীরই নিজের পথ পরিষ্কার করার জন্যে অপর্ণাকে উপর থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করেছে।

তাঁদের সাক্ষ্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আদালতেরও সময় শেষ হয়ে এসেছিল। কাজেই পরের দিনের জন্যে কেসটি মুলতুবি রেখে মাননীয় বিচারপতি উঠে দাঁড়ালেন।

সন্ধ্যা তখন সাতটা।

নির্মল পালিত নিজের চেম্বারে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন। ঘরে আর কেউ নেই, একলাই তিনি চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন। মিনিটের পর মিনিট কেটে চলেছে।

এক সময়ে চেয়ার থেকে উঠে ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি পায়চারি করতে লাগলেন নির্মল পালিত। ওই সঙ্গে আজকে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্যগুলো সরীসৃপের মত মাথার মধ্যে পাক খেয়ে যেতে লাগল।

সাক্ষ্য প্রমাণ সমস্তই সুবীরের বিপক্ষে গেছে। অথচ ব্যক্তিগতভাবে নির্মল পালিত তাঁর বাল্যবন্ধু সুবীরকে ভালভাবেই জানেন—সে আর যাই করুক অন্ততঃ মানুষ খুন করতে পারে না। সুপর্ণাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসলেও অবস্থা বিপাকে অপর্ণার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, মনে মনে সে এ বিয়েকে মেনে নেয় নি। ঘোর অশান্তিময় ছিল তার দাম্পত্য জীবন—তবু এই রকম একটা নির্মম হত্যা তার পক্ষে সম্ভব নয় কোন মতেই।

নির্মল পালিত থমকে দাঁড়ান দক্ষিণ দিকের জানালাটার সামনে এসে। তাঁর মনে পড়ে যায়—দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়েই যেন তিনি পরিষ্কার দেখতে পান অতীতের সমস্ত কিছু ছায়াছবির মতই—

ইডেন গার্ডেনের ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের কাছে একটা বেঞ্চের ওপর অস্থির চিত্তে বসে রয়েছে সুবীর। মাঝে মাঝে রিস্টওয়াচের দিকে তাকাচ্ছে, আর দৃষ্টি প্রসারিত করছে এসপ্লানেডের দিকে চলে যাওয়া কালো পিচের রাস্তাটার ওপর। প্রায় ছটা বাজে, এখনও সুপর্ণার দেখা নেই। এরকম দেরি তো বড় একটা তার হয় না।

ঘড়ির কাঁটা ক্রমেই এগিয়ে চলেছে। আর মিনিট পাঁচেক দেখেই উঠে পড়বে সুবীর। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরে আর ওঠা হল না, কারণ এই সময়ই সুপর্ণাকে দ্রুতপদে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

—তোমার আসবার কথা ছিল পাঁচটার সময়, এখন ঘড়িতে কটা বেজেছে চেয়ে দেখ—।

—লক্ষীটি রাগ করো না। আমি ইচ্ছে করে দেরি করিনি। অনেক দিন রে আজ হঠাৎ অপর্ণা এসে উপস্থিত, কথায় কথায় একটু দেরি হয়ে গেল তাই।

সুবীর সুপর্ণার কাছে একটু ঘন হয়ে এল।

—কে অপর্ণা—?

—আমার মামাতো বোন। বিখ্যাত ধনী বিনয় রক্ষিতের মেয়ে।

ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ—শুনেছিলাম বটে, আয়রন কিং বিনয় রক্ষিত তোমার মামা। াক, ও কথা। আজ আমি তোমায় এখানে কেন ডেকেছি বল তো?

মৃদু হেসে সুপর্ণা উত্তর দিল, কিছু কিছু আন্দাজ করছি। তবে কথাটা তুমি জে মুখে বললেই ভাল হয় না কি?

—হ্যাঁ পর্ণা, তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ। এবার আমাদের বিয়েটা হয়ে ওয়া উচিত।

সুপর্ণা ধীরে ধীরে মুখ নিচু করল। সুবীরের দুটো হাত নিজের হাতের মধ্যে য়ে নিম্ন কণ্ঠে বলল তুমি তো জান, মা এ-ব্যাপারে আপত্তি তুলবেন না। খন···

—আর তুমি?

—আমি! আমার মনের কথাটা কি এতদিনেও তুমি বুঝে উঠতে পারো নি!

সুবীর হেসে বলল, মেয়েদের মনের কথা শুনেছি স্বয়ং দেবতারাও সময় সময় ঝে উঠতে পারেন না, আর আমি তো তুচ্ছ মানব।

সুপর্ণাও হাসিতে যোগ দিল সুবীরের সঙ্গে।

এরপর ওরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া শেষ করে যখন উঠল, ন'টা তখন প্রায় জে গেছে। ঠিক হল আজই রাত্রে সুবীর বাড়িতে এ-বিষয়ে কথা পাড়বে। ব আপত্তি যে হবে না তা সে জানে।

সুপর্ণাকে এলগিন রোডের মোড়ে নামিয়ে দিয়ে সুবীর ট্যাক্সিতেই সোজা ড়ি ফিরে এল। রাত খুব বেশী হয়নি, পৌনে দশটা হয়তো, কিন্তু এরই মধ্যে রিধারে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

পিতা পুত্রের ছোট্ট সংসার। মা অনেক দিনই গত হয়েছেন। ভাল করে কে মনেও পড়ে না সুবীরের। স্ত্রী গত হবার পর সুকান্তবাবু অবশ্য আর বিয়ে রেন নি। অসীম স্নেহের পুত্র সুবীরকে মানুষ করার ব্রতে ব্রতী থেকেছেন।

সুবীর মন্থর পদে নিজের ঘরে এসে ঢুকলো। ট্রাউজার আর সার্টটা বদলে পাজামা আর গেঞ্জি গায়ে এলিয়ে পড়ল একটা হ্যারিংটন চেয়ারে। আজ আর বাবাকে কিছু বলা যায় না। তিনি অনেকক্ষণ আগেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাল সকালে সমস্ত কিছু বললেই হবে।

মিনিট কয়েক চোখ বন্ধ করে ক্লান্তি দূর করবার পর সুবীর উঠে পড়ল। এবার খেয়ে শুয়ে পড়লেই হয়।

সে প্রায়ই দেরি করে ফেরে বলে তার খাবার, খাবার-ঘরের টেবিলের উপর ঢাকা থাকে। পুরাতন ভৃত্য রামচরণের এর জন্যে অনুযোগের সীমা নেই, কি সুবীর তার কথায় কান দেয় না।

বারান্দায় এসে খাবার ঘরে যেতে যেতে ওর নজরে পড়ল বাবার ঘরের পর্দা ফাঁক দিয়ে একটা ফিকে আলোর রেশ এধারের দেওয়ালে ম্লান ভাবে পড়েছে তবে কি বাবা এখনও ঘুমোয় নি! পায়ে-পায়ে সুবীর সুশান্তবাবুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একটা চেয়ারের উপর মুহ্যমানের মত ব রয়েছেন সুশান্তবাবু। তাঁর দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ। সুবীরের বুঝতে দে হল না, একটা অঘটন কিছু ঘটেছে। ও পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে এল।

—বাবা—

—কে⋯সুবি⋯এদিকে আয় বাবা—।

—কি হয়েছে বাবা? তুমি এভাবে বসে রয়েছ যে?

—সর্বনাশ হয়ে গেছে সুবি। আজ অফিসের কুড়ি হাজার টাকা আমা কাছ থেকে খোয়া গেছে।

—খোয়া গেছে!!

—হ্যাঁ আমি ওরিয়েন্ট স্পিনিং মিল থেকে কুড়ি হাজার টাকা কালেকশা নিয়ে অফিসে ফিরছিলাম, পথেই—

—তুমি পুলিশকে ইনফর্ম করেছ নিশ্চয়ই?

—পুলিশ! তুই কি বলছিস সুবি। এতদিনের মান-সম্মান সমস্ত জলাঞ্জ দিয়ে আমি পুলিশের কাছে যাব?

—তার মানে তুমি অফিসেও এখনো জানাও নি একথা?

—না, এখনো জানাতে পারি নি একথা। একটা অদ্ভুত সঙ্কোচ আমা মূক করে দিয়েছে। বিশ বছরের সততায় আমি লোকের মনে সম্মা

আসন পেতে বসেছি, তাকে আজ ভূলুণ্ঠিত করতে মন কিছুতেই সায় দিল না—।

—কিন্তু ক'দিন তুমি ব্যাপারটাকে চেপে রাখতে পারবে? মাসের শেষে ক্যাশ ক্লিয়ারেন্সের সময় কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়বেই।

—আমার নিজের যখন এ টাকাটা পূরণ করবার ক্ষমতা নেই, তখন সুইসাইড করা ছাড়া আর কোন ওয়ে দেখতে পাচ্ছি না।

সুবীর আর্তকণ্ঠে বলল, বাবা—

—ইয়েস মাই বয়, দিস ইজ দি ওন্‌লি ওয়ে। আমি তোকে আপ্রাণ চেষ্টায় মানুষ করেছি, জীবনে ভাল একটা পথ বেছে নেবার অবকাশ তোর হয়েছে—।

সুবীর সুশান্তবাবুর ব্যথাটা মর্মে মর্মে অনুভব করে। সারা জীবন তিনি দায়িত্বশীল পদে সততার সঙ্গে কাজ করে এসেছেন। এই উদারচেতা আর জেদি মানুষটি জীবনে কোন দিন একটি পয়সার এধার ওধার করেন নি। তাই আজ এতগুলো টাকা খোয়া যাওয়ার পর সর্বাগ্রে তাঁর সম্মান বাঁচানোর কথা মনে জেগেছে। তিনি যে টাকাটা আত্মসাৎ করেন নি, এ সকলেই বিশ্বাস করবে। তবে পুলিশের জেরা, হয়তো শেষ পর্যন্ত কোর্ট-কাছারী…বা, না, সেকথা ভাবতেও সারা শরীর হিম হয়ে আসে আত্মসচেতন সুশান্তবাবুর।

—বাবা, এ থেকে বাঁচবার কি কোন উপায় নেই?

—আছে। একটা উপায় আছে। তবে—

—কি উপায়। বল—বল তুমি?

কোম্পানীর ডিরেক্টাররা যদি আমাকে একটা সুযোগ দেন, মাসে মাসে টাকাটা শোধ করবার একটা সুযোগ। তবে সে সুযোগ তাঁরা আমায় দেবেন না, কথাটা শোনার পরই পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করে দেবেন আমায়।

দ্রুত কণ্ঠে সুবীর বলল, কে কে আছেন ডিরেক্টার বোর্ডে? দেখি আমি যদি কিছু করে উঠতে পারি।

—তুই! বিস্ময়ে ভেঙে পড়েন সুশান্তবাবু।

হ্যাঁ বাবা। এতে আমারও কিছু করণীয় রয়েছে। যতদূর মনে পড়ছে, তুমি একবার আমায় বলেছিলে তোমাদের ডিরেক্টার বোর্ডে বিনয় রক্ষিতও রয়েছেন?

—তিনিই ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান। কিন্তু—

এরপর সুবীর সুশান্তবাবুর কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে টাকা খোয়া যাওয়া

সংক্রান্ত সমস্ত কিছু জেনে নিল এবং তাঁকে বিশ্রাম করতে অনুরোধ জানিয়ে যখন ও ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তখন রাত প্রায় দুটো।

ভোর হওয়ার পর প্রথম কাজ হল তার সুপর্ণার সঙ্গে দেখা করা। প্রথম দর্শনেই সুবীরের চেহারার পরিবর্তন সুপর্ণার চোখে পড়ল।

—একি, তোমাকে এরকম ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন? রাত্রে কি ঘুম হয়নি?

—না। ঘুমোবার অবকাশ আর পেলাম কই পর্ণা। তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পরই বাড়িতে এক বিরাট বিপর্যয় অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে।

বিপর্যয়! আমি তো—কি হয়েছে আমায় বল?

সুবীর সুপর্ণাকে সমস্ত খুলে বলার পর বলল, তোমার মামার কাছে যাওয়া ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই।

একটু চিন্তা করে সুপর্ণা উত্তর দিল, আমার মনে হয় মামাবাবু তোমার কথা রাখবেন। মানুষ হিসেবে তিনি খুব খাঁটি।

—আমার তাহলে তাঁর কাছে একবার অবশ্যই দেখা করতে যাওয়া উচিত কি বল?

—আমারও তাই মনে হয়। তুমি এখনই বরং তাঁর কাছে চলে যাও এ সময়ে বাড়িতেই পাবে তাঁকে।

সুবীর আর অপেক্ষা করল না। সুপর্ণার কাছ থেকে মিঃ রক্ষিতের ঠিকানাটা নিয়েই রওনা হল।

পার্লারে বসে মিঃ রক্ষিত তখন কন্যা অপর্ণার সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত ছিলেন। গতকাল কলেজের ফাংশনে এক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তাঁদের আলোচনা ঘুরপাক খাচ্ছিল। এই সময়ে বয় এসে জানাল, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

—ভদ্রলোকের নাম জিগ্যেস করেছিলে?

—আজ্ঞে। সুবীর সামন্ত—

—সুবীর সামন্ত! যাও, ডেকে নিয়ে এস।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুবীর পার্লারে এসে দাঁড়াল।

বিনয়বাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। এই দীর্ঘকায় সুরূপ যুবকটিকে ইতিপূর্বে কোথাও দেখেছেন বলে তাঁর মনে পড়ল না।

অপর্ণারও দৃষ্টি বারেকের জন্য পড়ল আগন্তুকের ওপর।

মিঃ রক্ষিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সুবীরের দিকে।

—আমার নাম সুবীর সামন্ত। বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি। সুবীরকে বসতে ইঙ্গিত করে মিঃ রক্ষিত বললেন, বলুন ?

—কথাটা একটু গোপনীয়···মানে···

—আপনি বলুন। আমার মেয়ের সামনে আপনার সঙ্কোচ করবার কিছু নেই।

সুবীর মনে মনে নিজেকে দৃঢ় করে নিয়ে আরম্ভ করল, আপনি আমায় চেনেন না। আমার আগমনে তাই একটু আশ্চর্যও হচ্ছেন। আমি আপনাকে আজ যা বলতে এসেছি, তা রাখা না রাখা সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে। তবে—

ছেলেটির বাকচাতুর্যে অবাক না হয়ে পারেন না বিনয়বাবু। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, আপনি বলুন, আমি শুনছি।

—আপনার জুপিটার বিজনেস কনসার্ন প্রাইভেট লিমিটেডের সিনিয়ার অর্গানাইজার সুশান্ত সামন্ত হলেন আমার বাবা।

—আই সি। সুশান্তবাবুকে আমি বিলক্ষণ চিনি। এরকম সৎ ভদ্রলোক আজকালকার দিনে বড় একটা দেখা যায় না।

—কাল তিনি অত্যন্ত বিপদে পড়ে যাওয়ায়, আজ আপনার কাছে আমায় আসতে হল।

—বিনয়বাবু দ্রুত কণ্ঠে বললেন, বিপদ! কোন অ্যাক্সিডেন্ট—

—না। আপনি আমার বক্তব্য অনুগ্রহ করে মন দিয়ে শুনুন। কাল বাবা ওরিয়েণ্ট স্পিনিং মিল থেকে কুড়ি হাজার টাকা কালেকশান করে ফিরছিলেন। পথেই টাকাটা খোয়া গেছে—

বিস্ময়ে ভেঙে পড়লেন মিঃ রক্ষিত, খোয়া গেছে! কিন্তু কি করে খোয়া গেল টাকাটা ?

কোম্পানীর গাড়ি নিজেই ড্রাইভ করে বাবা ফিরছিলেন। দুপুরও গড়িয়ে এসেছিল। যশোর রোডের এক বাঁকে একটি জীপ তাঁর পথ রুখে দাঁড়ায় অতর্কিতে। তিনি কিছু করে উঠবার আগেই কয়েকজন বন্দুকধারী তাঁর কাছ থেকে টাকার ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে সরে পড়ে। এই রকম দু-চারটে রাহাজানির কথা আমরা খবর কাগজেও পড়েছি এর আগে।—আপনি বাবাকে চেনেন বলছেন। কাজেই তাঁর স্বভাবের কথা কিছুটা নিশ্চয়ই জানেন। তিনি একথা

এখনো অফিসে জানাতে পারেন নি। তাঁর সারা জীবনের সততার ওপর একটা বিরাট আঘাত পড়বে, তাই তাঁর এই সঙ্কোচ।

সুবীর থামল। বিনয়বাবু পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ও মরিয়া হয়েই যেন আবার আরম্ভ করল, আপনার কাছে এলাম এই কারণে, আপনিই তাঁকে সুনাম, ভদ্র এবং সুস্থ ভাবে আবার বাঁচবার সুযোগ দিতে পারেন।

—আমি!—ছেলেটির নিঃসঙ্কোচ কথাবার্তা কিছুটা বিহ্বলই করে তোলে যেন বিনয়বাবুকে।

—আপনি বাবাকে যদি কিছু সময় দেন এই টাকাটা পরিশোধ করবার—সকলের অজ্ঞান্তেই ব্যাপারটার তাহলে সুষ্ঠু ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে কয়েক মিনিট গভীর চিন্তা করলেন বিনয়বাবু। তারপর সহজ ভাবেই বললেন, তুমি কি কর? তোমাকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করছি আমি বয়সে অনেক প্রবীন বলেই। অবশ্যই কিছু মনে করো না।

একটু আশ্চর্য হয়েই সুবীর উত্তর দিল, অধ্যাপনা করি।

—কি সাবজেক্ট তোমার?

—ইতিহাস।

বহু বছর আগে যারা মরে-হেজে গেছে, তাদের নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভাল লাগে?

—ছোটবেলা থেকেই ইতিহাসের ওপর আমার ভীষণ ঝোঁক। কিন্তু—

উঠে দাঁড়ালেন বিনয়বাবু।

—তোমার বাবার কথাটা আমি ভেবে দেখব। কাল দুপুরে আমার সঙ্গে অফিসে দেখা করবে।

টেবিলের ওপর থেকে নিজের একখানা কার্ড তুলে তিনি সুবীরের হাতে দেন। সুবীর সেখানা পকেটে রেখে দিয়ে হাত তুলে নমস্কার জানায় দুজনকে। আর একটিও কথা না বলে, এরপর বিদায় নেয় সে।

এতক্ষণ অপর্ণা সম্পূর্ণ চুপ করেই বসেছিল। এবার বলল, অদ্ভুত সপ্রতিভ ভদ্রলোক।

—হুঁ। বেশ ছেলে।

পরের দিন দুপুরে। একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ব্যবধানে, বিনয়বাবুর সামনাসামনি বসে রয়েছে সুবীর।

বিনয়বাবু বললেন, তোমার কথা আমি গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখলাম। তোমার বাবার স্পটলেশ কেরিয়ারের ওপর দাগ পড়ুক—এও আমি চাই না। তবে একথাটা ডিরেক্টার বোর্ডের মিটিংয়ে তুললে, হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা। তাই ওরিয়েন্ট স্পিনিং মিলের সঙ্গে কথা কয়ে, বিশ হাজার টাকার পেমেণ্টটা আমি নিজের নামেই করিয়ে নিচ্ছি। এতে সব দিকই বজায় থাকবে।

—আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার স্পর্ধা আমার নেই মিস্টার রক্ষিত।

—না। ধন্যবাদ পাবার মত আমি কিছু করি নি। এতে আমারও কিছু স্বার্থ রয়েছে।

—আপনার স্বার্থ!

বিনয়বাবু একটা সিগার ধরিয়ে বললেন, আজকের পৃথিবীতে স্বার্থহীন ভাবে কেউই কারুর জন্যে কিছু করে না। আমার স্বার্থ হল আমি চিরদিনের জন্য তোমাকে নিজের কাছে রাখতে চাই। বহুদিন ধরে তোমার মতই একজনকে আমি খুঁজছিলাম সুবীর।

—আমার মত! আমি কিন্তু…

—কিছুই বুঝতে পারছ না, এই তো? আমি তোমায় বুঝিয়ে বলছি। আমার মেয়ে অপর্ণাকে কাল তুমি দেখেছ। অতি আদরে, অতি যত্নে তাকে আমি মানুষ করেছি। তাই তাকে আমি কোন ছেলের হাতে দিতে চাই। কাল তোমায় দেখার পরই, আমার মনে হল, আমি যেন তোমাকেই এতদিন খুঁজছিলাম।

সুবীর আকাশ থেকে পড়ল, আমাকে—!

—আমি বিপুল অর্থের অধিকারী তা তুমি জানো। অপর্ণা আর অশোক আমার দুটি মাত্র সন্তান। আমার সমস্ত কিছুর ওপর ওদের দুজনের সমান দাবী। কাজেই—

—কিন্তু…

—তুমি আমার কথায় রাজী নাও হতে পার। তবে ভেবে দেখ তোমার বাবার কথা। এই বৃদ্ধ বয়সে সুদীর্ঘ কারাবাস তাঁর পক্ষে সম্মানের হবে কিনা।

সুবীর উঠে দাঁড়াল। একটা অজানা আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। বিন্দু বিন্দু ঘামে সারা মুখখানা ভিজে উঠল তার।

মিঃ রক্ষিত নিজের চেয়ার থেকে উঠে এসে ওর পাশে দাঁড়ালেন। সুবীরের

পিঠে একটা হাত রেখে মৃদু কণ্ঠে আবার বললেন, এই মুহূর্তে আমার কথার উত্তর দেবার দরকার নেই। আমি তোমায় তিনদিন ভেবে দেখবার সময় দিলাম।

সুবীর আর দাঁড়াল না, দ্রুত পদে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রাস্তায় পা দিয়েই একটা ট্যাক্সি ডাকল ও।

ট্যাক্সিতে উঠে বসার পরই বিপুল চিন্তার সমুদ্রে ডুবে গেল সুবীর। এখন তার কি কর্তব্য। আজীবন বাবা তাকে যে প্রেম-ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুলেছেন, তার প্রতিদানে কি সে……কিন্তু সুপর্ণা…… তাকেও তো সুবীর প্রাণ দিয়ে ভালবাসে—

তার চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল এই সময়ে। ড্রাইভার জানতে চাইছে তার গন্তব্যস্থল কোথায়?

সুপর্ণার সঙ্গে তার পরামর্শ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ও নিম্নকণ্ঠে বলল, থিয়েটার রোড।

থিয়েটার রোডের গোল্ড মেমোরিয়াল স্কুলের মিউজিক্যাল টিচার সুপর্ণা। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুপর্ণা বেরিয়ে এল বাগানে। সুবীরের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, একি! তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন?

সমস্ত ব্যাপারটাই ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে পর্ণা। তুমি—তুমি কি একবার আসবে আমার সঙ্গে?

কোন একটা অঘটন যে ঘটেছে একথা বুঝতে সুপর্ণার দেরি হয় না। ও নীরবে সুবীরকে অনুসরণ করে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পিছন দিককার ঘাসের কার্পেটের ওপর ওরা এসে বসল দুজনে পাশাপাশি।

সুবীর একে একে বলে গেল সমস্ত কিছু। অবাক বিস্ময়ে সুপর্ণা শুধু শুনল।

দুজনেই চুপচাপ এরপর।

এই নির্জন দুপুরে ভিক্টোরিয়ার আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। শুধু দূরে চৌরঙ্গী রোড থেকে ট্রাম ও বাসের একটা মিলিত যান্ত্রব শব্দ ভেসে আসছে থেকে থেকে।

এক সময়ে সুপর্ণাই নীরবতা ভঙ্গ করল, তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম পরীক্ষা তোমার সামনে। প্রতিবারের মত এবারও তোমায় এতে উত্তীর্ণ হতে হবে।

—আমি কি করব পর্ণা?

—তুমি তোমার কর্তব্য করবে। আজীবন বাবা তোমার জন্যে যেমন

আপ্রাণ ভাবে সমস্ত কিছু করে এসেছেন, আজ তাঁর বিপদে তোমাকেও সেই রকম আপ্রাণ ভাবে করতে হবে—।

—কিন্তু তুমি—তোমাকে কি ভাবে আমি ছেড়ে থাকব পর্ণা ?

—আমি তো তোমারি—

সুবীর সুপর্ণাকে কাছে টেনে আনল। আরো কাছে—।

—তুমি আমায় কথা দাও পর্ণা, বাহ্যিক সম্পর্কে যতই আমাদের ব্যবধান আসুক না কেন, আজীবন তুমি অন্তর দিয়ে আজকের মতই সম্পূর্ণ আমার হয়েই থাকবে ?···বল পর্ণা ?

সুপর্ণা সুবীরের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। চোখের কোণ দুটো একটু একটু ভিজে উঠেছে। এতক্ষণ ও নিজেকে কোন রকমে সংযত রেখেছিল, কিন্তু আর পারল না। সুবীরের বুকে মুখ গুঁজে ছোট মেয়ের মত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সুপর্ণা।

সুবীর বুঝতে পারে। পর্ণার অন্তস্থলে এ আঘাত যে কত গভীর ভাবে বসেছে, তা অনুমান করে ওর মনও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু···নিরুপায় সুবীর ওকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পায় না।

এরপর···এরপর এক বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যায় সুবীরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় অপর্ণার।

বিয়ের পর বেশ সহজ ভাবেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল একে একে। হঠাৎ একদিন অপর্ণা সরাসরি প্রশ্ন করল সুবীরকে তুমি সুপর্ণাকে চেনো ?

নির্বিকার কণ্ঠে পালটা প্রশ্ন করল ও কে সুপর্ণা ?

—আমার পিসতুতো বোন। তুমি তাহলে তাকে চেনো না ?

—না। এমন কি দেখেছি বলেও মনে পড়ছে না।

এবার ফেটে পড়ল অপর্ণা, শিক্ষিত লোক হয়ে এরকম ডাহা মিথ্যে কথা কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না ?

—মিথ্যে কথা ?

—তাছাড়া আবার কি ? এগুলো কি আমি জানতে চাই। তুমি অস্বীকার করতে পার এই চিঠিগুলো আর এই ছবিখানাকে ? তোমারই ওয়ার্ডরোবের ড্রয়ার থেকে পেয়েছি।

অপর্ণার হস্তস্থিত সুপর্ণার লেখা চিঠিগুলো আর ছবিখানার দিকে তাকিয়ে

নিয়ে সুবীর শান্ত কণ্ঠে বলল, বুঝতে যখন সবই পেরেছ, তখন আমায় আর মিথ্যে জিজ্ঞেস করে লাভ কি ?

—একথা আমার সামনে বলতে তোমার মুখে আটকাচ্ছে না ! ছি !

—এতে ছি-ছিক্কারের কি আছে বুঝতে পারছি না। তোমার মনে কোন আঘাত দেবার অভিপ্রায় আমার নেই। তোমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহারও আমি করি নি। সুতরাং বিয়ের আগে আমি কি করেছি, সেসব প্রশ্ন তোলা এখন সম্পূর্ণ নিরর্থক।

বৈভব আর প্রশ্রয়ের মধ্যে পালিত অপর্ণার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন মাথায় উঠে যাচ্ছে।

—তাই আমার বিয়েতে সুপর্ণা আসেনি। তুমি···তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে না হলে, ওকে বিয়ে করতে ?

—প্রশ্ন করছ তাই উত্তর দিচ্ছি, করতাম।

—কেন কেন তবে আমায় বিয়ে করেছিলে ?

কেন করেছিলাম ! আমায় বাধ্য করা হয়েছিল।

আজ তো একথা বলবেই। কোথায় ছিল তোমার এগুলোর জোর সেদিন ? আমার বাবার দয়ায় তোমার ওই ঠগ, জোচ্চোর বাপটি সকলের সামনে মাথা তুলে বেড়াচ্ছে, আবার—

—অপর্ণা—! কথা হচ্ছে আমার সঙ্গে তোমার। তুমি আমাকে যা ইচ্ছে বলতে পার, তাই বলে বাবাকে ছোট করার অধিকার তোমার নেই।

সুবীর আর দাঁড়াল না কথা কটা বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

এ ঘটনার এইখানেই কিন্তু শেষ নয়, এই শুরু।

এরপর খিটিমিটি ঝগড়া লেগেই থাকত। অবশ্য একতরফাই। অপর্ণার সুতীব্র বাক্যবাণের বিরুদ্ধে সুবীর আর মুখ খুলত না মোটেই।

এইভাবে কোনরকমে দিন কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু বিধাতার এও বোধহয় মনঃপূত ছিল না।

একদিন—

দিন কয়েক হল বাপের বাড়িতে এসেছে অপর্ণা। সুপর্ণা সংক্রান্ত ব্যাপারটা এখানেও আর কারুরই অজানা নয়। কাজেই অপর্ণাকে নানা ভাবে প্রফুল্ল রাখবার জন্যে সকলেই ব্যস্ত।

আজ সকালে উঠেই অশোক বলল, আজ দিনটা বেশ। আমার ছুটিও আছে। চল, মোটরে ডায়মণ্ডহারবার ঘুরে আসি।

অপর্ণা বলল, ডায়মণ্ডহারবার তো সেদিনই গেলাম দাদা। তার চেয়ে ব্যারাকপুরে চল, গান্ধীঘাট ঘুরে আসি।

ব্যারাকপুর যাওয়াই স্থির হল।

নটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। সত্যি, বেশ দিনটা আজ। ঠাণ্ডা আমেজের সঙ্গে মেঘলা করে রয়েছে আকাশ। রোদ্দুরের ছিটেফোঁটাও কোথাও নেই।

ব্যারাকপুর পৌছতে খুব বেশী সময় লাগল না।

আজ ছুটির দিন। অনেকেই এসেছেন বেড়াতে। গান্ধীঘাট বেশ জমজমাট।

কয়েকটা পালতোলা নৌকো গঙ্গার ওপর দিয়ে পর পর এই সময়ে চলে গেল। অপূর্ব দৃশ্য।

অপর্ণা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল গঙ্গার দিকে। নৌকোগুলো বাঁকের মুখে দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পর ও দৃষ্টি ফেরাল। গান্ধীজীর জীবন-কথা যেখানে সুন্দর ভাবে খোদিত রয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল অপর্ণা।

সুবীর ঘনিষ্ঠ ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুপর্ণার সঙ্গে। কি যেন বোঝাচ্ছে ওকে। গান্ধীজীর সম্বন্ধেই হয়তো কিছু।

অপর্ণার কণ্ঠ থেকে একটা আর্তরব বেরিয়ে এল, দাদা—

অশোক তখন একটা সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত ছিল। ও ফিরে তাকাল ব্যগ্র ভাবে। অপর্ণা আর একটি কথাও না বলে, ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল গাড়িখানা যেখানে পার্ক করা আছে, সেদিকে।

সুবীর বাড়ি ফিরল প্রায় একটায়।

নিজের ঘরে ঢুকেই ও অবাক হল। একটা চেয়ারে গম্ভীর মুখে বসে রয়েছে অপর্ণা।

ও আশ্চর্য কণ্ঠে বলল, তুমি— !

বারুদের স্তূপে একটা জলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ফেলে দিলে যে বিধ্বংসী কাণ্ড সংঘটিত হয়, তার চেয়ে কোন অংশে কম দুর গড়াল না ঘটনাটা এরপর।

এমন একটা বিশ্রী রকমের মনমালিন্য ঘটে গেল, যা তাদের অসুখী বিবাহিত জীবনেও এতটা চরম কোনদিন হয়নি।

সুবীর অনেক ভাবে অনেক কথাই অপর্ণাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু

কোনই ফল হল না। অপর্ণা আলমারি থেকে গয়নার বাক্সটা বার করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার মুখে বলল, তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ। এ বাড়িতে আমি আর ফিরে আসছি না। দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলল অপর্ণা।

সুবীর এগিয়ে এসে বলল, আমি তো তোমায় যেতে বলি নি?

—তা বলবে কেন। স্বার্থপর, সুবিধাবাদীর মত দু-দিকই বজায় রাখবার চেষ্টা করেছ—আমার টাকা আর সুপর্ণার ভালবাসা।

—কিন্তু—বেশ। যাচ্ছ যাও, অন্তত বাবা ফিরে আসুন। তাঁকে জিজ্ঞেস করে যাও!

—তোমার বাবা—! থাক, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই।

অপর্ণা দ্রুত নেমে চলল।

—শোন অপর্ণা—

—না—না—

কিন্তু কথা আর শেষ হল না—টাউরি খেলো অপর্ণা। সিঁড়ির ধাপে ধাপে গড়িয়ে চলল দেহটা। শেষ ধাপে এসে যখন থামল তখন রক্তাক্ত অপর্ণার দেহে আর জ্ঞান নেই।

গয়নার বাক্সটাও ডালা খোলা অবস্থায় ছিটকে পড়েছে একধারে। ছড়িয়ে গেছে মেঝের উপর গয়নাগুলো। পলকপাতে সমস্ত ঘটে গেল যেন—।

এরপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। খবর পেয়েই বিনয় রক্ষিত ছুটে এলেন স্বয়ং। মেয়েকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। শহরের সেরা ডাক্তারদের আহ্বান করা হল।

তাঁরা গভীর ভাবে রুগীকে পরীক্ষা করে মত প্রকাশ করলেন। আঘাত তেমন গুরুতর নয়। দু-একদিনেই ঠিক হয়ে যাবে। তবে রুগীর চাই এখন পূর্ণ বিশ্রাম, কারণ কঠিন মানসিক রোগে ইনি আক্রান্ত হয়েছেন বলেই অনুমান করা যাচ্ছে।

সুবীর সহজ ভাবেই এসেছে স্ত্রীর কাছে। বিনয়বাবু কোন রকম আপত্তি তোলেন নি। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন এই সমস্ত ঘটনার জন্যে হয়তো প্রকৃত দায়ী তিনিই।

নির্বিবাদেই দিন কেটে যাচ্ছিল।

দিনের বেলা সকলে পালা করে অপর্ণাকে দেখাশুনা করতেন। রাত্রে সুবীর একাই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করত। দুর্ঘটনার দিন···

ঢং ঢং করে ন'টা বাজল।

চটকা ভাঙল নির্মল পালিতের। অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এলেন তিনি। দক্ষিণের জানালার কাছ থেকে সরে এসে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনেকার রিভলবিং চেয়ারটায় বসলেন।

সুবীরের মুখে যা শুনেছিলেন তা যে কেবল তাঁর নথিপত্রেই লেখা আছে তাই নয়, বরং পরিষ্কার মনেও আছে।

দুর্ঘটনার দিন সুবীর প্রায় রাত ন'টার সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে অপর্ণার ঘরে যায়। অপর্ণা তখন জেগেই ছিল। ওকে দেখেই সে মুখ ঘুরিয়ে শুলো। সুবীর বাক্য-ব্যয় না করে কৌচের ওপর গিয়ে বসল—টেবিলের ওপর থেকে একটা বই টেনে নিয়ে মনোনিবেশ করল তাতে।

কয়েক মিনিট কেটেছে বোধহয়, এমন সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল সত্রাসে। সুবীর উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল।

নিচে লাইব্রেরি ঘরে বিনয়বাবু তাকে আহ্বান করছেন।

হঠাৎ কি দরকার পড়ল!

সুবীর সোজা লাইব্রেরি ঘরে চলে এল।

ওকে দেখেই বিনয়বাবু বললেন, কাল চেম্বার অফ কমার্সে আমার একটা বক্তৃতা আছে। দেখত, ঠিক লেখা হয়েছে কিনা।

সুবীর তাঁর হাত থেকে বক্তৃতা লেখা কাগজগুলো তুলে নিল।

বিনয়বাবু আবার বললেন, তোমার নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে না? আমার সেক্রেটারি আজ অনুপস্থিত বলেই তোমাকে···

—না, না অসুবিধা আর কি। আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে, আমি দেখে রাখব।

ভাল করে বিশদভাবে বক্তৃতাটাকে সংস্কার করতে গিয়ে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। বিনয়বাবু অবশ্য চলে গেছেন অনেক আগেই। রাত বারটা হবে।

সুবীর হাই তুলে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু লাইব্রেরি ঘর থেকে বেরুবার আগেই একটা আর্ত চিৎকারের সঙ্গে গুরুভার কিছু পড়ার শব্দে ও সচকিত হয়ে উঠল।

এক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুবীর। তারপর শব্দ লক্ষ্য

করে ছুটে গেল। খুব বেশী দূর তাকে যেতে হল না, উঠানের একধারে উপুড় হয়ে পড়ে আছে অপর্ণার দেহটা—নিথর, নিষ্কম্প—।

এতক্ষণে বাড়ির অন্যান্য সকলে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছেন। পুলিশের কাছে খবর পেঁাছাতেও খুব বেশী দেরি হয়নি। তারপর—

ভাবতে ভাবতে সিগারেট ধরালেন নির্মল পালিত। তারপর ঝুঁকে পড়েন ব্রিফের ওপর।

পর পর তিনদিন ধরে বহু সাক্ষীকে জেরা করবার পর পাব্লিক প্রসিকিউটার রণদাকান্ত নিজের শেষ মন্তব্য পেশ করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

—ইওর অনার আমি নিজের বক্তব্য প্রথমেই জানিয়েছি—এবং এই তিনদিন ধরে এতগুলি সাক্ষীকে জেরা করার পর আমার কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছে। এটি একটি নিষ্ঠুর হত্যা। শিক্ষিত ও রুচিশীল হয়েও আসামী সুবীর সামন্ত এই জঘন্য অপরাধে অপরাধী। সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে ও পরিকল্পনা করে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।

আসামী নিজের মেলোঙ্কোলিয়া রোগগ্রস্থ স্ত্রীকে এইভাবে হত্যা করে সকলের মনে এই ধেঁাকারই সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছে যে কোন দুর্বল মুহূর্তে অপর্ণাদেবী নিজেই উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছেন—ইওর অনার আমার আর কিছু বক্তব্য নেই। শুধু একটি অনুরোধ আছে, আসামীর গুরুতর অপরাধের কথা চিন্তা করে তাঁকে কঠিনতম শাস্তি দেওয়া হোক—আদালতের কাছে এই আমার প্রার্থনা।

রণদাকান্ত চৌধুরী নিজের চেয়ারে এসে বসলেন।

আজ আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য। খবর কাগজে অপর্ণা হত্যা সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি ফলাও করে প্রকাশ করার দরুন সাধারণের মনে এই ঔৎসুক্য।

মিনিট কয়েক পরেই আসামী পক্ষের নির্মল পালিত উঠে দাঁড়ালেন। —ইওর অনার এবং মান্যবর জুরীগণ, কয়েকদিন ধরে আপ্রাণভাবে চেষ্টা করে আমার মান্যবর বন্ধু মিঃ চৌধুরী সুবীর সামন্তকে দোষী প্রমাণিত করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আপনারা জানেন আমি প্রথম থেকেই আসামীকে নির্দোষ বলে অবিহিত করে আসছি। তার যে কয়েকটি সঙ্গত কারণ আছে—সেগুলি এবার আমি একে একে প্রকাশ করব। সুবীর সামন্তের সঙ্গে সুপর্ণাদেবীর গভীর ভালবাসা ছিল, একথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু এর জন্যে তাঁদের বিবাহিত জীবনের কোন ক্ষতি হয়নি। সুবীরবাবু সুন্দর ভাবে অপর্ণাদেবীর

সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু একটা হিংসা, একটা বিরূপ মনোভাব ভেতরে ভেতরে অপর্ণাদেবীকে খেয়ে যাচ্ছিল। যার জন্যে তিনি দুরূহ মলোঙ্কোলিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। একথা ভেবে নিলে খুব অসঙ্গত হবে না যে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত অপর্ণাদেবী স্বামীকে বিপদে ফেলবার জন্যেই ইচ্ছাকৃত ভাবে উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। কিম্বা তাঁকে অন্য কেউ ওই ভাবে হত্যা করেছিল। আমি এবার সাক্ষ্য প্রমাণ সহযোগে তাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করব। আমার অগণিত সাক্ষী নেই, আমি মাত্র তিনজনকে আহ্বান করব।

মাননীয় বিচারপতি সাক্ষীদের আহ্বান জানাবার অনুমতি দেবার পর নির্মল পালিতের অনুরোধে প্রথমেই সাক্ষী মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন বিনয় রক্ষিত।

নির্মল পালিত প্রশ্ন আরম্ভ করলেন, আপনি স্থির নিশ্চিত, আসামী সুবীর সামন্ত আপনার মেয়েকে হত্যা করেছেন, এ বিষয়ে ?

—হ্যাঁ। কারণ তার পক্ষেই একাজ করা সম্ভব।

—অথচ আপনি তাকে নিজে পছন্দ করে জামাই করেছিলেন।

বিনয় রক্ষিত নীরব রইলেন।

—ওয়েল। আপনার বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি নিশ্চয়ই।

—করুন।

নির্মল পালিত সাক্ষীমঞ্চের খুব কাছে গিয়ে বললেন, বিয়ের পর আপনার মেয়ের সম্বন্ধে আপনি কি রকম কি ব্যবস্থা করেছিলেন ?

—কলকাতার দুখানা বাড়ি এবং দশ লক্ষ টাকা আমি তাকে যৌতুক দিয়েছিলাম।

—আপনার মেয়ের মৃত্যুর পর এসমস্ত নিশ্চয়ই এখন আপনার জামাইয়ের প্রাপ্য ?

একটু ইতস্ততঃ করে বিনয় রক্ষিত বললেন, না। অপর্ণা মারা যাওয়ার দিন পঁচিশেক আগে একটা উইল করেছিল।

—উইল! আপনি নিশ্চয়ই বলবেন, সেই উইলে নিজের সম্পত্তি ও নগদ টাকা কাকে কি ভাবে দিয়ে গেছেন ?

—বাড়ি দুখানা ও দু'লাখ টাকা দিয়ে গেছে সে আমার ছেলে অশোককেই। আর বাকি আট লাখের মধ্যে এক লাখ অশোকের বন্ধু গৌরকে, পঞ্চাশ হাজার

আমাদের ম্যানেজার হরিশঙ্করবাবুকে আর সাড়ে ছ'লাখ স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েদের সুস্থভাবে জীবন ধারণ করবার সুযোগ দেবার জন্যে একটি সমিতিকে।

—হুঁ। তার মানে নিজের স্বামীকে তিনি একটি পয়সাও দিয়ে যান নি। আচ্ছা, এবার দুর্ঘটনার দিনের কথা কিছু আলোচনা করা যাক! সেদিন আপনি রাত প্রায় দশটার সময়ে টেলিফোনে সুবীরবাবুকে নিচে লাইব্রেরিতে ডেকেছিলেন?

—হ্যাঁ। আমার সেক্রেটারি অসুস্থতার জন্যে অনুপস্থিত ছিল, তাই ওকে ডেকেছিলাম একটা লেখা কারেক্ট করিয়ে নেবার জন্যে।

—ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, আপনি দুপুরেই বুঝতে পেরেছিলেন নিশ্চয়ই আপনার সেক্রেটারি আসবে না, তখন সারা দিন, বিকেল বা সন্ধ্যার মধ্যে লেখাটা কারেক্ট না করিয়ে এত রাত্রে সুবীরবাবুকে ডাকলেন কেন?

—না, মানে···

—তাছাড়া—নির্মল পালিত আবার আরম্ভ করলেন, তাছাড়া লেখাটা আপনি শুতে যাওয়ার সময়ে তাঁকে অপর্ণাদেবীর ঘরেও দিয়ে আসতে পারতেন। কোন অসুবিধা ছিল না। তবু তাঁকে লাইব্রেরি ঘরে ডেকে নিয়ে যাওয়ার একটা সঙ্গত কারণ নিশ্চয়ই আছে মিস্টার রক্ষিত?

—কারণ—কারণ আর কি থাকতে পারে; আমি স্বাভাবিক ভাবেই ওকে লাইব্রেরি ঘরে ডেকেছিলাম।

থতমত খেয়ে কোন রকমে কথাটা শেষ করলেন বিনয় রক্ষিত।

—ধন্যবাদ মিস্টার রক্ষিত, আপনাকে আমার আর কিছু প্রশ্ন নেই।

বিনয় রক্ষিতের পর আহ্বান করা হল, রক্ষিত বাড়ির পুরানো চাকর কানাইকে।

নির্মল পালিত প্রশ্ন আরম্ভ করলেন, তোমার নাম কানাই?

—আজ্ঞে, বাবু।

—তোমাদের জামাইবাবু কি রকম স্বভাবের লোক?

—আজ্ঞে, খুব ভাল লোক। মায়া-দয়া আছে শরীরে।

—আচ্ছা, কানাই, যেদিন তোমাদের দিদিমণি মারা যান, সে রাত্রের সমস্ত কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে।

—আছে বাবু। তা কি ভোলা যায়—!

—বেশ; আমায় গুছিয়ে সব বলত?

—আজ্ঞে, সেদিন রাত প্রায় এগারটার সময়ে আমি খাওয়া দাওয়া সেরে

রর দিকে যাচ্ছিলাম। বারান্দাটা পার হওয়ার সময় চোখে পড়ল বইপত্তরের আলো জলছে। উঁকি দিয়ে দেখলুম, জামাইবাবু লেখাপড়া করছেন। আমি র না দাঁড়িয়ে সোজা দরজার সামনে এসে বসলুম। দারওয়ান বাহাদুরের কথা কইছিলুম। কতক্ষণ কথা হয়েছে জানি না—এমন সময় খুব জোরে কার আর কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ পেলাম। ছুটে উঠোনে গিয়ে দেখি দিমণি পড়ে রয়েছেন।

—সে সময়ে তোমার জামাইবাবু সেখানে ছিলেন ?

—আজ্ঞে। তিনিও বইপত্তরের ঘর থেকে ছুটে এসেছিলেন।

—তুমি ঠিক জান, সে সময় তোমার জামাইবাবু বইপত্তরের ঘর থেকেই ছুটে সছিলেন ?

—আজ্ঞে, বাবু। আমি যে দেখলুম, তিনি আমার সাথে সাথেই ওই ঘর কে বেরিয়ে এসেছিলেন।

কানাইকে আর কোন প্রশ্ন করলেন না নির্মল পালিত।

কানাইয়ের পর সাক্ষীমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন সুপর্ণা ধর। মিঃ পালিতের য় সাক্ষী।

প্রশ্ন-উত্তর আরম্ভ হল।

—আপনার সঙ্গে সুবীরবাবুর কি দীর্ঘদিন ধরে আলাপ ছিল ?

ম্রিয়মান কণ্ঠে মুখ নিচু করে সুপর্ণা উত্তর দিল, বছর চারেকের উপর।

—আপনাদের দুজনের বিয়ে হবার কথা ছিল কি ?

—হ্যাঁ, ছিল।

—হল না কেন, অনুগ্রহ করে বলুন ?

—পারিবারিক কারণে ও অপর্ণাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল।

—আপনি এতে আপত্তি করেন নি ?

—না। আমি ওকে ওর কর্তব্য করতেই অনুরোধ করেছিলাম।

—আপনি নিশ্চয়ই জানেন, পুলিশের মতে সুবীরবাবু অপর্ণাদেবীকে হত্যা রছেন আপনার জন্যেই।

—শুনে আশ্চর্য হয়েছি!

—কেন ? কেন আশ্চর্য হয়েছেন সুপর্ণাদেবী ?

—কারণ আমাদের দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া হবার পরই ও অপর্ণাকে বিয়ে রছিল, কাজেই তাকে খুন করার কোন সঙ্গত অর্থ থাকতে পারে না।

—ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সুপর্ণাদেবী। আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আপ
যেতে পারেন।

সুপর্ণা সাক্ষীমঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার পরই, নির্মল পালিত বিচারপতির দি
ফিরে দাঁড়ালেন। ইওর অনার আমার আর কোন উইট্নেস নেই। আমা
তিনজন সাক্ষীর মুখ থেকে আমরা যা-কিছু শুনেছি, তাতে পরিষ্কার বোঝা যা
আসামী সুবীর সামন্ত সম্পূর্ণ নির্দোষ। অপর্ণাদেবীকে হত্যা করাতে তাঁর কো
স্বার্থ থাকতে পারে না। কারণ সুপর্ণাদেবীর সঙ্গে বোঝাপড়া হবার পরই এ
প্রকৃতপক্ষে তাঁরই পরামর্শে আসামী সুবীর সামন্ত অপর্ণাদেবীকে বিবা
করেছিলেন। কাজেই স্ত্রীকে হত্যা করবার কোন মোটিভ তাঁর থাকতে পারে না
তাছাড়া আসামী চরিত্রগত ভাবে অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী ও শান্ত হিসেবে খ্যাত
সুতরাং আমাদের এদিকটাও ভেবে দেখতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধা
এই ধরনের নির্মল স্বভাবের অধিকারী আসামী সুবীর সামন্ত কখনই এই ধরনে
জঘন্য অপরাধে অপরাধী হতে পারে না। ইওর অনার এবং মাননীয় জুরিগ
এবার দুর্ঘটনার দিনের কথা আপনাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেদি
ইচ্ছাকৃত ভাবে আসামীকে অপর্ণাদেবীর ঘর থেকে সরিয়ে নিচে লাইব্রেরি ঘ
আনা হয়েছিল। যে কাজ সহজেই তেতলার ঘরে হওয়া সম্ভব ছিল, তার জ
আসামীকে নিচে লাইব্রেরি ঘরে নেমে আসতে বাধ্য করা হয়েছিল। এতে সহজে
চোখে পড়েছে আসামীর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত। চক্রান্তকারীরা চমৎকা
ভাবে কাজটি সমাধা করেছে। স্ত্রীকে হত্যা করে এক কানাকড়িও সুবীরবাবু
লাভ ছিল না। কারণ অপর্ণাদেবী নিজের উইলে তাঁকে কপর্দকও দিয়ে যান নি
সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেওয়া যায় আসামী সুবীর সামন্ত স্ত্রীকে হত
করে কখনই পরের লাভের দরজা খুলে দেবে না। চক্রান্তকারীরা সুন্দরভা
প্ল্যানটি খাড়া করেছিল, আসামীর অবর্তমানে অপর্ণাদেবীকে হত্যা করা অথ
পূর্বের ঘটনা পরম্পরার দরুন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করবে। শেষ পর্যন্ত হল
তাই। কিন্তু বাড়ির পুরানো চাকর কানাইয়ের কথায় আমরা চক্রান্তকারীদে
সে চক্রান্ত ধরে ফেলেছি। কানাই সুবীর সামন্তকে লাইব্রেরি ঘরে দেখেছিল
এমন কি অপর্ণাদেবীর উপর থেকে পড়ার মুহূর্ত পরে কানাই এবং আসা
ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিল। আসামী সামন্ত যদি সত্যিই অপর্ণাদেবীকে ধা
দিয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর দেহটি উপর থেকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নি
উঠানে আসামীর উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। অথচ উনি ছিলেন। এ

মাণিত হচ্ছে আমার মক্কেল সুবীর সামন্ত সম্পূর্ণ নির্দোষ। দ্যাট্স্ অল্ ওর অনার।

এতক্ষণ ধরে একনাগাড়ে বলার পর থামলেন নির্মল পালিত। রুমাল দিয়ে জের মুখখানা ভাল করে মুছে নিয়ে নির্দিষ্ট চেয়ারে গিয়ে বসলেন তিনি।

কিন্তু আদালতের কাজ আর এগুলো না। প্রবীন বিচারপতি কেসটিকে াজকের মত মুলতুবি রাখলেন।

দিন কয়েক পরে।

গম্ভীর মুখে খবরের কাগজ হাতে বসে রয়েছেন বিনয় রক্ষিত।

গতকাল অপর্ণা হত্যা-কেসের রায় বেরিয়ে গেছে। আজ কাগজে ফলাও রে প্রকাশিত হয়েছে তা।

সুবীরকে সম্পূর্ণ নির্দোষ হিসেবে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

বিনয় রক্ষিত ভাবছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, অপর্ণাকে হত্যা করার পেছনে ক গভীর চক্রান্ত রয়েছে। আর সেই চক্রান্তের জালেই সুবীর ধরা পড়েছিল।

কে—কে তবে অপর্ণাকে হত্যা করেছে?…তবে কি অর্থের লোভে সত্যিই াকে কেউ…

উঠে দাঁড়ান বিনয়বাবু। অস্থির ভাবে পায়চারি করতে থাকেন ঘরের এক ান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত।

এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। এক সময়ে মনকে দৃঢ় করেন বিনয়বাবু -তাঁর প্রিয়তমা কন্যাকে যে হত্যা করেছে, সে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে বনটা সুখে স্বাচ্ছন্দে কাটিয়ে দেবে; এ তিনি হতে দেবেন না।…হয়তো কান্ত নিজের কেউ এ চক্রান্তে জড়িত, হয়তো…তবু…তবু এর নিষ্পত্তি চান নয়বাবু।

তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে যান টেলিফোন-রক্ষিত টেবিলটার কাছে। টলিফোন গাইডখানা তুলে নেন।

পাতা ওল্টাতে থাকেন একের পর এক। কার ফোন নম্বর যেন খুঁজতে াকেন ব্যগ্র ভাবে।

মিনিট কয়েক আগে দশটা বেজে গেছে।

হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে বাসব কৌচে আধশোয়া অবস্থায় অলস ভাবে কটা আমেরিকান পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল।

শৈবাল বসেছিল সামনেই আরেকখানা কৌচে। গভীর মনোসংযোগে একটা বই পড়ছিল সে।

সময়ের গতিবেগ টিক্ টিক শব্দ তুলে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঝন-ঝন শ… টেলিফোন বেজে উঠল এই সময়ে।

বাসব হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল—হ্যালো—

—কুড আই স্পিক টু মিস্টার ব্যানার্জি—

—স্পিকিং—

এরপর কথার আদান-প্রদান চলল কিছুক্ষণ। এক সময়ে রিসিভার নামি… রাখল বাসব। উৎসুক ভাবে শৈবালের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কে ফো… করছিল জানো?—সুবিখ্যাত ধনী বিনয় রক্ষিত।

হঠাৎ—কি ব্যাপার?

—তোমার স্মরণ শক্তিকে প্রশংসা করতে পারছি না ডাক্তার। দিনের পর দিন ধরে অপর্ণার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে এত কথা পেপারে পড়ার পর, এখন যদি···

—ও। ওই সম্বন্ধেই···কিন্তু কেস তো শেষ হয়ে গেছে।

—কেস অবশ্য শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃত হত্যাকারী ধরা পড়ে নি… মিস্টার রক্ষিত আমার সাহায্যে নিজের কন্যার হত্যাকারীকে ধরতে চান। তি… কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছেন এখানে।

আধ ঘণ্টাটাক পরেই বিনয় রক্ষিত দেখা দিলেন। বাসব তাঁকে সাদ… আহ্বান করে বসতে অনুরোধ করল। শৈবাল খুঁটিয়ে দেখল তাঁকে।

বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। ধারাল মুখ। চওড়া কপাল।

কন্যার মৃত্যুতে বেশ আঘাত পেয়েছেন, এক নজর তাঁকে দেখলেই বোঝা যা…

বিনয়বাবু বাসবকে নিজের মনোভাব বুঝিয়ে বললেন! যে গেছে, সে অ… আর ফিরে আসবে না, তবু প্রকৃত হত্যাকারীর তিনি শাস্তি চান।

বাসবের অনুরোধে তিনি আদ্যপান্ত সমস্ত ঘটনা একে একে বর্ণনা করলে… এরপর।

বাসব একমনে সমস্ত শোনার পর প্রশ্ন করল, আদালতে রায় বেরুবার আ… আপনার জামাই খুন করতে পারে না, এ ধারণা আপনার মনে কোন… হয়েছিল?

—এক এক সময়ে মনে হত সুবীর হয়তো একাজ করে নি। তাকে … সত্যিই আমি লাইব্রেরি-ঘরে এনে আটক রেখেছিলাম।

—আপনার নিজের ঘর বাড়ির কোন্ তলাতে ?

বাসবের প্রশ্ন করার ধরনে শৈবাল অবাক হয়।

—তেতলায়। উত্তর দিকের বড় ঘরখানা।

—আপনি যখন সুবীরবাবুকে নিচে লাইব্রেরি-ঘর থেকে রিং করেন, তখন দশটা বেজে গেছে। আপনাকে শুতে তেতলাতেই যেতে হত, কাজেই ফোনে তাঁকে না ডেকে আপনি সহজেই তেতলায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারতেন, অথচ—

—আমি নিজেই একথা ভেবে অবাক হই মিস্টার ব্যানার্জি, কেন সেদিন আমি ওকে ফোনে নিচে ডেকেছিলাম—

—ব্যাপারটা তাহলে সম্পূর্ণ আকস্মিক?

—সম্পূর্ণ।

—কিন্তু দিনভোরের মধ্যে আপনি আর্টিকেলটা সুবীরবাবুকে দিয়ে কারেকশান করিয়ে নেন নি কেন ?

—দুপুরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম সেক্রেটারি আজ আসবে না, অথচ লেখাটা কাউকে অবশ্য করে দেখিয়ে নেওয়া দরকার। অশোক বললে, সুবীরকে দিয়ে সন্ধ্যার পর দেখিয়ে নিতে। কাজেই—

—হুঁ। আমি সন্ধ্যার সময় আপনার ওখানে যাচ্ছি। কিন্তু—

—বলুন।

আপনি যদি সত্যি ঘটনার নিষ্পত্তি চান, তাহলে আপনার এবং আপনার বাড়ির আর সকলের পূর্ণ সহযোগিতা আমি চাই।

—নিশ্চয়ই। ও-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন !

বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন বিনয় রক্ষিত।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়—।

বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে রক্ষিত লজে উপস্থিত হল।

আধুনিক ধাঁচের তেতলা বাড়ি।

পার্লারেই বাসবের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন বিনয়বাবু।

প্রারম্ভিক দু-চার কথার পর বাসব বলল, আমি প্রথমেই অপর্ণাদেবীর ঘরখানা দেখতে চাই।

—আসুন !

বিনয়বাবু নিজেই ওদের দুজনকে ওপরে নিয়ে চললেন। সুন্দর মোজেক করা সিঁড়ি, ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে।

সিঁড়ি শেষ হবার পরই টানা বারান্দা। বারান্দা-শেষে ঘরখানা। তালা খুলে সকলকে আসতে হল ঘরের ভেতরে।

সরকার-পক্ষ থেকেই অবশ্য ঘরে তালা দেওয়া। আগে একজন পাহারাওয়ালা মোতায়েন ছিল, এখন নেই। বিশেষ ব্যবস্থানুসারে আজ ঘরের চাবি আনিয়ে রেখেছিলেন বিনয়বাবু।

নিরাভরণ ঘরখানা। রিক্ততায় চারধার খাঁ খাঁ করছে। বাসব খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সমস্ত কিছু।

মাঝারি ধরনের ঘরখানা। মাঝামাঝি জায়গায় একটা খাট। একধারে টেবিল, খানকয়েক রেকসিনে মোড়া চেয়ার— গডরেজের আলমারি একটা, খাটের লাগোয়া বুককেশ।

ডিসটেম্পার করা ঘরের দেওয়াল। সারি সারি জানালা তিনটা পুব দিকের দেওয়ালে। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো—শিক বা গ্রিল কিছুই নেই। বাসব একটা জানালার পাল্লা খুলে উঁকি মারল। নিচে উঠান দেখা যাচ্ছে।

—মিস্টার রক্ষিত, কোন্ জানালা দিয়ে অপর্ণাদেবীকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল?

বাসবের প্রশ্নে বিনয়বাবু মাঝের জানালাটা দেখিয়ে দিলেন।

বাসব সেদিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে বলল, অনুগ্রহ করে অশোক-বাবুকে একবার পাঠিয়ে দিন।

বিনয়বাবু ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে বাসব বলল, নিচে থেকে উপরের এই ঘরে আসতে কতক্ষণ সময় লাগল জানো--প্রায় চার মিনিট।

বিস্মিত কণ্ঠে শৈবাল বলল, হঠাৎ একথা বলছ যে?

কিন্তু বাসব উত্তর দেবার আগেই অশোক রক্ষিত ঘরে এলেন। বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে তাঁকে।

—আমায় ডেকেছেন?

—আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত অশোকবাবু। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আপনার বাবা আপনার বোনের হত্যা-রহস্যের তদন্ত করতে আমায় নিযুক্ত করেছেন?

—শুনেছি।

--সেই সূত্রেই আপনাকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করব।

—আমার বক্তব্য সবই আমি কোর্টে বলেছি।

—তা জানি তবু গোটা কতক কথা আমার জানার আছে।

নিরুপায় ভঙ্গিতে অশোক রক্ষিত বললেন, বলুন?

—সুবীরবাবু নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় নিশ্চয়ই আপনি খুশি হতে পারেন নি।

—অখুশি হবারও কিছু নেই।

—আপনি এখন বুঝতে পেরেছেন বোধহয়, আপনার বোনকে অন্য কেউ নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে।

—হ্যাঁ। এখন ব্যাপারটা সেই রকমই দাঁড়াচ্ছে বটে।

কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?

—না।

হুঁ। অপর্ণাদেবীর মৃত্যুতে তাঁর উইল অনুসারে আপনি তো বেশ লাভবান হয়েছেন তাই না।

ভ্রূ-কুঁচকে অশোক রক্ষিত উত্তর দিলেন, শুধু আমি একলা নই, অনেকেই লাভবান হয়েছেন—।

—দুর্ঘটনার দিন রাত দশটার পর আপনি কোথায় ছিলেন, নিজের ঘরেই কি?

—স্বাভাবিক। এবার আমায় যেতে হবে। আরজেন্ট একটা এনগেজমেণ্ট আছে।

অশোক রক্ষিত উত্তরের অপেক্ষা না করেই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। বাসব আর শৈবালের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হল। তারপর ওরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নিচে সিঁড়ির সামনেই বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের।

—যাচ্ছেন?

—আপনার ম্যানেজারের সঙ্গে একবার দেখা করে যাব ভাবছি।

—বেশ তো, আমি এখুনি হরিশঙ্করবাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কয়েক মিনিট পরেই হরিশঙ্করবাবু দেখা দিলেন।

ঘিয়ে-ভাজা চেহারা। বয়স পঞ্চাশের ওপরে। মুখে নির্বিকার ভাব।

—আমায় ডেকেছেন স্যার?

—হ্যাঁ। কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবার ছিল।

—বলুন?

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, অপর্ণাদেবী উইল করে হঠাৎ আপনাকে এতগুলো টাকা দিয়ে গেলেন কেন হরিশঙ্করবাবু?

বাসবের হঠাৎ এই ধরনের প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেলেন হরিশঙ্করবাবু।

তারপর আমতা আমতা করে বললেন, ছোটবেলা থেকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলাম, তাই বোধহয়…

—হুঁ। তাহলে আপনি বহুদিন ধরেই এ বাড়িতে আছেন?

—তা হল বৈকি, ত্রিশ বছরের ওপর হল। যখন প্রথম চাকরিতে ঢুকি, সে কি আজকের কথা, বুড়ো কর্তার আমল তখন।

—হুঁ। আচ্ছা, হরিশঙ্করবাবু, এ বাড়ির সমস্ত রকম বিলি-ব্যবস্থা আপনার হাত দিয়েই হয়, না?

—তা অবশ্য হয়—কিন্তু—

বাসব। সিগারেটে দীর্ঘ এক টান দিয়ে বলল, যেমন ধরুন, বাড়ি হোয়াইট-ওয়াস করানো। কতদিন আগে এ-বাড়ি হোয়াইট-ওয়াস করিয়েছেন আপনি?

বিস্মিত কণ্ঠে হরিশঙ্করবাবু উত্তর দিলেন, মাস দুয়েক আগে।

—ধন্যবাদ হরিশঙ্করবাবু। ওয়েল মিস্টার রক্ষিত, এবার আমরা চলি, পরে আবার আসছি।

বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল ওখান থেকে।

অন্ধকারের বেড়াজালে পৃথিবী অনেক আগেই ধরা পড়েছে। সন্ধ্যা তখন সাড়ে সাতটা। সারাটা দিন সম্পূর্ণ নীরবেই কাটিয়ে দিয়েছে বাসব। থমথমে মুখভাব নিয়ে ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে কাটিয়েছে। একটা দুর্বোধ্য চিন্তা যেন তাকে কুরে কুরে খেয়ে চলেছে।

শৈবালও বাড়ি ফেরে নি আজ। সারাটা দুপুর বাসবের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন পেসেন্স খেলে কাটিয়েছে।

বাহাদুর চা দিয়ে গেল একসময়ে। দ্বিতীয়বার।

বাসব সোফায় এসে বসল। চায়ের পেয়ালায় একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বলল, তোমার কি মনে হয় ডাক্তার, কেসটা খুবই জটিল?

তাসগুলো প্যাকেটে ভরতে ভরতে শৈবাল বলল, খুব সরল বলেও তো মনে হচ্ছে না।

—রাইট। কিন্তু—। আচ্ছা, মৃতা অপর্ণা সামন্ত কি ধরনের মহিলা ছিলেন। মানে…ধরন বলতে আমি স্বভাব-চরিত্রের কথাই বলতে চাইছি।

—বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়েরা যেমন হয়, ঠিক সেই ধরনের। আদুরে, স্বেচ্ছাচারি, বেপরোয়া—

—স্বেচ্ছাচারি—? তাহলে একথা আন্দাজ করা নিশ্চয়ই খুব অন্যায় হবে না, কুমারী জীবনে অপর্ণাদেবী কারুর সঙ্গে একটু ইয়েতে···পড়েছিলেন—।

চায়ের পেয়ালায় শৈবাল শেষবারের মত চুমুক দিয়ে বলল, ইয়ে···অর্থাৎ কিন্তু কার সঙ্গে?

বাসব নির্বিকার কণ্ঠে বলল, কেন, গৌর বসাক।

—গৌর বসাক! মানে অশোকবাবুর বন্ধু—

—ঠিক তাই ডাক্তার। বন্ধুর বোনের সঙ্গেই সাধারণত ইয়েটা একটু ভালমত জমে। ভগবান বন্ধুর বোনেদের বোধহয় এই জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন। তাছাড়া দেখছ না, অপর্ণাদেবীর উইলে গৌর বসাকের নামে এতগুলো টাকা।

—কেন?

কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করেই বাসব সোফা থেকে উঠে পড়ল। হোয়াট-নটের দিকে এগিয়ে গেল।

হোয়াট-নটের মাথার উপরেই সিগারেটের টিন। টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ও আবার বলল, আশা করি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গৌর বসাক এখানে এসে পড়বেন। আমি একসময়ে বিনয়বাবুকে বলে এসেছিলাম তাঁকে সন্ধ্যার পর এখানে পাঠিয়ে দিতে।

আবার দুজনেই নীরব।

শুধু ওয়াল ক্লকটার একটানা টিক্‌টিক্ শব্দ নীরবতাকে বার বার ভাঙবার চেষ্টা করছে।

এক সময়ে আবার বাসবই নীরবতা ভঙ্গ করল, অপর্ণাদেবীর ঘরখানা নিশ্চয়ই তুমি বেশ ভাল করেই দেখেছ?

—তা দেখেছি বৈকি।

—কিছু অস্বাভাবিক চোখে পড়েছে?

চিন্তিত কণ্ঠে শৈবাল বলল, অস্বাভাবিক! কই, না তো!

—ঘরের জানালাগুলো দেখেছিলে কত নিচু-নিচু। যেমন এই ঘরের জানালাগুলোর কথাই ধরা যাক। আমরা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কতখানি দেহের অংশ বাইরে থেকে দেখা যাবে?

—কোমর থেকে ওপরের ভাগ।

—পারফেক্টলি রাইট। কিন্তু অপর্ণাদেবীর ঘরের জানালাগুলোর সামনে আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি, সেগুলি অত্যন্ত নিচু ধরনের। জানালার সামনে দাঁড়ালে উরু অবধি ঢাকা পড়ে মাত্র। তাই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে খুনীকে খুব বেশী অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

—তুমি বলতে চাও হত্যাকারীর সুবিধার জন্যেই জানালাগুলো আগে থেকেই এত নিচু করে তৈরি করানো হয়েছিল ?

—না আমি বলতে চাই, বাড়ির সমস্ত জানালাগুলোই সম্ভবত ওই ধরনের, হত্যাকারী তারই সুযোগ নিয়েছিল মাত্র।

এই সময়ে বাহাদুর এসে দাঁড়াল। একজন অতিথির আগমনের কথা ঘোষণা করল ও।

বাসব ইসারায় আগন্তুককে এখানে নিয়ে আসবার নির্দেশ দিল।

মিনিট খানেক পরেই গৌর বসাক দেখা দিলেন।

সুপুরুষ না হলেও বেশ দর্শনীয় চেহারা ভদ্রলোকের। হাসি মুখে প্রথমেই হাত তুলে নমস্কার করলেন ভদ্রলোক।

প্রতি নমস্কারের পর বাসব তাঁকে বসতে অনুরোধ করল।

একটা সোফায় বসতে বসতে গৌর বসাক বললেন, কাকাবাবুর···অর্থাৎ মিস্টার রক্ষিতের মুখে শুনলাম আপনি নাকি আমায় ডেকেছেন ?

—আপনি ঠিকই শুনেছেন মিস্টার বসাক। অপর্ণাদেবী হত হওয়া সম্বন্ধে আপনাকে গোটা কতক কথা জিজ্ঞেস করব।—হ্যাভ ইট ?

বাসব সিগারেট-কেসটা এগিয়ে দিল।

কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বসাক বললেন, থ্যাঙ্কস্। বলুন ?

—আপনি রক্ষিত-পরিবারে কতদিন ধরে ঘনিষ্ঠ আছেন গৌরবাবু ?

—ছোটবেলা থেকেই। বছর আঠেরো হবে।

—অপর্ণাদেবীর সঙ্গে তাহলে বেশ ভালভাবেই আলাপ ছিল আপনার ?

সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে গৌর বসাক বললেন, স্বাভাবিক।

—কিছু মনে করবেন না মিস্টার বসাক, বিশেষ ধরনের একটা প্রশ্ন করছি। আপনি অপর্ণাদেবীকে ভালবাসতেন ?

—এ প্রশ্নের উত্তর কি আমায় দিতেই হবে ?

—নাও দিতে পারেন। তবে দিলে ভাল হয়।

একটু চুপ করে থেকে গৌর বসাক বললেন, ভালবাসা বলতে আপনি

কি বলতে চাইছেন, তা অবশ্য আমি জানি না। তবে ওকে আমার ভাল লাগত।

—আপনি অশোকবাবুর বন্ধু। বিনয়বাবুও আপনাকে কম স্নেহ করেন না, তবু আপনাদের বিয়ে হল না কেন?

—হয়তো হত, কিন্তু মাঝ থেকে সুবীর এসে পড়ায়···

—বলাই বাহুল্য, আপনি সুবীরবাবুকে ভাল চোখে দেখতেন না এই কারণে—?

নীরব রইলেন গৌর বসাক।

—সুবীরবাবুর অপর্ণাদেবীকে খুন করে কোন লাভ নেই, নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পেরেছেন। আর কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?

—কাকে হবে বলুন?

—ধরুন, এমনও তো হতে পারে, গুরুতর মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্থা অপর্ণাদেবী সুবীরবাবুকে বিপদে ফেলবার জন্যে ইচ্ছাকৃত ভাবেই ওপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন। এমন হতে পারে না?

—পারে। তবে এরকম হয়নি।

বাসব গলা নামিয়ে বলল, আপনি কি করে একথা বলছেন?

ইতস্তত করলেন গৌর বসাক। তারপর বললেন, অপর্ণা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। চলা-ফেরা করা ওর পক্ষে দুষ্কর ব্যাপার ছিল। স্বেচ্ছায় ও জানালার কাছে যেতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

—আপনি কিন্তু আপনার ধারণার কথা কোর্টকে কিছু বলেন নি মিস্টার বসাক?

—না। আমাকে সেখানে যা প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমি তারই উত্তর দিয়েছিলাম মাত্র।

বাসব নীরব রইল খানিকক্ষণ? তারপর প্রশ্ন করল, অপর্ণাদেবীর দেওয়া টাকাটা দিয়ে কি করবার পরিকল্পনা আছে আপনার?

—কিচ্ছু না। ব্যবসায় টাকা খাটাবার মত বুদ্ধি আমার নেই।

—ধন্যবাদ গৌরবাবু, আপনি আমায় অনেক সাহায্য করেছেন। আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই আমার। বসুন, চা এল বলে—।

গৌর বসাক উঠে দাঁড়ালেন।···না, না, তার প্রয়োজন নেই। চায়ে আমি তেমন তৃপ্তি পাই না। আচ্ছা—নমস্কার।

রাস্তা অবধি গৌর বসাককে এগিয়ে দিতে এল বাসব আর শৈবাল। একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে ইসারা করতেই এগিয়ে এল। ট্যাক্সির দরজা খুলে গৌরবাবু ভেতরে গিয়ে বসলেন।

বাসব কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলল, ক্ষমা করবেন, আর একটা কথা জানবার ছিল— আপনি দুর্ঘটনার দিন রাত্রে নিজের বাড়িতে ছিলেন না খোঁজ পেয়েছি—কোথায় ছিলেন?

দৃঢ় কণ্ঠে মিঃ বসাক বললেন, আপনি ভুল খবর পেয়েছেন। আমি বাড়িতেই ছিলাম।

ট্যাক্সি গতি নিয়েছে ততক্ষণে। ট্যাক্সিখানা চোখের আড়ালে অদৃশ্য হবার পর শৈবাল বলল, তুমি কি করে খোঁজ পেলে গৌরবাবু দুর্ঘটনার দিন বাড়ি ছিলেন না?

বাসব মৃদু হাসল, কি করে আবার। আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়লাম।

পরের দিন সারাটা দুপুর বাসব কোথায় ডুব মেরে রইল। গলদঘর্ম অবস্থায় ফিরে এল সন্ধ্যার পর। শৈবাল তারই অপেক্ষায় ঘণ্টাখানেক ধরে বসে আছে।

বাসব এসেই গলা ছাড়ল, বাহাদুর, এক গেলাস জল।

বাহাদুর জল নিয়ে আসতেই এক চুমুকে গেলাস শেষ করে ও সোফায় চোখ বুজে আড় হয়ে বসল।

শৈবাল বলল, কি হে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—প্রথমে এক সেক্রেটারিকে নিধন করেই এক নারী-বাহিনীর মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম।

হেঁয়ালি সরল কর বৎস। কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, প্রথমে বিনয়বাবুর সেক্রেটারির ওখানে গিয়েছিলাম। অধীর রায়। বেশ ঘোরেল ভদ্রলোক। প্রথমে কোন কথারই ঠিক উত্তর দেয় না। তারপর বহু কায়দায় আসল কথার সন্ধান পাওয়া গেল। দুর্ঘটনার দিন নাকি তাঁর মোটেই শরীর খারাপ হয়নি। অশোকবাবুই তাঁকে ব্যক্তিগত কাজে কলকাতার বাইরে পাঠিয়েছিলেন।

—তবে বিনয়বাবু যে বললেন তাঁর সেক্রেটারি অসুস্থ ছিলেন।

—কারণ অশোকবাবু সেই কথাই অধীর রায়কে বলতে বলেছিলেন। এই মিথ্যাচারে অধীরবাবুর আটকায় নি। কারণ অর্থের বিনিময়ে মাঝে মাঝেই তিনি অসুখের অজুহাতে ডুব মারতেন অশোকবাবুর ব্যক্তিগত কাজ করবার জন্য।

—তাহলে ব্যাপারটা ক্রমেই ঘোরাল হয়ে উঠছে ?

হুঁ। এখন দেখতে হবে অশোক রক্ষিতের ব্যক্তিগত কাজটা কি। যাই হোক —অধীর রায়ের বাড়ি থেকে সোজা চলে এলাম গোল্ড মেমোরিয়াল স্কুলের টিচার্স হোস্টেলে। সুপর্ণাদেবীর আস্তানা। বুঝতেই পারছ নারীদের রাজত্ব। ওই নারীকুলের মধ্যে পড়ে বেশ কিছুটা নাস্তানাবুদ হবার পর সুপর্ণাদেবীর সন্ধান পাওয়া গেল। ভদ্রমহিলা এখনও বিমর্ষ ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। নতুন করে কোন কথাই তাঁর কাছে পাওয়া গেল না। তিনি এভাবে সুবীরবাবুকে নিজের করে পেতে চান নি।

—সুপর্ণাদেবীর সঙ্গে সুবীর সামন্তের এবার বিয়েটা হয়ে যাবে, তোমার কি মনে হয় ?

—নিশ্চয়ই। খুব স্বাভাবিক। চল, ওঠা যাক।

—আবার কোথায় ?

—বিনয়বাবুর বাড়িতে। অপর্ণাদেবীর ঘরখানা আমায় আরেকবার দেখতে হবে।

দুজনেই উঠে পড়ল।

বিনয়বাবুর বাড়িতে ওরা যখন পৌছল, তখন রাত আটটা। ম্রিয়মান মুখে বিনয়বাবু পার্লারে বসেছিলেন। ওদের দেখেই মৃদু কণ্ঠে স্বাগত জানালেন।

বাসব তাঁকে নিজের আগমনের উদ্দেশ্য জানাতেই তিনি তাদের ওপরে নিয়ে চললেন।

ঘরখানা যদিও এখনও পুলিশের অধীনে, তবে বাসবের অনুরোধে ঘরের একটা চাবি বিনয়বাবুর কাছে সরকার পক্ষ থেকে রাখা হয়েছে। চাবি খুলে দিতেই বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের মধ্যে এল। মর্মন্তুদ ঘটনার নীরব সাক্ষী ঘরখানা যেন হাঁ করে গিলতে এল ওদের।

বিনয়বাবু ঘরের মধ্যে এলেন না।

বাসব প্রথমেই খাটের দিকে এগিয়ে গেল। তোসকটা উল্টে-পাল্টে দেখল। কিছু নেই।

খাটের পাশেই একটা ছোট বুককেশ। থরে থরে বই সাজানো তাতে। বাসব একের পর এক বইয়ের পাতা উল্টে উল্টে দেখে যেতে লাগল।

কয়েকখানা বইয়ের ভেতর থেকে খান চারেক লেখা কাগজ পাওয়া গেল। বাসব সেগুলো পকেটে রাখল।

এরপর ও এগিয়ে গেল জানালার কাছে।

যে জানালা দিয়ে অপর্ণা সামন্তকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। জানালার ভেতরে ও বাইরে কিছুটা গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করবার পর বাসব একটা কাণ্ড করে বসল।

জানালার উপরে উঠে একহাত দিয়ে পাল্লাটা চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে জানালার বাইরের দিকের একটা হুক পরীক্ষা করতে লাগল।

জানালার বাইরের দিকের উপরকার বিটে হুকটা লাগানো। বাসব আধ-মিনিটটাক হুকটা পরীক্ষা করে নেমে এল। মুখে তার উৎফুল্লতার ভাব।

শৈবাল আশান্বিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কি হে—মনে হচ্ছে যেন কোন জাঁদরেল সূত্র হস্তগত করেছ ?

—অনেকটা। তবে এতে যে সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে ডাক্তার। আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয়··

বাসব আর নিজের কথা শেষ করল না। কথাটা অর্ধ সমাপ্ত রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে দেড়টা আন্দাজ সময়ে শৈবাল হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে এল। বাসব তখন নিজের শোবার ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল।

শৈবাল খাটের উপর গদিয়ান হয়ে বসল বালিশ কোলে করে।

পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে ঘরে।

এক সময়ে পায়চারি থামিয়ে বাসব বলল, কাল বিনয়বাবুর বাড়ি গিয়ে আমাদের ঠকতে হয়নি।

—তা তো কালই বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু কি লাভ করে এলে সেটা তো আগে জানা দরকার ?

—তুমি তো তোমার জীবনে বহু জানালাই দেখেছ, কিন্তু কোথাও কি জানালার বাইরের দিকে হুক আটকানো রয়েছে চোখে পড়েছে ? বিশেষে কয়েক তলার উপরের কোন জানালায়।

—না। তাছাড়া ওখানে আটকে তো কোন লাভ নেই।

—তাহলেই বোঝ। অথচ হুকটা লাগানো রয়েছে। কেন—তোমার কি মনে হয় ডাক্তার ?

—আমার ? আমার মনে হয়···

—তাছাড়া, এই চিঠিটা।—এতেও একটা বড় রকম সূত্র পাওয়া গেছে।

—চিঠি!

—তোমার স্মরণ শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে ডাক্তার। কাল অপর্ণাদেবীর ঘরে কতকগুলো বইয়ের মধ্যে খান কয়েক কাগজ পাই, এই চিঠিখানা তারই অন্যতম।

বাসব চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরল।

শৈবাল খুলে পড়ল সেখানা। টাইপ করা ইংরাজী চিঠি।

সোমবার

অপর্ণাদেবী,

এর আগে আপনার স্বামী সম্বন্ধে যা-যা লিখেছি ক্রমেই তা বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। তিনি সুপর্ণাদেবীর প্রতি যে ক্রমেই গভীর অনুরাগী হয়ে পড়েছেন তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। উপস্থিত আপনার অসুস্থতায় এঁরা স্বাধীনতার চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছেন।

আমি জানতে পেরেছি—আজই রাত্রে সুবীরবাবু সুপর্ণাদেবীর সঙ্গে এই বাড়িতে মিলিত হবেন। আপনি যদি চাক্ষুষ দেখতে চান—তাহলে রাত পৌনে বারটার পর উঠানের দিকের মাঝের জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াবেন, দেখতে পাবেন বাগানের মধ্যে ওঁদের।

শুভেচ্ছার পর—

চিঠির তলায় কোন স্বাক্ষর নেই।

—চিঠিখানা পড়ে কি বুঝলে?

চিন্তিত কণ্ঠে শৈবাল বলল, প্রথমতঃ চিঠিখানায় একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটে রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, চিঠির ধরন দেখে মনে হয়, পত্রপ্রেরক আরো কয়েক বারই অপর্ণাদেবীকে এর আগে চিঠি দিয়েছে।

—ইস্‌প্লেনডিড্‌ ডাক্তার। একজ্যাক্টলি টো টো।—গৌরবাবুর কথায় আমরা জানতে পেরেছি, অপর্ণাদেবীর খাট থেকে ওঠার তেমন ক্ষমতা ছিল না, তবু তাঁকে জানালার ধারে যেতে হয়েছিল কোন ক্রমে এই চিঠিটার কয়েক লাইনের দরুন। হিংসাপরায়ণ, মনোবল শূন্য, অধৈর্য অপর্ণা সামন্ত যে এই চিঠিখানা পেলেই সময় মত জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াবে এবিষয়ে হত্যাকারী নিশ্চিত ছিল।

—আচ্ছা, তুমি বুঝলে কি করে ওই বইগুলোর মধ্যেই চিঠিখানা পাওয়া যাবে?

—প্রথম থেকেই আমার ধারণা হয়েছিল অপর্ণাদেবী অসুস্থ শরীর নিয়ে কখনই

জানালার কাছে নিজে থেকে যান নি, তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। কি করে? দুটো কারণে—এক, কেউ তাঁকে কিছু বলেছিল। দুই, তিনি ও সম্বন্ধে কোন চিঠি পেয়েছিলেন। তাই কাল আমি তোসক উল্টে বই হাতড়ে দেখেছিলাম কোন কিছু পাওয়া যায় কিনা।

—চিঠিখানা কে লিখেছে বলে তোমার মনে হয়?

—সে পরের কথা। তবে যেই লিখুক তার সাবধানতার অন্ত নেই। তবু এ থেকে বেশ কয়েকটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। যেমন, প্রথম ধর, যে মেশিনে টাইপ করা হয়েছে চিঠিখানা, তার টেপটা বেশ পুরানো হয়ে এসেছে। দ্বিতীয়, চিঠির কাগজখানা অত্যন্ত দামী। সাধারণ লোক এ কাগজ ব্যবহার করতে পারে না। তৃতীয়, কাগজের মাথাটা উপর থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ওটা প্যাডের কাগজ ছিল। নাম ঠিকানাটা উপর থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

—কিন্তু আমরা আগেই আন্দাজ করেছি অপর্ণাদেবী এখানা ছাড়াও আরো কয়েকখানা চিঠি পেয়েছিলেন। সেগুলো কোথায়?

বাসব চিন্তিত কণ্ঠে বলল, আমার মনে হয়, যে এই ধরনের চিঠিগুলো দিত, সে সময় মত অপর্ণাদেবীর অজান্তে আবার ওগুলো সরিয়ে ফেলত। কিন্তু এখানার বেলায় তা হয়নি, কারণ খুন হওয়ার পর থেকেই ঘরখানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

বাসব আবার পায়চারি আরম্ভ করল।

কয়েক মিনিট আবার নিরবতা। তারপর—

—দেখ ডাক্তার, বাসব বলল, আজ রাত্রে আমাদের আরেকবার রক্ষিত বাড়িতে যেতে হবে।

—রক্ষিত বাড়িতে! আবার কেন?

—তবে এবার যাওয়ার মধ্যে বেশ একটু বৈচিত্র্য থাকবে। সকলের অজান্তেই আমরা ও বাড়িতে ঢুকে পড়ব।

এই সময়ে বাইরে কলিং বেল বেজে উঠল।

—সুবীরবাবু এসেছেন। তাঁকে আমি টেলিফোনে অ্যাপয়েন্ট করেছিলাম এখানে আসবার জন্য।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বাহাদুরের সঙ্গে সুবীর সামন্ত ঘরে প্রবেশ করল। সারা চেহারার উপর একটা ম্রিয়মান ভাব। বাসবের অনুরোধে একটা চেয়ারে বসল সুবীর।

—আপনাকে এই ভাবে এখানে ডেকে আনার জন্য আমি দুঃখিত মিস্টার সামন্ত। তবে—

বাসবের কথা শেষ হবার আগেই সুবীর বলল, আপনার কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই, মিস্টার ব্যানার্জি। আপনি স্বচ্ছন্দে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন।

—ধন্যবাদ। আপনি পুলিশ বা কোর্টে যে সব কথা বলেছেন, তা নিয়ে আমি আর আলোচনা করতে চাই না। আমার গোটাকতক অন্য ধরনের প্রশ্ন আছে।—আপনার স্ত্রীকে দেখাশুনা করবার জন্যে কোন নার্স ছিল?

—ছিল। তবে অপর্ণা মারা যাওয়ার কয়েক দিন আগেই তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

—কেন?

—কারণ ওর শরীর ভালর দিকে যাচ্ছিল। তাছাড়া অপর্ণাই বলেছিল ওর আর নার্সের প্রয়োজন নেই।

—নার্সটির ঠিকানা আমায় দিতে পারেন?

—ঠিকানা? অশোক আপনাকে তার ঠিকানা বলতে পারবে। ওই এসবের ব্যবস্থা করেছিল। তবে আমি আপনাকে তার নাম আর তার কর্মস্থল বলতে পারি।

—বেশ তো, তাতেও আমার কাজ হতে পারে বলুন?

—নার্সটির নাম, অরুণা সেন। নীলরতন সরকারের স্টাফ নার্স।

—আচ্ছা, মিস্টার সামন্ত, আপনার স্ত্রীকে হত্যা করার ব্যাপারে আপনার বদ্ধমূল ধারণাটা কি?

—ধারণা? আমি কি বলব মিস্টার ব্যানার্জি, আমি কাউকেই ঠিক সন্দেহ করতে পারছি না। আবার অনেককেই সন্দেহ হচ্ছে।

বাসব সিগারেট কেসটা বাড়িয়ে দিল, সিগারেট প্লিজ—

—নো, থ্যাঙ্কস।

—বাসব কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরাল। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আপনার স্ত্রী উইল করেছেন একথা আপনি জানতে পারলেন কবে?

—তার মারা যাওয়ার পর এটর্নীর কাছ থেকে চিঠি এসেছিল প্রবেটের জন্যে, তাতেই বুঝতে পারলাম।

—উইল তাহলে আপনার সম্পূর্ণ অজান্তেই হয়েছিল। সম্ভবতঃ অপর্ণাদেবী অসুস্থ হয়ে বাপের বাড়ি যাওয়ার পরই উইল করেছিলেন।

—আমারও তাই ধারণা।

—হুঁ। আপনি জানতেন গৌর বসাকের সঙ্গে অপর্ণাদেবীর বিয়ে হবার কথা ছিল?

—বিয়ের পর শুনেছিলাম।

—ওয়েল সুবীরবাবু, গৌর বসাক কি কোন কালে ভাল স্পোর্টস্‌ম্যান ছিলেন?

সুবীর অবাক দৃষ্টিতে বাসবের দিকে তাকাল, তারপর বলল, যতদূর জানি, না।

—আপনি?

—আমি চিরকালই খেলাধূলার ব্যাপারে উৎসাহী। এখনও কলেজের গেম-সেক্‌সানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি।

বাসব আর কোন প্রশ্ন করল না।

বাহাদুরকে ডেকে তিন কাপ কফি আনবার নির্দেশ দিল শুধু।

শৈবাল বহুক্ষণ ধরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে রেলিঙ দেওয়া বারান্দার একধারে। বেশ অন্ধকার জায়গাটা। চট করে তার সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম কারুর পক্ষে।

রাত তখন একটা পঁয়ত্রিশ।

অন্ধকারের মধ্যে আবছা আবছা ভাবে রক্ষিতদের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। বাসব শৈবালকে এখানে দাঁড়াবার নির্দেশ দিয়ে সেই যে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে, এখনো তার পাত্তা নেই।

সময় কেটে চলেছে।

শৈবাল এক সময়ে রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল। রেডিয়ামের আভায় চক্‌চক্‌ করছে ঘড়ির ডায়েলটা। দুটো কাঁটাই তিনটের ওপর এসে একত্রিত হয়েছে।

তিনটে পনেরো।

শৈবাল উদ্‌বিগ্নতার চরমে এসে পৌঁছেছে। বাসবের কি কোন বিপদ হল? কিন্তু কি ধরনের বিপদ হতে পারে তার? কই, কোন গোলমাল বাড়ির মধ্যে থেকে শোনা যাচ্ছে না তো—।

কিন্তু সমস্ত চিন্তার অবসান হল এই সময়ে, বাসবকে দ্রুতপদে অন্ধকারের মধ্যে আসতে দেখা গেল।

চাপা গলায় শৈবাল প্রশ্ন করল, এত দেরি হল?

—দেরি হবে না, কি বলছ! একটা তালা দেওয়া ঘরে প্রথমে বহু কষ্টে ঢুকতে হল, তারপর ঘরে ঢুকে ফিঙ্গার-প্রিণ্ট নিতে হল।

কথা কটা বলেই বাসব নিজের হস্তস্থিত ফিঙ্গার-প্রিণ্ট তোলার সরঞ্জাম সমেত এটাচিটা তুলে ধরল।

—ফিঙ্গার-প্রিণ্ট! কার—?

—আর কথা নয়, এবার চল ডাক্তার। বিটের পুলিশের চোখে যদি পড়ে যাই, তাহলে বাকি রাতটুকু হাজতে কাটানো ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না।

পরের দিনটা বাসবকে আর চোখে দেখা গেল না। শৈবাল কয়েকবার এসেও ওর সঙ্গে দেখা করতে পারল না।

বাসবের এই ব্যস্ততায় শৈবালের বুঝতে বিলম্ব হয় না, তদন্ত শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। যবনিকা পড়তে আর বিশেষ দেরি নেই।

সকাল হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। বাসব বিছানায় উঠে বসল। কাল অত্যন্ত বেশী ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে, তাই ঘুমটাও হয়েছে জবররকম!

বাসব বিছানা থেকে নেমে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চাপাল। টেলিফোনের র‍্যাকের কাছে এগিয়ে গেল তারপর।

রিসিভারটা তুলে নিল—একটা নম্বর ডায়েল করল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তারের অপর প্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেল—হ্যালো!

—কে, ডাক্তার? কি করছ এখন?···কিছুই করছ না···কি বললে··· বৌয়ের শাড়ি কুঁচিয়ে দিচ্ছ···দিচ্ছ না···আমার তাহলে শুনতে ভুল হয়েছে··· চলে এস না একবার তাহলে···আসছ···ছেড়ে দিলাম—বাই বাই—

আধ ঘণ্টার মধ্যেই শৈবাল এসে উপস্থিত হল।

একটা সোফায় বসতে বসতে বলল, খুব খুশি-খুশি দেখাচ্ছে, হেরাহেরি করে এনেছ বোধহয়?

—প্রায়। মনে হয় আজই এ-রহস্যের ওপর পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিতে পারব। চল, ওঠা যাক। বেরুতে হবে।

—কোথায়?

—ভাবছি আজ সন্ধ্যার পর সকলকেই বিনয়বাবুর বাড়িতে উপস্থিত হতে বলব।

—কিন্তু হত্যাকারী কে?

বাসব মৃদু হেসে বলল, কেউ তো একজন বটেই। ব্যস্ততার কিছু নেই। আজই তুমি জানতে পারবে। চল—

রাস্তায় নেমে ওরা একটা ট্যাক্সি করল।

কাছেই এলগিন রোড।

কাজেই প্রথমে সুবীরের বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দিল ট্যাক্সি-চালককে বাসব।

সুবীরকে বাড়িতেই পাওয়া গেল।

ওদের মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করল ও।

একথা-সেকথার পর সুবীর প্রশ্ন করল, আপনার কাজ কতদূর এগুলো?

—কাজের প্রায় শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছি।

—আপনি জানেন কে খুন করেছে?

—নিশ্চয়ই। আমি তাকে কোনদিনই ধরতে পারতাম না। শুধু একটা ছোট্ট ভুলের দরুন সে আমার চোখে ধরা পড়ে গেছে। তবু আমি তার কর্ম-পন্থার প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না।

শৈবাল উৎসুক দৃষ্টিতে বাসবের দিকে তাকাল।

সুবীর দ্রুত কণ্ঠে বলল, কে—কে আমার স্ত্রীকে হত্যা করেছে মিস্টার ব্যানার্জি?

—আপনি তার নাম শুনলে মোটেই খুশি হতে পারবেন না সুবীরবাবু।

—তবু আমি জানতে চাই প্রকৃত হত্যাকারী কে?

বাসব এক সেকেণ্ড চুপ থাকার পর সহজ কণ্ঠে বলল, আপনি।

—কি—কি বললেন?

—আপনি—আপনিই আপনার স্ত্রী অপর্ণাদেবীকে হত্যা করেছেন।

ঘরের মধ্যে মৃতা অপর্ণা সামন্ত স্বয়ং এসে দাঁড়ালেও হয়তো শৈবাল এতটা আশ্চর্য হত না, বাসবের কথায় যতটা হল।

সুবীর উঠে দাঁড়িয়েছে। শরীরের সমস্ত রক্ত মুখে নেমে এসেছে। তীব্র কণ্ঠে ও বলল, কি বলছেন আপনি! জানেন, এ কথার অর্থ কত সুদূরপ্রসারি হতে পারে।

—জানি। সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই কথাটা বলেছি। আপনি আইনকে ফাঁকি দিতে পারেন, সেই সঙ্গে আদালতকেও। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। আপনি কি ভাবে জানালার ওপরকার হুকে ল্যামো লাগিয়ে নিচে থেকেই অপর্ণাদেবীকে উঠোনে এনে ফেলেছিলেন, তা আমার অজানা নয়। হুকের কাছে-পিঠে যে আঙুলের ছাপ আমি পেয়েছি, তার সঙ্গে আপনি গত পরশুদিন আমার বাড়িতে কফির পেয়ালার ওপর যে ছাপ ছেড়ে এসেছেন, তার হুবহু মিল রয়েছে। এইটুকু প্রমাণই অবশ্য আপনাকে শাস্তি দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আরো আছে, আপনি অপর্ণাদেবীকে যে শেষ উড়ো চিঠিখানা দিয়েছিলেন, তার কাগজটা হল আপনাদের কলেজের ডিপার্টমেণ্ট অফ হিস্ট্রির লেটার প্যাড থেকে ছেঁড়া। শুধু ওপরকার পরিচয় লিপিটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল। আমি আপনাদের কলেজ থেকে তারও নমুনা সংগ্রহ করেছি। এরপরও প্রমাণ আছে কয়েকটা আমার হাতে সেগুলোও শুনতে চান যদি বলতে পারি—তবে কিছু সময় নেবে।

সুবীর উঠে দাঁড়াল।

পায়ে পায়ে এগিয়ে বাগানের দিকের খোলা জানালাটার সামনে গিয়ে দাড়াল।

সারা ঘরে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে।

ঘুরে দাঁড়াল সুবীর।

ওর সরল দীর্ঘ দেহটা ঝুঁকে পড়েছে। সুন্দর মুখের ওপর একটা ক্লান্ত ভাব যেন।

ও দ্রুত কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, আমি—আমিই তাকে মেরেছি। কিন্তু কেন··· কেন তাকে মেরেছি জানেন···? আমার জীবনটাকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল, প্রতি পদক্ষেপে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গুঁড়িয়ে দেওয়াতেই ছিল তার আনন্দ···আমি পারি নি···আমি আর সহ্য করতে পারি নি বাসববাবু···তাই··· আমার মনে হয় আপনিও আমার জায়গায় থাকলে ঠিক এই কাজই করতেন।

সুবীর থামল।

বাসব এগিয়ে গেল ওর কাছে।

নরম কণ্ঠে বলল, আমি জানি, আপনি ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে এই কাজ করেছেন, তবু আইনকে আপনি নিজের হাতে নিতে পারেন না।—চল, ডাক্তার।

বাসব আর একটি কথাও না বলে শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

রাস্তায় নেমেই শৈবাল বলল, কি হে, এইভাবে চলে এলে যে?

—আশ্চর্য হচ্ছো, না? কিন্তু তোমার কথার উত্তর দেওয়ার আগে আমায় একটা ছোট্ট কাজ সেরে আসতে হবে।

বাসব কথা কটা বলেই রাস্তার উলটো দিকের একটি ওষুধের দোকানের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

বেরিয়ে এল মিনিট সাতেক পরেই।

ট্যাক্সি ডাকল তারপর।

হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের দিকেই দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে ট্যাক্সিখানা।

শৈবাল নিজের প্রশ্নটা আবার পুনরুক্তি করল, তুমি সুবীরবাবুকে ছেড়ে চলে এলে?

—হ্যাঁ, তাকে বাঁচবার একটা সুযোগ দিলাম।

—তার মানে?

—খুব সরল। আইনকে তিনি নিজের হাতে নিয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু কেন নিয়েছিলেন? নিজে নির্মল চরিত্র না হয়েও পদে পদে স্বামীর জীবনটা অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন অপর্ণাদেবী। সহ্যের একটা সীমা আছে—উনি ঠিকই বলেছেন, এরকম পরিবেশে পড়লে আমি, তুমি যে কেউ এই কাজটা করে বসতাম হয়তো। সব অপরাধই সব সময়ে অপরাধের মাপকাঠিতে একই শ্রেণীর হয় না ডাক্তার। তাই আমি সুবীরবাবুকে সুস্থ মন নিয়ে বাঁচার একটা অবকাশ দিলাম। সুপর্ণাদেবীকে বিয়ে করে তিনি সুখী হোন।

—বিনয়বাবুকে কি উত্তর দেবে?

—পরিষ্কার জানিয়ে দেব। আমার পক্ষে কেসটা হোল্ড করা আর সম্ভব হচ্ছে না।

—কিন্তু তুমি হঠাৎ ওই ডাক্তারখানায় গিয়ে ঢুকলে কেন?

—সুবীরবাবু হয়তো এখুনি পুলিশের কাছে গিয়ে সারেণ্ডার করতে পারেন, তাই ফোন করে জানিয়ে দিলাম আমার মনোভাব।

পরের দিন মধ্যাহ্ন-আহারের আমন্ত্রণ ছিল শৈবালের বাড়িতে বাসবের।

বেশ রেঁধেছে সোমা। পরিপাটি করে পেট ভরে আহার শেষ করেছে বাসব আর শৈবাল।

খাওয়ার পর পান চিবোতে চিবোতে বাসব বলল, যাই বল ডাক্তার, বাঙালি মেয়েদের রান্নার ব্যাপারে একটা বেশ ঐতিহ্য আছে।

—তা আছে। তবে ক্রমেই সে ঐতিহ্যে ভাঁটা পড়ছে। আজকাল মেয়েরা রান্না ঘরের দিকে বড় একটা যেতে চান না। অবশ্য আমার বৌয়ের কথা আলাদা। আহা, রান্না তো নয়, যেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা ··

শৈবালের কথা আর শেষ হল না, ঝঙ্কার দিয়ে উঠল সোমা, থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।

বাসব জোরে হেসে উঠল।

খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প-গুজোব চলেছে তিনজনের মধ্যে। শৈবাল এক সময়ে বলল, বাজে কথা থাক, অপর্ণা-হত্যার উপসংহারটা এবার শোনাও দেখি। কি করে তুমি সুবীর সামন্তকে সন্দেহ করলে। তুমি বলছিলে একটা ছোট ভুলের জন্যে ও তোমার চোখে ধরা পড়ে গেছে সেটা কি?

সোমা এ-হত্যার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শৈবালের কাছে সমস্ত কিছু শুনেছিল, কাজেই উপসংহারটা জানবার আগ্রহ তারও কিছু কম নয়। ও উৎসুক দৃষ্টিতে বাসবের দিকে তাকাল।

বাসব টেবিলের ওপর রক্ষিত প্লেট থেকে একটা পান তুলে নিয়ে মুখে পুরল। তারপর কিছুক্ষণ চিবোবার পর বলল, ঠিক প্রথমেই সুবীরবাবুকে আমার সন্দেহ হয়নি, সন্দেহটা ঘুরপাক খাচ্ছিল গৌর বসাককে নিয়ে। কারণ কুমারী জীবনে অপর্ণাদেবী তাঁর প্রণয়প্রার্থী ছিলেন। বিয়ের পরও তাঁদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল না, একথাই বা জোর দিয়ে বলা যায় কি করে। তবে গৌর বসাক অপর্ণাদেবীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করেছিলেন হয়তো টাকার জন্যেই। উইলে এতগুলো টাকা পাবার পর—যাতে আবার অপর্ণা উইল পালটাতে না পারেন, তার জন্যে গৌরবাবু তাঁকে হত্যা করেছেন। আমি ভাবতে লাগলাম। অশোক রক্ষিত, হরিশঙ্কর পাল, এমন কি বিনয়বাবুকেই কি সন্দেহের হাত থেকে বাদ দেওয়া যায়? কেন তিনি সুবীরবাবুকে দুর্ঘটনার দিন লাইব্রেরি ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এটা ইচ্ছাকৃত না—বাই দি বাই—আমি চিন্তার মোড় ঘোরালাম। কে হত্যা

করেছে তা জানবার আগে কি ভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, তা জানা দরকার। অপর্ণাদেবী অসুস্থা ছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি ইচ্ছে করে এত রাত্রে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ান নি। তাঁকে কোনক্রমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কি ভাবে? কি ভাবে তা তুমি জানো ডাক্তার। তাঁর হিংস্রুক মনের ওপর চিঠি দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। তিনি সময় মত জানালার ধারে না গিয়ে থাকতে পারেন নি।

—কিন্তু—শৈবাল বলল, কিন্তু ওধারে তিনখানা জানালা ছিল। অপর্ণাদেবী মাঝেরখানার সামনে না দাঁড়িয়ে অন্য যে কোন একটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারতেন, তা না দাঁড়িয়ে মাঝের জানালার সামনেই বা দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন?

—কারণ চিঠিতে মাঝের জানালার কথাই লেখা ছিল। অপর্ণাদেবীর মনের অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, তিনি অন্য কোন বিষয়ে মন দেন নি, চিঠির নির্দেশ মত মাঝের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাঝের জানালার বাইরের দিকে একটা হুক লাগানো রয়েছে দেখেই আমার কেমন খট্‌কা লাগল। আর দুটো জানালায় তো হুক নেই। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম হুকটা লোহার এবং ওপর দিকটা বেশ কিছুটা ফাঁক। যদিও সুবীরবাবু ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিলেন। কারণ তাঁর পক্ষে কোন মতেই খুন করা সম্ভব নয়—তিনি নিচে ছিলেন বরং বলতে হয় তাঁকে নিচে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাছাড়া আমি পরীক্ষা করে দেখেছিলাম, লাইব্রেরি-ঘর থেকে অপর্ণাদেবীর ঘরে যেতে মিনিট তিনেকের ওপর সময় লাগে। কাজেই সুবীরবাবুর পক্ষে এত তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিচে চলে আসাটা সম্ভব নয়। কিন্তু কানাইয়ের স্টেটমেণ্টের একটা কথা আমায় চিন্তিত করে তুলল। কানাই এক জায়গায় বলেছে, ও একটা চিৎকার আর কিছু পড়ার শব্দ শুনে বাইরে থেকে ছুটে এল। এই সময়ে ও জামাইবাবুকে বইপত্তরের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

বাসব থামল। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার আরম্ভ করল, তুমি বলবে এতে সন্দেহের কি থাকতে পারে? পারে। কানাই বাইরের বাগানে ছিল আর সুবীরবাবু বাড়ির ভেতরে ছিলেন। দুর্ঘটনার স্থল তাঁর থেকে কাছে ছিল, তবু তিনি কানাইয়ের আগে সেখানে পৌঁছাতে পারেন নি—কেন? সঙ্গে সঙ্গে আমার হুকটার কথা মনে হল। রহস্যও সরল হয়ে এল ওই সঙ্গে। সুবীরবাবুর কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল দেবেন সেনের এককালে আমি ব্যক্তিগত ছাত্র ছিলাম। আমি তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তাঁর কাছে একটু

খোঁজ-খবর নিতেই জানা গেল, সুবীরবাবু সত্যি সত্যিই একজন প্রথম শ্রেণীর অ্যাথলেট। কসরৎও দেখাতে পারেন। বিশেষে দড়ি নিয়ে অনেক রকমের খেলা তাঁর আয়ত্তে। একবার ছত্রিশগড়ের জঙ্গলে ছাত্রদের নিয়ে এক্সকারসান করতে গিয়ে পনেরো হাত দূরের একটি বন্য শূয়োরকে ল্যাসোর সাহায্যে তিনি ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন। আমি তাঁর কাছ থেকে হিস্ট্রি ডিপার্টমেণ্টের প্যাডের একটা কাগজ চেয়ে নিলাম। হিসেবে ভুল হয়নি আমার, আমার উড়ো চিঠির কাগজের সঙ্গে এই প্যাডের কাগজের হুবহু মিল আছে। আর কাল বিলম্ব না করে আমি অপর্ণাদেবীর ঘরে রাত্রে হানা দিলাম। জানালার বীটের ওপরে হুকের পাশ থেকে ফিঙ্গার-প্রিণ্টটা নেওয়া আমার পক্ষে শক্ত হল না। তারপর সম্পূর্ণ ভাবে সুবীরবাবু আমার চোখের ওপরে ধরা পড়ে গেলেন।

বাসব আবার থামল। নীরবে কয়েক টান দিয়ে সিগারেটটা শেষ করল। অ্যাসট্রের মধ্যে টুকরোটা ফেলে দিতে দিতে আরম্ভ করল আবার, এরপর আমি বিনয়বাবুর সেক্রেটারি এবং নার্স অরুণা সেনের সঙ্গে দেখা করলাম। আরো কিছু অন্ধকার পরিষ্কার হল। প্রকৃত ঘটনাটা আমার চোখের ওপর ক্রমেই রূপ নিতে লাগল। ব্যাপারটা এই ভাবে ঘটেছিল, যদিও এতে অনেকখানি অনুমান আছে, তবুও আমার বিশ্বাস তা ভ্রান্ত নয়। গৌরবাবুর সঙ্গে অপর্ণাদেবীর একটু ইয়ে ছিল, কিন্তু বাপের ইচ্ছায় অপর্ণাদেবীর বিয়ে হল সুবীরবাবুর সঙ্গে। অশোক রক্ষিত আর গৌর বসাক সুপর্ণাদেবীর সঙ্গে সুবীরবাবুর ঘনিষ্ঠতার কথা জানতেন। আমার মনে হয় তাঁদের মধ্যে কেউ প্রথমে অপর্ণাদেবীকে এই কথা জানিয়েছিলেন। এতে ক্রমেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা শোচনীয় হয়ে উঠল এবং অপর্ণাদেবী মেলাঙ্কোলিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। অশোকবাবুর রেসখেলা ইত্যাদির অন্যতম সঙ্গিনী হচ্ছে অরুণা সেন পেশায় যিনি নার্স। তাকে অশোকবাবু নিয়ে এলেন বোনকে দেখাশুনা করতে। অবশ্য প্রকৃত কারণ তা নয়, তাকে আনার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। অশোকবাবুর ক্রমেই প্রচুর টাকার দরকার হয়ে পড়েছিল, তিনি নিজের বোনকেই টারগেট করলেন সুপর্ণাদেবী ও সুবীরবাবুর সম্পর্কটা মূলধন করে। নার্স অরুণা সেন পুলিশের ভয়ে আমার কাছে সমস্ত স্বীকার করেছেন। তাঁকে দিয়ে অশোকবাবু কৌশলে উড়ো চিঠি পাঠাতে আরম্ভ করেন। ক্রমে অপর্ণাদেবীর মন আরো বিষিয়ে উঠল এবং তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হল তাঁর মারা যেতে বিশেষ দেরি নেই। অথচ তিনি মারা গেলে তাঁর বিপুল সম্পত্তি তাঁর স্বামীর করায়ত্বে

আসবে, এ তিনি সহ্য করতে পারলেন না। কাজেই তিনি সুবীর সামন্তকে বঞ্চিত করে এক উইল করলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তা রেজিস্ট্রিও হয়ে গেল। এরপরই অবশ্য অপর্ণাদেবী নিজের মৃত্যুকে নিজেই আমন্ত্রণ জানালেন। সুবীর সামন্ত তাঁকে হত্যা না করলেও তিনি হত হতেন অশোক রক্ষিতের হাতেই।

বাসব নীরব হল। একটু দম নিল যেন। তারপর—স্ত্রীর ব্যবহারে সুবীরবাবু হাজার অতিষ্ঠ হলেও তাকে হত্যা করবার কোন পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে অশোকবাবুর চক্রান্তটা বুঝতে পারলেন। এদিকে স্ত্রীর ব্যবহারও তাঁর প্রতি জঘন্য হয়ে উঠছে। একটা পরিকল্পনা তাঁর মাথায় রূপ নিল। সহ্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এখন যদি অপর্ণাদেবীকে হত্যা করেন, তাহলে প্রথমে পুলিশ তাঁকে সন্দেহ করলেও উইল সংক্রান্ত ব্যাপারের দরুন শেষ পর্যন্ত অশোক রক্ষিত বা গৌর বসাক জালে জড়িয়ে পড়বেনই, এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন সুবীর সামন্ত। প্ল্যান ঠিক হল। কোন একদিন—মনে হয় যখন অপর্ণাদেবী ঘুমিয়ে পড়েছেন, এমন এক সময়ে সুবীরবাবু মাঝের জানালার উলটো দিকে একটা হুক পুঁতে ফেললেন। তারপর অশোকবাবুর ধরনের এক উড়ো চিঠি দিলেন। তিনি জানতেন এই চিঠিতেই কাজ হবে। এরপর এল সেই চরম দিনটি। সুবীরবাবু কোন একটা ছুতো করে নিচে নেমে যেতেনই, কিন্তু ছুতোর প্রয়োজন হল না, ভাগ্যদেবী সদয় হলেন তাঁর প্রতি। বিনয়বাবু তাঁকে টেলিফোনে নিচে ডাকলেন। তাঁর য়্যালিবাই স্ট্রং হল। কানাই তাঁকে লাইব্রেরিতে দেখল, কাজেই তিনি আরো নিরাপদ হলেন। বারোটা বাজার মিনিট কয়েক আগেই সুবীরবাবু উঠোনে এসে দেখলেন অপর্ণাদেবী জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অবশ্য ওপর থেকে নেমে আসার সময়েই তিনি দড়ির ফাঁসটা হুকে লাগিয়ে এসেছিলেন, দড়ির অপর প্রান্তটা উঠোনের দিকে ঝোলানো ছিল। সুবীর সামন্ত দড়ির প্রান্তটা ধীরে ধীরে ঢিল দিতে লাগলেন। ওদিকে অপর্ণাদেবী বাহ্যজ্ঞান-শূন্য অবস্থায় বাগানের দিকে তাকিয়ে আছেন। ফাঁসটা তাঁর গলায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুবীর এক হেঁচকা টান দিলেন—অপর্ণাদেবী নিচের দিকে পড়লেন। দড়িটাও খুলে এল ওই সঙ্গে। সুবীরবাবু দড়িটা সঙ্গে নিয়ে দ্রুতপদে লাইব্রেরি-ঘরের সামনে চলে এলেন। এই সময় কানাই তাঁকে দেখতে পায়।

বাসব থামতেই শৈবাল বলল, দড়িটা তাহলে কোথায় গেল?

—কোথায় আবার যাবে। সিঁড়ি বা লাইব্রেরি ঘরের আশেপাশে পড়েছিল কে তার খোঁজ রেখেছে।

—আচ্ছা, তুমি একবার হরিশঙ্করবাবুকে প্রশ্ন করছিলে না, বাড়িটা কবে হোয়াইট ওয়াশ করানো হয়েছে।

—হ্যাঁ, করেছিলাম তো। অবশ্য অকারণেই। হরিশঙ্করবাবুকে ঘাবড়ে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

কথাটা শেষ করেই বাসব একটা সিগারেট ধরাল।

সোমা এতক্ষণ নীরবে শুনছিল, এবার বলল, কথা বলতে বলতে নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, কফি করে আনি?

—কফি! ডিনারের পর কফি খাওয়ার একটা সিস্টেম আছে বটে, তবে আমরা না হয় লাঞ্চের পরই খেলাম, কি বল ডাক্তার?

—আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত।

মৃদু হাসল সোমা। তারপর উঠে গেল। কফি তৈরি করে নিয়ে আসতে গেল বলাইবাহুল্য।

॥ তিন ॥

চিন্ময় চশমা ঠিক করে নিয়ে চারধারে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। ত্রিশ ফুট লম্বা আর ষোল ফুট চওড়া ঘরখানা বেশ সাজানোই বলা চলে। অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় জায়গা অনেক বেশী। তাঁকে বাদ দিলে, দরোয়ান সমেত মাত্র তিনজন এখানে কাজ করবে। পরে অবশ্য আরো লোকের প্রয়োজন হতে পারে। তা নিয়ে চিন্ময়ের কোন মাথা ব্যথা নেই। কেনই বা থাকবে? খুব বেশী যদি হয় দিন কয়েক মেয়াদ এই অফিসে তাঁর।

চিন্ময় দত্তর বয়স পঁয়তাল্লিশ। দোহারা গড়নের মাঝামাঝি আকারের লোক। মুখ চোখ মোটামুটি। পাবনার রায়পাতি গ্রামের একজন সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তাঁর ঠাকুরদা। বাল্যকালটা চিন্ময়ের রাজার হালেই কেটেছে। কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে গেল দেশ বিভাগের সময়। পূর্ব বাংলার আরো বহু জনপদের মত রায়পাতির ওপর দিয়েও রক্তের বন্যা বয়ে গেল।

সেই বন্যায় ভেসে গেলেন ঠাকুরদা, বাবা এবং পরিবারের আরো অনেকে। মা'র হাত ধরে কিভাবে যে কলকাতায় এসে পৌছেছিলেন, সেই মর্মন্তুদ কাহিনী এখন আর মনে রাখতে চান না চিন্ময়। তবে সেদিন কলকাতার পথে পথে তাঁদের ভিক্ষা করে বেড়াতে হয়নি। হৃদয়বান মামা মা ও ছেলেকে স্থান দিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে।

মামা গড়িয়ায় থাকতেন। অকৃতদার মানুষ। তখন কাজ করতেন এক সওদাগরী অফিসে। মামার স্নেহের ছায়ায় চিন্ময় বড় হতে লাগলেন। ম্যাট্রিক পাশ করলেন। ইণ্টার মিডিয়েটও পাশ করলেন যথাসময়ে। আবার এক বিপত্তি। মা গঙ্গায় নাইতে গিয়েছিলেন আর ফিরলেন না। কোটালের বান তাঁকে চির-দিনের মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

গ্র্যাজুয়েট হলেন চিন্ময়। মামা পরামর্শ দিলেন, আর ডিগ্রী বাড়িয়ে কি হবে, এই বেলা চাকরির ব্যবস্থা দেখা ভাল। ভাগ্য তখন তুঙ্গে বলতে হবে, অল্প আয়াসেই চাকরি পেয়ে গেলেন। অবশ্য তখন চাকরির বাজারে আজকের মত আগুন লাগে নি।

চাকরি হল ব্যাঙ্কে। চিন্ময়ের মনে হতে লাগল ভাগ্যটাকে হাতের মুঠোয়

পেয়ে গেছেন। আগামী জীবন কোন খাতে বইবে, তার একটা ছকও কাটলেন বিয়ের ব্যাপারে মামা তাড়া দিচ্ছিলেন। অনিচ্ছা ছিল না বিয়ে করতে। বিলম্বের একমাত্র কারণ, মনের মত একটি মেয়ে পাওয়া যাচ্ছিল না। মামা তার তল্লাস চালাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না, হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলেন তিনি।

এই ভাবে বিয়ের ব্যাপারটা চাপা পড়ে যাওয়ায় চিন্ময় ক্ষুন্ন হলেন না। বরং আরো কিছুদিন স্বাধীনতা স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে পারবেন এই চিন্তা তাঁকে উৎফুল্ল করে তুলল। স্বাধীনতা ভোগ করতে করতে চিন্ময় হঠাৎ একদিন হোঁচট খেলেন। সেদিন হিসাব করে দেখলেন, বিয়াল্লিশ পার হয়ে গেছে। আর বিয়ে নয়।

অফিস যান, আসেন। সিনেমা-থিয়েটার দেখেন। মাঝে মধ্যে রাম বা হুইস্কিও চলে। পদোন্নতি হয়েছে। সবই ঠিক—তবু তিনি অনুভব করেন, ক্রমেই একাকিত্বর বেদনা তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছে। কি করবেন যখন স্থির করতে পারছেন না, ঠিক তখনই আলাপ হয়ে গেল অরুণ সোমের সঙ্গে।

আলাপ গভীর হতেই অরুণ পরিচয় করিয়ে দিল স্ত্রী অপর্ণার সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই চিন্ময় ঘাড় গুঁজে পড়লেন। এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, অল্প দিনের মধ্যেই অপর্ণাও তাঁকে প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করেছে। এর কারণটা অবশ্য চিন্ময় পরে জেনেছেন। শারীরিক দিক থেকে অক্ষম অরুণ। হীনমন্যতায় ভুগছে। স্ত্রীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার সাহস বা সাধ্য—দুটোর কোনটাই নেই তার।

চিন্ময় গা ভাসিয়ে দিলেন। অপর্ণা তাকে তুরীয় অবস্থায় নিয়ে গেছে। মনে হয়, অরুণ সব বুঝতে পেরেও চুপ করে থাকে। নিজের অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ নিয়ে বাইরে বাইরে ঘোরে। চিন্ময় দু'হাত ভরে খরচ করেন—উচ্ছ্বাসে খান খান হতে থাকে অপর্ণা।

এই ভাবে তিন বছর কেটে গেছে।

অপর্ণাকে খুশি রাখতে গিয়ে মামার কাছ থেকে পাওয়া বাড়িটা বিক্রি করতে হয়েছে। হাত পড়েছে পি-এফ' এ। তাতে কোন দুঃখ নেই। অপর্ণাকে আরো গভীর ভাবে কি করে পাওয়া যায়, সেই চিন্তাই চিন্ময়কে অস্থির করে তুলল। একদিন আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললেন, ওই লোকটাকে তুমি ডাইভোর্স করতে পার না?

অপর্ণার মুখে মিষ্টি হাসি: পারি।

কবে তুমি পারো ?

তুমি যবে বলবে। তারপর—

তারপর কি, তাও তোমায় বলে দিতে হবে !

আমরা সুখে জীবন কাটাতে পারব, তাই তো এই ব্যবস্থা।

নিশ্চয়।

তুমি ভেবে চিন্তে কথা বলছ না চিন্ময়। বিয়ের পর আমরা মোটেই সুখে দিন কাটাতে পারব না।

কেন ?

কেন নয়, বল ? বাড়িটা পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছ। ব্যাঙ্কের জমানো টাকা শেষ। সুখ আমরা পাব কোথা থেকে ? তার চেয়ে এই ভাল। একটা বোকা লোকের ঘাড়ে চেপে আছি। খাওয়া থাকার অসুবিধা নেই। তুমি যেমন যাওয়া-আসা করছ, করবে। হাতে টাকা থাকলে আমায় দেবে, নয়তো কোথা থেকে দেবে ? আমি কিছু মনে করব না।

চিন্ময় নগ্ন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাহাকার করে উঠলেন। কয়েক মিনিট কোন কথা বলতে পারলেন না। চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসতে চাইল। অপর্ণার কাছে নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য আকুল হয়ে ওঠা ছাড়া উপায় কি ?

বললেন গলা ঝেড়ে নিয়ে, আমি মোটা মাইনে পাই, তা কি তুমি জান না ?

অপর্ণা বলল তরল গলায়, কেন জানব না ? কিন্তু সেই মোটা মাইনের অর্ধেকও এখন তুমি পাচ্ছ কিনা সন্দেহ। অফিসের লোন শোধ করতে হচ্ছে তো। তাই বলছিলাম, তোমার এখন যা আয়, তাতে আমাদের দুজনের কখনোই ভাল ভাবে দিন চলতে পারে না।

কি বলবেন, এবার চিন্ময় ভেবে পেলেন না।

অপর্ণাই বলল আবার, সত্যি যদি আমাকে নিজের করে পেতে চাও তবে—

এখনো তোমার সন্দেহ আছে ?

নেই। সত্যি বলতে কি, আমিও চাই এই নাগপাশ থেকে উদ্ধার পেতে।

জানি তো। তবে আর—

উৎসাহিত চিন্ময়কে থামিয়ে অপর্ণা বলল এত তাড়াতাড়ি উৎসাহিত হবার কিছু নেই। আমরা উঠতি ছোঁড়াছুঁড়ি নয় যে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই কিছু একটা করে বসব। প্রথম বা একমাত্র কথা হচ্ছে, আমাদের হাতে মোটা টাকা থাকা চাই— ঠিক তো ?

ঠিক।

মোটা টাকাটা হাতে আসবার একটা পথও নিশ্চয় চাই? সেই পথের সন্ধান আমি তোমায় দিতে পারি।

তুমি!

আমি ছাড়া আবার কে? ব্যাঙ্কে প্রত্যহ তো অনেক টাকা নাড়াচাড়া কর। নিজের ব্যবস্থা ওখান থেকে—

চিন্ময় আঁতকে উঠলেন: বলছ কি তুমি? ব্যাঙ্ক থেকে টাকা সরাবো?

অবজ্ঞার স্বরে অপর্ণা বলল, আকাশ থেকে পড়লে যে? মনে হচ্ছে, এমন কথা বললাম, যা আগে কেউ করে নি? টাকা সরাবে মানে কি, বোকার মত সরাবে নাকি? এমন কায়দা করে সরাতে হবে, যাতে তুমি থাকবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে—দোষটা চাপবে অন্যের ঘাড়ে।

কিন্তু—

তুমি এত ভীতু, জানতাম না তো? মিটে গেল তাহলে ব্যাপারটা। এই বেশ আমরা আড়ালে আবডালে প্রেম-ট্রেম চালিয়ে যেতে থাকব।

ভারি বিমর্ষ হয়ে অপর্ণার কাছ থেকে সেদিন বিদায় নিলেন চিন্ময়।

এরপর মাসখানেক কেটে গেছে।

চিন্ময় লক্ষ্য করলেন, ইদানিং অপর্ণা তাঁকে এড়িয়ে চলতে চাইছে। এই অবস্থাকে মেনে নিতে পারেন না চিন্ময়। পাগল হয়ে যাবেন। অপর্ণা তাঁকে এমন নেশায় বিভোর করে দিয়েছে, যার হাত থেকে এ-জীবনে রেহাই নেই। সেদিন মরিয়া হয়ে বললেন, এ তুমি কি করছ? এইভাবে চলতে থাকলে আমি বোধহয় বাঁচব না।

কিছুটা আবেগের সঙ্গেই অপর্ণা বলল, না—না, ওকথা বোলো না। কিন্তু আমি কি করব বল? আর মাস দুয়েকের মধ্যেই অরুণ কলকাতার পাট চুকিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে কানপুর চলে যাবে। তোমার দেখা তো আর পাব না। ইচ্ছে করেই তাই তোমাকে এড়িয়ে যাচ্ছি।

কানপুর চলে যাচ্ছ!!

কি করব? যেতেই হবে। তুমি যদি কিছু টাকা-পয়সা যোগাড় করে ফেলতে পারতে, তাহলে--

আমিও তো তাই চাই। শুধু—

উৎসাহের সঙ্গে অপর্ণা বলল, সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দাও। এস আমরা

মৃদু হেসে অপর্ণা বলল, আমি কিন্তু প্রথম দর্শনেই বুঝে নিয়েছিলাম, লোকটা ভেড়া মার্কা। ওকে ওঠাতে বসাতে আমার অসুবিধে হবে না।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অরুণ বলল, ওঠ-বোস করাতে করাতে তো ওর কাছ থেকে কম করেও পঞ্চাশ হাজার টাকা খসিয়ে নিয়েছ। আমি তাই বলছিলাম, আর নয়, এবার রেহাই দাও। আমার কথা শুনলে ভাল করতে। নতুন একটা মক্কেল আমি ঠিক যোগাড় করে ফেলতাম।

হয়তো পারতে। কিন্তু দরকারটা কি? আগেও বলেছি, আবার বলছি, চিন্ময় দত্ত আমাদের আরো অন্তত লাখ টাকা দেবে।

তুমি নিশ্চিত?

অপর্ণা হাসিতে ভেঙে পড়ল এবার।

তারপর হাসি থামিয়ে বলল, হ্যাঁ মশাই, দেবে। বিছানায় আমি কত লোভনীয়, তা তো তুমি জান? ওই লোকটার ঘেমো কদাকার শরীরের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে যখন বারবার বিছানায় গড়াগড়ি খেয়েছি, তখন নেশার হাত থেকে ওর রেহাই কোথায়? সুটকেশ ভর্তি টাকা নিয়ে আমার কাছে এল বলে।

তোমার কথাই বোধহয় ঠিক। আচ্ছা, আমরা টাকাটা পাবার পর···

আদর্শ স্বামী-স্ত্রী হয়ে যাব। কাউকে আর কাছে ঘেঁষতে দেব না। মনে রেখ, তখন অন্য পাড়ায় উঠে যেতে হবে।

অরুণ সিগারেটের টুকরোটা জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়ে বলল, সে কথা বলতে। চিন্ময় দত্তকে কোন ঝামেলা করার সুযোগ দেওয়া হবে না।

অপর্ণা এতক্ষণ গড়ানে বেতের চেয়ারে বসেছিল। এবার চেয়ার থেকে উঠে পড়ে শাড়ি ঠিক করতে করতে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। রাস্তার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফিরে এল অরুণের কাছাকাছি।

আমি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ছি।

অরুণ অবাক: কোথায়?

দত্তর কাছ থেকে একবার ঘুরে আসব। লোকটা কতদূর এগোল দেখা দরকার।

চিন্ময় তো গত রবিবারে এসেছিল?

তাতে কি! ওকে এখন যত সুড়সুড়ি দেওয়া যাবে, কাজ তত তাড়াতাড়ি এগোবে, এটা কেন বুঝছ না?

তা বটে। তুমি তাহলে ··

লোকাল ট্রেনে যাব। খুব দূর তো নয়। আজ রাত্রে নাও ফিরতে পারি। ভাবনায় পড়ে যেও না যেন।

অরুণ অপর্ণাকে কাছে টেনে নিল।

পাগল নাকি? তুমি কুবেরকে আঁচলে বাঁধতে যাচ্ছ, আমি চিন্তা ভাবনার মধ্যে যাব কেন?

তাহলে ওই কথাই রইল। চল, খেয়ে নেবে। তুমিও তো বলছিলে, সোনারপুর না কোথায় যাবে?

বজবজ। কাজ আছে।

দুজনে ডাইনিং স্পেসে গিয়ে উপস্থিত হল। সামান্য কিছু জলযোগ সারতে মিনিট দশেক গেল। অরুণ বেরিয়ে পড়ল এরপর। অপর্ণা রাস্তার দিকের জানালায় একবার উঁকি মেরেই, কাপড় বদলাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অরুণ রাস্তায় নেমে ট্যাক্সির আশায় এদিক ওদিক তাকাল।

ওর বাসার অল্প কিছু দূরে ওয়ালনাট রঙের একটা মার্ক-থ্রী দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সির নাম-গন্ধ নেই। মার্ক-থ্রীকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। মোড়ের ওধারে ট্যাক্সি পাওয়া যেতে পারে। এখান থেকে শিয়ালদার দূরত্ব কম নয়।

অরুণ মোড়ের ওধারে অদৃশ্য হতেই, মার্ক-থ্রীর চালক গাড়ি থেকে নামল। দরজা লক করার পর সিগারেট ধরাল। দীর্ঘকায় এই ব্যক্তির শরীরে মেদের বাহুল্য নেই। মনে হয় একজন স্পোর্টসম্যান। মুখশ্রী বেশ ধারালো। চোখে এখন সানগ্লাস।

এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে সে মন্থর পায়ে এগিয়ে চলল। থামল গিয়ে অরুণের বাড়ির সদর দরজার সামনে। কড়ায় কয়েকবার চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। প্রস্তুত হয়েই বোধহয় অপেক্ষা করছিল অপর্ণা।

এলে তাহলে?

আগন্তুক ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর সবলে জড়িয়ে ধরল অপর্ণাকে। কয়েক মিনিট ধরে আদরে তাকে বিপর্যস্ত করে তুলল।

ওই ইডিয়েটের সামনে এসে উপস্থিত হলে তুমি খুশি হতে?

অরুণ কিন্তু তখন খুব বেশী দূর যায় নি।

মোড়ের ওধারের পানের দোকানের সামনে এসে থেমেছে। এক প্যাকেট চার্মিনার কিনে, পকেট থেকে দেশলাই বার করবার মুখেই দেখতে পেল, একটা

খালি ট্যাক্সি এগিয়ে আসছে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ট্যাক্সিটা থামাল অরুণ। তারপরে চড়ে বসে নির্দেশ দিল শিয়ালদার দিকে যেতে।

এত তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি পাওয়া যাবে ভাবতে পারে নি। আর ভাবনা নেই, দশটা একুশের ট্রেনটা সহজেই ধরতে পারবে। ভোরে জোর বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এধারের রাস্তায় এক হাঁটু জল। বাধ্য হয়ে ড্রাইভার ঘুর পথেই রওনা হল। অর্থাৎ অরুণের বাসার সামনে দিয়েই যেতে হবে।

অরুণ নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরিয়ে হেলে বসেছে। তখনো জানে না কত বড় বিস্ময় অপেক্ষা করে রয়েছে তার জন্য। ট্যাক্সি গতি নেবার এক মিনিটের মধ্যেই বিস্ময়ের মুখোমুখি হতে হল। অরুণ দেখল, এক দীর্ঘকায়, সবল স্বাস্থ্য লোক তার বাসায় ঢুকে যাচ্ছে। দরজা বন্ধ হবার মুখে উচ্ছ্বসিত অপর্ণাকে দেখতে পেল এক ঝলক।

ব্যাপারটা কি?

সন্দেহ মনকে গুলিয়ে তুলল। লোকটা তো পরিচিত নয়। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, তার অনুপস্থিতিতে মক্কেলের যাতায়াত আছে। বজবজ যাওয়া মাথায় উঠল। বাসা পেরিয়ে সামান্য এগোবার পরই ট্যাক্সি থামাল অরুণ। হতভম্ব ট্যাক্সি ড্রাইভারের হাতে দু' টাকা গুঁজে দিয়ে নেমে পড়ল। তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল সরু একটা গলির দিকে।

আগন্তুক তখন খাটের ওপর আড় হয়ে শুয়ে আছে। অপর্ণা ড্রেসিং টুলের ওপর বসে, মুখে পাউডারের পাফ বোলাতে বোলাতে বলছিল, আমার এই টানা হেঁচড়া আর ভাল লাগে না।

নির্বিকার গলায় আগন্তুক বলল, তোমার বেলেল্লাপনার ওপর পর্দা পড়তে আর দেরি নেই।

তোমার মুখে কিছুই আটকায় না!

কেন আটকাবে বল? তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। পাকে চক্রে আমার জেল হল। তিন বছর পরে বেরিয়ে এসে শুনি, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর তোমার যখন সন্ধান পেলাম, তখন তুমি বেশ্যার অধম। এমন একটা লোকের হাতে পড়েছ, যে তোমাকে দিয়ে সবই করিয়ে নিচ্ছে।

সহজ গলায় অপর্ণা বলল, তুমিও কিছু দুধে ধোয়া নও। কেউ নিশ্চয় বলবে না, জেলে হাওয়া বদল করতে গিয়েছিলে। গয়নার দোকানে হানা দেওয়ার পর ধরা পড়ে যাওয়াটা বোধহয় সৎ কাজ?

আগন্তুক হেসে ফেলল : দেখা যাচ্ছে, আমরা দুজনেই বস্তু বিশেষ। যাহোক, সামনে আর অন্ধকার নেই। জীবনে তুমি একটাই ভাল কাজ করেছ, সেটা হল চিন্ময় দত্তকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া। রিজেণ্ট পার্কে একটা ছোট বাড়ি দেখে রেখেছি। টাকাটা হাতে এলেই কিনে ফেলব।

আমার স্বামীর ধারণা, পরিকল্পনাটা তারই। টাকাটা হাতে এলেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়বে।

আগন্তুক জোরে হেসে উঠল।

কেটে পড়বে! বল কি?

কিন্তু সোমেন, তুমি বলছ, এখানেই থেকে যাবে। তারপর যদি—

তোমার কর্তা ঝামেলা বাধাবে? ব্যাপারটা এত সোজা নয়। ধারে কাছে এলেই বুঝতে পারবে, আমি কি বস্তু। তারপরও যদি লাগতে আসে, জানবে তার ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকছে না।

ড্রেসিং টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অপর্ণা ঘড়ি দেখল।

এবার যাওয়া উচিত। এগারটা কুড়ির ট্রেনটা এরপর মিস করে যাব। ভাল কথা, তুমি বলছিলে না, ওখানে তোমার কে একজন—

নিজের কেউ নয়। সোমেন বলল, আমার মামাতো দাদার এক বন্ধু। প্রশান্ত তালুকদার ওখানকার একজন বড় ব্যবসাদার। আমাদের ভাগ্যটা এখন ভালই। খবর পেয়েছি, চিন্ময় দত্তর ব্যাঙ্কে তালুকদারেরা একাউণ্ট খুলেছে। বড় রকম ট্রানজাকসন হলেই দত্ত ডুব মারবে, দেখে নিও। তারপর—

অপর্ণা মৃদু হেসে বলল, সেটাই তো জানতে চাইছি।

ডুবন্ত দত্তকে আমরা তুলব। মালকড়ি হাতিয়ে নিতে যেটুকু সময় লাগবে আর কি—তারপর তাকে আবার ডুবিয়ে দেব। কিভাবে ব্যাপারটা ঘটবে, তোমাকে পরে বলব!

বিছানা থেকে নামতে নামতে সোমেন কথা শেষ করল।

চিন্ময়ের অফিস ঘরে তালুকদার প্রবেশ করলেন পৌনে বারোটার সময়। হাতে দামী ব্রিফকেস। বয়স পঞ্চাশের ওপরে হলেও স্বাস্থ্য বেশ ভালই। অবশ্য উচ্চতায় খুব বেশী নন। মুখে দাম্ভিকতার ছাপ থাকলেও, পরিচিত মহলে তিনি বিনয়ী হিসাবেই সুখ্যাত।

চিন্ময় বললেন, আসুন, আসুন—

তালুকদার মৃদু হেসে চেয়ারে বসলেন।

ইণ্ডিয়া কিং-এর প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বললেন ব্যাঙ্কের এই ব্রাঞ্চটা এখানে হওয়ায় খুব সুবিধা হয়েছে আমাদের। আজকের কথাই ধরুন না, ব্রাঞ্চটা না থাকলে এতগুলো টাকা নিয়ে উত্তরপাড়ায় ছুটতে হত। কি রকম দিনকাল যাচ্ছে, দেখছেন, তো?

প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে চিন্ময় বললেন, ওই সমস্ত কথা ভেবেই কর্তৃপক্ষ এখানে ব্রাঞ্চ খুলেছেন। টাকাটা তাহলে জমা করিয়ে দিই?

নিশ্চয় তিন লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা আছে। বুধবারে অবশ্য এর প্রায় অর্ধেক তুলে নিতে হবে ওয়ার্কারদের পেমেণ্ট তো আছেই, তাছাড়া কয়েকটা পার্টিকে অ্যাডভান্স করতে হবে।

কথা শেষ করে তালুকদার সিগারেট ধরালেন।

চিন্ময়ও ধরিয়ে নিলেন সিগারেট। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বেল টিপলেন।

বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই বললেন, রথীনবাবুকে ডাকো।

তালুকদার বললেন, এখানে লকারের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

এই তো সবে শুরু। ব্রাঞ্চের কাজকর্ম আরো বাড়ুক। বছর খানেকের মধ্যেই দেখবেন জমজমাট ব্যাপার।

রথীন এল ঘরে।

বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। দেখেই মনে হয় বেশ চটপটে।

আমায় ডেকেছেন?

মিস্টার তালুকদারের একাউণ্টে বেশ কিছু টাকা জমা পড়বে। নোটগুলো তাড়াতাড়ি গুনে ফেলুন। আজ আবার শনিবার।

তালুকদার ব্রীফকেসের লক সরিয়ে টেবিলের একধারে একটু ঠেলে দিয়ে বললেন, একশ, পঞ্চাশ আর দশের সমস্ত নোট আলাদা আলাদা ভাবে বাণ্ড করা আছে। গুনতে খুব বেশী সময় লাগবে না।

রথীন কাজে লেগে গেল।

কাজ শেষ হল একসময়।

এন্ট্রি ইত্যাদি সেরে, টাকার স্তূপ সেফের মধ্যে রেখে তালুকদারের দেওয়া আরেকটা সিগারেট ধরালেন চিন্ময়। ভারি হালকা লাগছে নিজেকে। সামনে বসে থাকা ওই ধনী-নির্বোধ যেচে যেন হাড়িকাঠে গলা দিল।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চিন্ময় বললেন, একটা মোটর কোথা থেকে যোগাড় করা যায় বলুন তো?

কোথাও যাবেন নাকি?

কাল রবিবার। ভাবছি, গাড়ি পেলে চাঁদপুর ঘুরে আসতাম।

তালুকদার বললেন, আমার গাড়িটাই দিতে পারতাম। ব্রেকে গোলমাল দেখা দিয়েছে। গতকালই গ্যারাজে পাঠালাম। সরি মিস্টার দত্ত, আপনার এই কাজে লাগতে পারলে, সত্যি খুশি হতাম।

তাতে কি হয়েছে। আমি বরং—

এক কাজ করা যেতে পারে। আপনি নরেনের গাড়িটা নিন। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ড্রাইভার দরকার হবে তো?

নরেন গাঙ্গুলী তালুকদারের বিজনেস পার্টনার।

ধন্যবাদ। ড্রাইভারের দরকার হবে না। মিস্টার গাঙ্গুলীকে বলবেন, সোমবার সকালেই গাড়ি ফিরিয়ে দেব।

আরো দু-চার কথার পর তালুকদার বিদায় নিলেন।

রিস্টওয়াচের দিকে তাকালেন চিন্ময়, একটা কুড়ি।

পরিকল্পনাটা মোটামুটি খাড়া করে ফেলেছেন। ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবার পর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করবেন না। একটা স্যুটকেশ আগাম এনে রেখেছেন। সেফ থেকে টাকা বার করে তার মধ্যে ভরে ফেলবেন। তারপর স্যুটকেশ নিয়ে বাসায় যাবেন। সাড়ে পাঁচটার সময় নরেন গাঙ্গুলীর ড্রাইভার গাড়ি দিয়ে যাবে, এই রকমই কথা হয়েছে তালুকদারের সঙ্গে। জামা-কাপড় ভর্তি দ্বিতীয় স্যুটকেশটা নিয়ে গাড়িতে চেপে রওনা দেবেন।

প্রথম পর্ব এইভাবে শেষ হবে।

আসল খেলা দেখাতে হবে দ্বিতীয় পর্বে। কলকাতার বিপরীত দিকে মাইল দশেক যাবার পর, কোন ঝোপ-জঙ্গল বা খানাখন্দর কাছ বরাবর গাড়ি থামাবেন। তারপর কাছাকাছি স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে কলকাতা রওনা দেবেন। এতে পুলিশকে বিপথগামী করা হবে। তারা ভাববে, গাড়ি এখানে ফেলে রেখে, দূরপাল্লার কোন ট্রেনে চেপে চিন্ময় বিহার বা উত্তর প্রদেশের কোথাও সরে পড়েছেন।

কলকাতায় পৌঁছে কিন্তু নিজের পুরনো বাসায় চিন্ময় যাবেন না। উঠবেন কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেলে। ওখান থেকে অপর্ণাকে ফোন করবেন।

ইতিমধ্যে নিজের গোঁফ আর জুলফি কামিয়ে ফেলবেন। চওড়া ফ্রেমের একটা পাওয়ার লেস চশমা কিনে রেখেছেন। চশমা চোখে উঠবে। এই সাদামাটা মেকআপেই চিন্ময়ের চেহারা বদলে যাবে। ফোন পেয়েই অপর্ণা চলে আসবে হোটেলে, অনেক আগেই এই সমস্ত কথা স্থির হয়ে আছে। তারপর—

ট্রেন থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকাল অপর্ণা। জনস্রোত তখন গেটের দিকে চলেছে। সোমেনও একই ট্রেনে এসেছে। তবে এক কামরায় নয়। কেউ কাউকে চেনে না, এমন একটা ভাব নিয়ে যে যার গন্তব্যস্থলে যাবে। ভিড় কমে যাবার পর অপর্ণা এগোল।

গেটের কাছাকাছি এসেছে।

চাপা গলায় কে বলল, ওয়েটিংরুমে এসো।

চমকে অপর্ণা মুখ ফেরাল! হাতখানেকের মধ্যেই অরুণ দাঁড়িয়ে। ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। ততক্ষণে সে এগোতে আরম্ভ করেছে। অপর্ণা ভাবি দমে গেল এরকম তো হবার কথা নয়। হিসাবে কোথায় একটা গোলমাল হয়েছে। অরুণকে অনুসরণ করে অপর্ণা ওয়েটিংরুমে এল।

তুমি বজবজে যাও নি?

কই আর যাওয়া হল। তোমার নাগরটি কোথায় গেল? সোমেন না কি যেন নাম তার—

সোমেন—

অবাক হবার ভান কোরো না মাইডিয়ার। তুমি যে এমন ধুরন্ধর খেলোয়াড়, সত্যি, আগে বুঝতে পারি নি। চিন্ময় দত্তর কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে, আমাকে ফাঁকি মেরে রিজেন্ট পার্কে গিয়ে বাস করবে ওই লোকটার সঙ্গে? পরিকল্পনাটা খাসা করা হয়েছে মানতেই হবে।

অপর্ণা পরিষ্কার বুঝতে পারল, অরুণ ভেতরের অনেক কথাই জানতে পেরেছে। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না, তার ও সোমেনের মধ্যেকার আলোচনা ও কিভাবে শুনল। অবশ্য এখন গবেষণা চালিয়ে লাভ নেই। মুহূর্তটা এখন সঙ্গীন, এটাই হল বাস্তব।

যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গলায় অপর্ণা বলল, যদি খেলোয়াড় হয়ে উঠে থাকি, তবে তার জন্য তুমিই দায়ী। এত নোংরা আমি ছিলাম না। নিজের স্বার্থে তুমি আমাকে কাজে লাগিয়েছ।

থাক। নীতি কথা ভাল লাগে না। আমি পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই, তুমি এখন কোন দলে?

তার মানে?

চিবিয়ে চিবিয়ে অরুণ বলল, ন্যাকামির একটা সীমা থাকা উচিত। আমারই শোবার ঘরে ঘণ্টা কয়েক আগে ওই স্কাউণ্ড্রেলের সঙ্গে তোমার যে আলোচনা হয়েছে, আমি শুনে ফেলেছি, এখনো বুঝতে পারছ না? আমার তাই জানা দরকার, শেষ পর্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, না আমি অন্য পথ দেখব?

তোমার পথটা কি?

তোমার জেনে লাভ?

বিয়ের অনেক আগে থেকেই সোমেনের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমাদের বিয়ে হয়ে যেত—বিশেষ একটা কারণে হল না। এতদিন পরে আবার এসে জুটেছে। ওকে এড়াতে পারি নি।

যা হবার হয়ে গেছে। এখন এড়াতে পারো।

তুমি জান না, সোমেন কি রকম ডেঞ্জারাস লোক।

গলা নামিয়ে অরুণ বলল, তুমি কি বলতে চাও, এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলে ও তোমাকে গিলে ফেলবে? এত সোজা নয়। আসল ব্যাপারটা কি আমি আঁচ করে নিয়েছি। উত্তরযৌবনা একজন মহিলার পিছনে লোকটা ঘুরঘুর করছে কেন? এর একমাত্র কারণ হল টাকা। তোমার সাহায্যে সে কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিতে চায়।

অপর্ণা চুপ করে রইল।

বোঝবার চেষ্টা কর অপর্ণা, লোকটা স্বার্থপর—লোকটা লোভী। টাকা হাতে আসার পরই তোমাকে ছেঁড়া জুতোর মত ফেলে দেবে। তারপর একটা উঠতি ছুঁড়ি যোগাড করে নৈনিতাল বা সিমলায় গিয়ে মৌজ মারবে।

অপর্ণা কি বলবে ভেবে পেল না। মন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠল। অরুণ হয়তো ভুল কিছু বলছে না। সে তো জানে, সোমেন একজন জাত ক্রিমিনাল। টোপ হিসাবে হয়তো তাকে ব্যবহার করছে। কাজ মিটে গেলেই সরে পড়বে।

আমি তাই বলছিলাম অপর্ণা—

আপনি তো অনেক কিছুই বললেন। এবার আমায় বলতে দিন--

চমকে দুজনে মুখ ফেরাল।

স্বীকার করতেই হবে, দৃশ্যটা নাটকীয়। দরজার গোড়ায় অত্যন্ত স্বাভাবিক

ভঙ্গিতে সোমেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখে তার মোলায়েম হাসি। দু' আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট।

দু'পা এগিয়ে এসে বলল, যা বলছিলাম, এবার আমাকে কয়েকটা কথা বলতে দিন।

গম্ভীর গলায় অরুণ বলল, অনধিকার চর্চা করবেন না। আপনার মনে রাখা দরকার, আমরা স্বামী-স্ত্রী। আমাদের মধ্যে নাক গলানোটা ভদ্রতা-সম্মত নয়।

নয় নাকি। আপনারা যে কি ধরনের স্বামী-স্ত্রী, আমার জানতে বাকি নেই। আপনাকে এখানে দেখেই বুঝলাম, ব্যাপার ঘোরাল। আসতেই হল পিছু পিছু। শুনুন মশাই, এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে একযোগে কাজ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। একটা প্রস্তাব আছে।

আপনার প্রস্তাব কে গ্রাহ্য করছে?

ভারী গলায় সোমেন বলল, আপনি করবেন। এছাড়া কোন পথ নেই। নইলে আমি রহস্য ফাঁস করে দেব। চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে যাবে। তখন—

আপনি চিন্ময় দত্তর কাছ থেকে টাকাটা হাতাতে গেলে, আমিও সমস্ত কিছু ফাঁস করে দেব।

তাই তো আমি প্রস্তাব দিতে চাইছি, আমরা একযোগে কাজ করব। কিছুই ফাঁস হবে না। চিন্ময়ের কাছ থেকে টাকাটা পেলেই, আধাআধি ভাগ করে নেওয়া যাবে।

অরুণ গুম হয়ে রইল প্রায় মিনিট খানেক। তারপর বলল, বেশ তাই হবে। তবে—

বলুন?

পরিকল্পনা একটা খাড়া করা দরকার। নইলে—

একশ বার। কাল সকালে আমি আপনাদের ওখানে আসছি। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে চিন্ময় দত্তকে কিভাবে ফাঁকি দেওয়া যায়, তার একটা প্ল্যান মাথা খাটিয়ে বার করা যাবে।

অরুণ বলল, ওই কথাই রইল তাহলে। অপর্ণা এখন চিন্ময়ের কাছে চলে যাক। তাকে একটু তাতিয়ে আসুক। এখন এরকম ওষুধের দরকার আছে। কাজটা তাহলে তাড়াতাড়ি হবে।

আপনি ঠিকই বলেছেন। আমিও এখন চলি। কাল আমি বেলা ন'টার মধ্যেই পৌছচ্ছি।

কথাটা শেষ করেই সোমেন ওয়েটিংরুম থেকে বেরোল।

নরেন গাঙ্গুলী গদি আঁটা চেয়ারে বসে পান চিবোচ্ছিলেন। এই নেশাটাকেই তিনি আঁকড়ে ধরে আছেন। দিনে চল্লিশ খিলির কম পান খান না। মধ্য পঞ্চাশ নরেন গাঙ্গুলী ভারী চেহারার লোক। উচ্চতায় বেশী না হওয়ায়, চেহারায় একটা নেয়াপাতি ভাব এসে গেছে।

মাটি থেকে পিকদানি তুলে নিয়ে পানের ছিবড়ে ফেললেন নরেন। তাকালেন সামনের দিকে। দেখলেন, তাঁর পার্টনার তালুকদার কথা শেষ করে ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখছেন।

কার সঙ্গে কথা বললে?

পকেট থেকে সিগারেটের কৌটোটা বার করতে করতে তালুকদার বললেন, সিনহার সঙ্গে কথা বললাম। জানিয়ে দিলাম, ও যে দর দিয়েছে, তাতে আমাদের পক্ষে রাজী হওয়া সম্ভব নয়। লোকটা তবু হাল ছাড়ছে না।

ভাবছে মুখে যাই বলি, পরে আমরা দর কমিয়ে দেব। সিনহাকে বাদ দিতে হবে। কাল হয়তো বাজোরিয়া আসবে।

ভালই। বাজোরিয়া আমাদের দর মেনে নেবে।

কথা শেষ করে তালুকদার সিগারেট ধরালেন।

নড়েচড়ে বসে গাঙ্গুলী বললেন, গাড়িটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে পাঠিয়ে দেওয়ার একটু অসুবিধা বোধ করছি।

কিসের অসুবিধা?

বর্ধমান যাব ভাবছিলাম। কিছুক্ষণ আগে খবর পেলাম ছোট ভাগ্নেটা অ্যাক্সিডেন্ট করে বসেছে।

আমার গাড়িটা না থাকার জন্যই তো বিপত্তি। ট্রেনে চলে যাও।

অগত্যা।

তালুকদার কিছু বলার আগেই সোমেনকে দেখতে পেলেন। সে ঘরে ঢুকেই বসে পড়ল একটা চেয়ারে। বন্ধুর ভাই। মাঝে মাঝে আসে এখানে।

নরেন গাঙ্গুলীও চেনেন সোমেনকে।

মাস ছয়েক পরে কোথা থেকে উদয় হলে?

মৃদু হেসে সোমেন বলল, কাজকর্মে ভারি ঝামেলা যাচ্ছে। আপনারা ভাল আছেন তো?

গাঙ্গুলী বললেন চলে যাচ্ছে। এখানেও কোন ঝামেলা ঘাড়ে নিয়ে এলে নাকি?

না—না। চিন্ময় দত্তকে চেনেন তো? ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ওঁর এক আত্মীয়ার সঙ্গে পরিচয় আছে। তাঁর সঙ্গেই এসেছি।

তালুকদার বললেন, ম্যানেজার তো কোথায় যাচ্ছেন জানি। নরেনের গাড়িটাও নিয়েছেন।

সোমেন সচকিত হল: তাই নাকি!

ওদিকে—

পাঁচটায় অফিস বন্ধ করে রিক্সায় চেপে বসলেন চিন্ময়। এখন নার্ভ ঠিক রাখতে হবে। আসল কাজ এইবার আরম্ভ। প্রাথমিক যা করবার অবশ্য করে রেখেছেন। একটা সুটকেশ সকলের চোখ বাঁচিয়ে নিজের অফিস ঘরে গিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। নরেন গাঙ্গুলীর গাড়ি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর বাসায় এসে উপস্থিত হবে। টাকা ভর্তি সুটকেশটা নিয়ে রওনা হবেন ব্যাণ্ডেলের উদ্দেশে।

টাইম-টেবল দেখেই পরিকল্পনাটা খাড়া করেছেন। অবশ্য এতে ঘুরিয়ে নাক ধরতে হচ্ছে, তা হোক। পুলিশকে যত বিপথে পাঠান যায়, ততই ভাল। ব্যাণ্ডেল থেকে ব্লাকডায়মণ্ড ধরবেন। মাঝে কোন স্টপেজ নেই। ঝড়ের বেগে পৌঁছে যাবেন কলকাতা।

ভাবতে ভাবতে বাসার সামনে পৌঁছে গেছেন—রিক্সাওয়ালার ডাকে চমক ভাঙল। পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই অবাক হয়ে গেলেন। রাস্তা ঘেঁসে আরেকটা রিক্সা দাঁড়িয়ে। নির্বিকার মুখে তাতে বসে রয়েছে অপর্ণা। চিন্ময় বিলক্ষণ বিরক্ত হলেন। এই ধরনের বোকামির কোন মানে আছে? তিনি একরকম না দেখার ভান করেই এগোলেন। দ্রুত হাতে তালা খুলে ঢুকে গেলেন ভেতরে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই অপর্ণা এল। বলল উষ্মার সঙ্গে, ব্যাপার কি? আমায় যেন চিনতে পারলে না।

ঠিক তাই। ভারি গলায় চিন্ময় বললেন, শেষবার যখন দেখা হয়েছিল, বলেছিলাম তোমায়, আমার কাজের জায়গায় আসবে না। তোমায় এখন

কেউ চিনে ফেললে পরে তুমিই ঝামেলায় পড়বে। আমাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে কাজটা করতে দাও।

আমি এদিকটা ভেবে দেখি নি। অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে—ভাবলাম, তোমার সঙ্গে আরেকবার আলোচনা করি গিয়ে।

আলোচনা করার আর কিছু নেই। কাজটা শেষ করে এনেছি।

ঝলমলিয়ে উঠল অপর্ণা, সত্যি! কবে?

আজই। টাকাটা আমার হাতের মুঠোয়।

সত্যি বলছ?

চিন্ময় দত্ত অকারণে মিথ্যা বলে না। তিন লাখ পয়ষট্টি হাজার টাকা এখন আমাদের।

বল কি! এত টাকা?

চিন্ময় মুখে হাসি টেনে বললেন হ্যাঁ ম্যাডাম, টাকার অঙ্কটা ওই। এখন যা বলি মন দিয়ে শোন। সময় নষ্ট না করে এখনই স্টেশনে চলে যাও। প্রথম যে লোকাল পাবে, তাতেই কলকাতা রওনা দেবে। তোমার কর্তা এখন কোথায়?

বজবজ গেছে। আজ ফিরবে না।

তাহলে তো কোন সমস্যাই নেই। কাপড়-চোপড় স্যুটকেশে গুছিয়ে নেবে। আটটার সময় রওনা দেবে আমার বাসার উদ্দেশে। আমি তার আগেই কলকাতা পৌঁছে যাব। আগে অন্যরকম ভেবেছিলাম। বিশেষ কারণে প্ল্যানটা বদলাতে হল।

তুমি তাহলে সবই গুছিয়ে ফেলেছ? ভারি ভাল লাগছে আমার।

আর কথা নয়। হাতে সময় কম। বেরিয়ে পড় এইবেলা।

অপর্ণা বেরিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে হর্নের আওয়াজ পাওয়া গেল।

নরেন গাঙ্গুলীর ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এসেছে। চিন্ময় বাইরে এসে ড্রাইভারের সঙ্গে দু'চার কথা বললেন। তারপর দশটা টাকা দিয়ে বিদায় করলেন তাকে। দ্রুত হাতে জামা-কাপড়ে ভরা স্যুটকেশটা গাড়িতে তুললেন। দরজায় তালা লাগাতে ভুললেন না। নিত্য-প্রয়োজনীয় অনেক কিছু বাসায় পড়ে রইল। কিছু করার নেই থাক পড়ে।

চিন্ময় গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

বাজারকে পেছনে ফেলে সবে কয়েক পা এগিয়েছেন, মেঘ ডেকে উঠল।

আকাশের দিকে তাকালেন নরেন গাঙ্গুলী। ঘন মেঘ পুব দিক থেকে এগোচ্ছে সারা আকাশকে গ্রাস করতে। বৃষ্টি এল বলে।

সোমেন কলকাতায় ফিরবে—গাঙ্গুলীও স্থির করলেন, সন্ধ্যার মুখে বর্ধমান রওনা হয়ে পড়বেন। ভাগ্নের অ্যাক্সিডেণ্ট মনের মধ্যে খুঁতখুঁতনি জাগিয়ে রেখেছে। তুই বিপরীতমুখী যাত্রীকে ট্রেনে তুলে দিতে চলেছেন তালুকদার। স্টেশন দূরে নয় বলেই তিনজনে হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছেন।

বাজারে ঢোকার আগেই সোমেন দেখেছে রিক্সায় চেপে অপর্ণাকে যেতে। মন উসখুস করছে। চিন্ময়ের সঙ্গে আশাব্যঞ্জক কোন কথা হয়েছে কিনা কে জানে। বাজার পেরোবার পর স্থির করে ফেলল, এবার এঁদের কাছ থেকে কেটে পড়তে হবে।

গলা ঝেড়ে নিয়ে সোমেন বলল, আপনারা আসুন। আমি এগিয়ে যাচ্ছি।

কেন ?

তালুকদার অবাক হলেন।

এগিয়ে যাবে কেন ?

মনে ছিল না—একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। মিনিট কয়েকের ব্যাপার। আসছি স্টেশনে।

কেউ কিছু বলার আগেই সোমেন হনহন করে এগিয়ে গেল।

মৃদু হেসে গাঙ্গুলী বললেন, নেশাখোরদের এই অসুবিধা। বড়দের সম্মান দেখাতে গিয়ে কতক্ষণ আর নেশা চেপে রাখবে বল ?

বললেই তো পারত। আমরা সিগারেট খাবার অনুমতি দিয়ে দিতাম।

তুজনে সিগারেট ধরালেন।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গজ পঞ্চাশেক এগোবার পর-তুজনে একই সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এক সারি গাছের ফাঁক দিয়ে ব্যাঙ্কের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। দরজার সামনে দাঁড় করানো রয়েছে নরেন গাঙ্গুলীর ফিয়াট। কেরিয়ার হাঁ করে রয়েছে। চিন্ময় দ্রুতহাতে একটা স্যুটকেশ রাখলেন। তারপর বন্ধ করলেন কেরিয়ারের ডালা। এই সময় ব্যাঙ্কের দরোয়ানকে আসতে দেখা গেল। সে চিন্ময়ের হাতে এক প্যাকেট সিগারেট দিল। চিন্ময় কি বললেন দরোয়ানকে। সেও কি যেন বলল। চিন্ময় আর কিছু না বলে ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

ভ্রূ কুঁচকে গাঙ্গুলী বললেন, ব্যাপারটা কি ?

আমিও তাই ভাবছি।

লোকটা চাঁদপুর যাবে বলেছিল না, গেল তা ব্যাণ্ডেলের দিকে।

চিন্তিত গলায় তালুকদার বললেন, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল, এই অসময়ে ব্যাঙ্ক থেকে একটা স্যুটকেশ বার করে গাড়িতে রাখল কেন? নিজের মালপত্র হলে বাসা থেকে তুলবে, এখানে কি?

গোলমাল লাগছে। অবশ্য গবেষণা চালিয়ে এখন আর লাভ নেই। তাড়াতাড়ি পা চালাও। বৃষ্টি এসে গেল।

টিপটিপ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ওঁরা দুজনে প্রায় দৌড়তে আরম্ভ করলেন। স্টেশনে পৌছবার পরই অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি নামল। ভাগ্যক্রমে কলকাতাগামী লোকাল ট্রেন তখনই প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করছে।

চিন্ময়ের বকুল বাগানের বাসায় অপর্ণা পৌছল সাড়ে ন'টার সময়। বারকয়েক এখানে এসেছে আগে। গতবার তো তার বেসুরে গাওয়া গান টেপ করেছিল চিন্ময়। তার পাল্লায় পড়ে দামী জিনিস সবই বেঁচে ফেললেও, টেপরেকর্ডারটা রেখে দিয়েছিল। ভারি সখের জিনিস।

পূর্ব কথামত অনেক আগেই অপর্ণার আসবার কথা। দারুণ বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাস্তায় থৈ থৈ জল—বাস-ট্রাম বন্ধ। ট্যাক্সিগুলোও বেমালুম গা ঢাকা দিয়েছিল। সাড়ে আটটার সময় বৃষ্টি থামল। অরুণের তখনো দেখা নেই। সোমেনের আসার সম্ভাবনাও ছিল। দেরি হয়ে গেছে—সাত-পাঁচ ভেবে অপর্ণা বেরিয়ে পড়ল। রাস্তার জল তখন দ্রুত সরে যাচ্ছে। ভাগ্যক্রমে ট্যাক্সি পাওয়া গেল মোড়ের মাথায়।

বকুল বাগানের এই ফ্ল্যাটবাড়িটা মোটামুটি নির্জন। উচ্চ মধ্যবিত্তদেরই এখানে বাস। লঘু পায়ে দোতলায় উঠল অপর্ণা। সত্যি যদি টাকা এনে থাকে, আজ রাতটা ওকে কোন রকমে আটকাতে হবে। অরুণের সঙ্গে আর দেখা না হওয়ায় এই ঝামেলাটা দেখা দিয়েছে। নইলে এখন সে অপর্ণার সঙ্গে চলে আসতে পারত। তারপর যেভাবেই হোক, দুজনে সরে পড়ত টাকাটা নিয়ে।

এগার নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে অপর্ণা থামল। দরজার সঙ্গে আটকানো কালো প্লেটের ওপর সাদা প্লাস্টিকের অক্ষরে চিন্ময়ের নাম লেখা। এক পাশে কলিং পুস। অপর্ণা পুসে আঙুল ঠেকাল। আবার। দরজা খুলল না। বেলটা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

পাল্লায় হাত রাখতেই খুলে গেল।

অপর্ণা ভেতরে ঢুকল। আলো জ্বলছে। দু' কামরার ফ্ল্যাট। পাশের ঘরেও আলো জ্বলছে। চিন্ময় বোধহয় বাথরুমে। বাইরের দরজা বন্ধ করার পর, অপর্ণা ঘরখানা ভাল করে দেখে নিল। আগেকার মতই ছিমছাম। টেপরেকর্ডারটা যথারীতি সেন্টারটপের ওপর রাখা।

ছায়াচ্ছন্ন মনে সোফার পাশ দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল অপর্ণা। ছিমছাম এই শোবার ঘরেও কেউ নেই। সংলগ্ন বাথরুমের দরজা সঙ্গত কারণেই বন্ধ থাকার কথা। কিন্তু খোলা রয়েছে। আলো দেখা যাচ্ছে আধ-ভেজানো পাল্লার ফাঁক দিয়ে।

অপর্ণা এগিয়ে গিয়ে আধ-ভেজানো দরজার পাল্লা আলতো ভাবে ঠেলে দিল। বাথরুমের ভেতরে ঢুকতে গিয়েই থামতে হল ওকে।

একি !!

প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল অপর্ণা। নিজেকে সামলে নিল কোন রকমে। মাথা ঝিমঝিম করতে আরম্ভ করেছে। অবিশ্বাস্য দৃশ্য তার চোখের সামনে প্রসারিত। বেসিনের ঠিক নিচেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন চিন্ময় দত্ত। মাথায় চাপ চাপ রক্ত। মেঝেতেও গড়িয়ে এসেছে কিছুটা। সে রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে উঠছে ক্রমেই।

শরীরের মধ্যে অপর্ণার গুলিয়ে উঠল। মরে গেছে নাকি? দ্রুত সরে এল বাথরুমের কাছ থেকে। ঘামের জোয়ার শরীরকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রায় দৌড়ে শোবার ঘর পেরিয়ে বসার ঘরে এসে দাঁড়াল অপর্ণা। মনে হচ্ছে চিন্ময় মরে গেছে—কেউ খুন করেছে ওকে।

আর এখানে অপেক্ষা করা বিবেচনার পরিচায়ক নয়। যে কেউ যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। তখন সে হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত হতে বাধ্য। পুলিশ আসবে—না, না—, অপর্ণা দ্রুত বেরিয়ে এল চিন্ময়ের ফ্ল্যাট থেকে। ভাগ্যক্রমে তখন বারান্দায় কেউ নেই।

দুশো একচল্লিশের কে হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটে তখন আলস্য বিরাজ করছে। ভাগাভাগি করে দৈনিকপত্র পড়া শেষ হয়েছে সবেমাত্র। বাসব হোয়াট নটের দিকে তাকিয়ে হাই তুলল। শৈবালের দৃষ্টি সেন্টার টেবিলের ওপর রাখা তাসের প্যাকেটের ওপর।

ভাবছি, চা খাওয়া ছেড়ে দেব।

শৈবাল বিস্মিত গলায় বলল, চায়ের অপরাধ?

অপরাধ চায়ের নয়। কথাটা হচ্ছে, একটা নেশাকে জড়িয়ে থাকা কি ভাল?

একেবারেই ভাল নয়। তবে চায়ের ওপর কোপটা শুধু মারছ কেন? টোবাকো হ্যাবিটটাও ছাড়ো।

বাসব উচ্চ লয়ে হাসল: আসল জায়গায় কোপটা তুমি মারলে ডাক্তার।

বাহাদুর দু'কাপ চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল এই সময়।

মুখে হাসি টেনে শৈবাল বলল, ভারি অবিবেচকের মত কাজ করে ফেলেছে বাহাদুর। শেষবারের মত চা'টা খেয়ে ফেলবে নাকি?

অগত্যা।

চা পর্ব শেষ হল ক্রমে।

শৈবাল সোফার একপাশে পড়ে থাকা দৈনিকপত্রের দিকে তাকিয়ে বলল, জনতা পার্টির কচাকচি ছাড়া কাগজে আজকাল পড়ার মত কিছু থাকে না।

মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে নিয়ে বাসব বলল, যা বলেছ। মোরারজী আর চরণ সিংকে ঘিরে যে কাণ্ডকারখানা চলেছে, তার নজির তুমি হিন্দী সিনেমাতেও পাবে না। তবে ভাগ্যক্রমে আজকে আমাদের মনকে নাড়া দেয়, এমন একটা সংবাদ রয়েছে।

আমি তো লক্ষ্য করলাম না।

কাগজ খুঁটিয়ে পড়তে হয় ডাক্তার। পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দেখ।

শৈবাল ভাঁজ করা কাগজটা তুলে নিয়ে পাতা উল্টে নির্দিষ্ট কলমে চোখ বোলাল। হেডিং চিত্তাকর্ষকই বলা চলে—পৌনে চার লাখ টাকা সহ ব্যাঙ্ক ম্যানেজার উধাও।—অর্ধ কলমব্যাপী সংবাদটা শৈবাল দ্রুত পড়ে শেষ করল।

এরকম ঘটনা আগে ঘটে নি বলতে চাও?

বাসব পাইপে মৃদু টান দিয়ে বলল, টাকার অঙ্ক বেশী বলেই একটু গুরুত্ব পেতে বাধ্য। তাছাড়া কিছু চিন্তার খোরাকও রয়েছে।

কি রকম?

সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় এক ব্যবসাদারের কাছ থেকে গাড়ি চেয়ে ওই ব্যাঙ্ক ম্যানেজার কোথাও যাবার পরিকল্পনা করেছিল। অথচ গাড়িখানাকে পাওয়া গেছে স্থানীয় স্টেশনের সামনে। এর মানে কি? টাকা হাতাবার পর, লোকটা গাড়িতে চেপে বহুদূর পালিয়ে যেতে পারত। তা না করে গাড়িটা ওখানে

ফেলে রাখল কেন? আসলে গাড়িটা চাওয়া হয়েছিল, তাড়াতাড়ি অনেক দূর সরে পড়বার জন্যই তো?

শৈবাল বলল, তুমি ঠিকই বলছ। পরিকল্পনা তাই ছিল। কোন কারণে হয়তো শেষ দিকে ওটা বাতিল করতে হয়। তারপর ম্যানেজার স্থানীয় স্টেশন থেকে কলকাতা বা আর কোথাও রওনা হয়ে গেছে।

না ডাক্তার, আমার মন বলছে, ব্যাপারটা এত সোজা নয়। চিন্তার খোরাক আছে। ঘটনাটা কলকাতায় হলে নেড়েচেড়ে দেখার সুযোগ ছিল। কিন্তু—

বাসবের কথা শেষ হবার আগেই বাইরে গাড়ি থামার শব্দ পাওয়া গেল. ভারী পায়ের শব্দ তুলে তারপর যিনি ড্রইংরুমে প্রবেশ করলেন, তিনি আর কেউ নন, হোমিসাইড বিভাগের সুবিখ্যাত বড়কর্তা পুরন্দর সামন্ত। তাঁর মুখে স্বভাবসিদ্ধ হাসি।

আপনাদের দেখলে হিংসা হয়।

কথাটা বলতে বলতে সামন্ত বসলেন।

কেন —বাসব বলল, আমাদের অপরাধ?

কেমন বসে বসে গল্প করছেন দুজনে। চিন্তা নেই, ভাবনা নেই—

ঝঞ্ঝাট নেই, ঝামেলা নেই —আর আপনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, ক্লান্ত সৈনিকের মত নিজের ডিউটি করে চলেছেন—এই তো?

একশ বার তাই। বাহাদুর কোথায় গেল?

শৈবাল বলল, আপনি কি বাহাদুরকে চায়ের কথা বলবেন?

বলতাম তাই।

অন্য কিছু বলুন। কিছুক্ষণ আগে আমরা শেষবারের মত চা খেয়ে নিয়েছি তারপরই এবাড়ি থেকে চায়ের পাট উঠে গেছে।

হঠাৎ

গৃহকর্তা এই রকমই স্থির করেছেন।

বাসব দ্রুত গলায় বলল, আসল কথাটা হচ্ছে—দেখ ডাক্তার, মাঝে মধ্যে এধার ওধার হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। মিস্টার সামন্তের অনারে আমরা আরেকবার চা স্বচ্ছন্দে খেতে পারি।

সাধু—সাধু—

শৈবাল বাহাদুরের উদ্দেশে আসন ছেড়ে উঠে পড়ল।

সামন্ত বললেন, বকুল বাগান যাচ্ছি। চায়ের পাট চুকিয়ে যাবেন ওখানে ?

কোন প্যাঁচালো ব্যাপার ওখানে ঘটেছে নাকি ?

ব্যাপারটা একটু বেয়াড়া ধরনের। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কয়েক লাখ টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যাবার ঘটনাটা আজকের কাগজে পড়েছেন কি ?

হ্যাঁ। ঘটনাটা নিয়ে কিছুক্ষণ আগে আমার আর ডাক্তারের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। লোকটার সন্ধান পেয়েছেন নাকি ?

তার ডেডবডি পাওয়া গেছে। খুন হয়েছে লোকটা।

বিস্মিত গলায় বাসব বলল, বলেন কি ? টাকাগুলো—

উধাও। লোকটার নাম চিন্ময় দত্ত। বকুল বাগান রোডের একটা ফ্ল্যাটে থাকত। ইদানিং অবশ্য নিয়মিত থাকত না। ছুটিছাটায় আসত কর্মস্থল থেকে। গতকাল সকালে ওই বাড়ির কয়েকজন বাসিন্দা দত্তর ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা থাকতে দেখে অবাক হয়ে খোঁজ-খবর আরম্ভ করেন। মৃতদেহ আবিষ্কার হয় তখনই। ওঁরাই খবর দেন পুলিশকে।

আপনারা তারপর খোঁজ-খবর নিতেই ব্যাঙ্ক ডাকাতির যোগসূত্রটা দেখতে পান ? কাউকে সন্দেহ করছেন ?

তেমন কাউকে এখনো হাতের কাছে পাইনি। ম্যানেজারের কর্মস্থলে খোঁজ-খবর নিতে স্থানীয় পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। টাকাটা নিয়ে যে সরে পড়েছে, খুন করেছে সেই।

নিঃসন্দেহে। এতে একটা দিক পরিষ্কার হয়ে গেল। ম্যানেজার যে ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর টাকা সরাতে যাচ্ছে, একথা আরেকজন জানত। সে এমন একজন, যার সঙ্গে ম্যানেজারের গভীর হৃদ্যতা ছিল। হয়তো সেই লোকটাই ম্যানেজারের সাহায্যকারী।

হতে পারে। তবে গোলমালটা কোথায় জানেন, খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পেরেছি, চিন্ময় দত্তর কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। বন্ধু-বান্ধবও নাস্তি।

বান্ধবী ?

মৃদু হেসে সামন্ত বললেন, ডেডবডির অবস্থা দেখলে আপনি বুঝতে পারতেন, কোন বান্ধবীর পক্ষে ওইভাবে খুন করা সম্ভব নয়।

সেই বান্ধবীর অন্য কোন পুরুষ বন্ধু থাকতে নিশ্চয় বাধা নেই ?

তা অবশ্য নেই।

বাসব পাইপে মিক্সচার ভরে নিয়ে বলল, ফরাশি পুলিশের সেই সাবেকি

কথাটা আমাদের ভুললে চলবে না। খুনের কেস হাতে এলেই ওরা প্রথমে বলে, মেয়েটার সন্ধান কর। এই কেসেও বোধহয় মেয়েটার সন্ধান করা দরকার।

সামন্ত কথাটাকে তেমন আমল দিলেন বলে মনে হল না। হালকা গলায় বললেন, ওদের দেশের ব্যাপার-স্যাপার আলাদা। এই কেসে আমার মনে হয় না, কোন মেয়েলী হাতের কারুকার্য আছে।

বাহাদুর ট্রে-হাতে এসে উপস্থিত হল। সঙ্গে শৈবাল।

চা এবং টা শেষ করতে মিনিট পনেরো সময় লেগে গেল। তারপর সামন্ত ওদের নিয়ে বেরোলেন। বকুল বাগানের ফ্ল্যাট বাড়িতে পৌছবার পর, অনেক-জোড়া কৌতূহলী দৃষ্টিকে পাশ কাটিয়ে তিনজনকে চিন্ময় দত্তর ফ্ল্যাটে ঢুকতে হল। স্থানীয় থানার অফিসার ইনচার্জ বিজয় মিত্র উপস্থিত রয়েছেন ওখানে। তিনি একা নন, হোমিসাইড স্কোয়ার্ডেরও কয়েকজন রয়েছেন।

সামন্ত প্রশ্ন করলেন, দেবনাথ, নতুন কোন খবর-টবর আছে নাকি?

চালাক চতুর চেহারার উদয় দেবনাথ বলল, ভিকটিমের আগের অফিসে গিয়েছিলাম। কলিগদের মুখে শুনলাম, গত দু বছরে লোকটা বাড়াবাড়ি রকমের খরচপত্র করেছে।

কি রকম?

গড়িয়ায় একটা বাড়ি ছিল। সেটা বিক্রি করে দেয়। তারপর প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে ধার নিতে আরম্ভ করে।

কিসে এত খরচপত্র করত, জানতে পেরেছ?

না, স্যার। তবে রেসের নেশা ছিল না, মদও খেত না, একথা সকলেই হলফ করে বলল।

বাসবের মুখের অর্থপূর্ণ হাসিটা সামন্ত এবার দেখতে পেলেন।

আপনার কি মত, মিস্টার ব্যানার্জি?

আমার মত তো আগেই দিয়েছি—বাসব বলল, যে লোক জুয়া না খেলে বা মদ না খেয়ে সর্বস্বান্ত হয়, বুঝতে হবে তার নেশাটা হল মেয়েমানুষের। ফরাশি পুলিশ অকারণে ওই বিশেষ কথাটা চালু করে নি। যা হোক, আপনি অনুমতি করলে, দত্তর জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে সূত্রের সন্ধান দেখতে পারি।

বেশ তো। আপনি আপনার সুবিধা মত কাজ আরম্ভ করুন না।

বাসব ঘরখানা খুঁটিয়ে দেখল। বাজারের চালু কোচ সোফা দিয়ে ঘরখানা সাজানো। একধারে দিল্লী সেফের একটা আলমারি। টপের ওপর টেপরেকর্ডারটা

রাখা। ধুলোর আস্তরণ পড়েছে তার ওপর। আলমারি খুলে বাসব জামা-কাপড়গুলো নেড়েচেড়ে দেখল। কয়েকটা ফাইল রয়েছে। কাজে লাগে এমন কিছু পাওয়া গেল না ফাইলগুলোতে। গোটা দশেক ক্যাসেট দেখতে পাওয়া গেল। নেড়েচেড়ে ওগুলো রেখে দিল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, ঘরগুলো ডাস্ট করানো হয়েছে?

সামন্ত বললেন, হ্যাঁ। বেশ কয়েকজনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে।

বাসব এবার পাশের ঘরে এল। সুদৃশ্য চাদর দিয়ে ঢাকা খাট জানালার ধার ঘেঁসে রয়েছে। এক নজরেই বুঝতে পারা যায়, বেশ কিছুদিন ওই বিছানা কেউ ব্যবহার করে নি। আরামদায়ক চেয়ারখানা খাটের অপরপ্রান্তে রয়েছে। এছাড়া ঘরে আর কোন আসবাব নেই। অবশ্য চেয়ারের একপাশে একটা সুটকেশ রাখা রয়েছে।

সুটকেশটা তুলে নিয়ে বাসব খাটের ওপর রাখল। চাবি লাগানো নয়। ডালা খুলতে অসুবিধা হল না। জামা-কাপড় আর নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র ছাড়া পাওয়া গেল একটা ডায়রী। ডায়রীর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বাসবের বিরক্ত ধরে গেল। কাজে লাগে, এমন একটা লাইন কোথাও নেই। এবার ওকে মন দিতে হল, ডায়রীর সঙ্গে যুক্ত ঠিকানা লেখার অংশে, মোট ন'টা ঠিকানা আছে। তার মধ্যে একটা বাসবকে সচকিত করে তুলল। ডায়রীটা হাতে নিয়েই ও পাশের ঘরে চলে এল।

মিস্টার সামন্ত, এই মহিলাকে বোধহয় আমরা খুঁজছি।

কোন মহিলা?

বাসব সামন্তর পাশে গিয়ে বসতে বসতে বলল, অপর্ণা সোম। এতে ঠিকানা আর ফোন নম্বর দুটোই রয়েছে।

হয়তো উনি দত্তর কোন আত্মীয়া।

হতে পারে। আবার নাও হতে পারে তো। খোঁজ নিয়ে দেখুন। বরং এক কাজ করা যেতে পারে। আমি মহিলার সন্ধান দেখছি। আপনি বাকি যে আটজনের ঠিকানা রয়েছে, তাদের খোঁজ নিন।

বেশ।

ডায়রী থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বাসব অপর্ণার ঠিকানাটা লিখে নিল। তারপর টেপরেকর্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল, দামী জিনিসটার ওপর ধুলো জমেছে। ভাল কথা, পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা কাছে আছে নাকি?

কাছে নেই, তবে সারাংশটা বলতে পারি।

ক'টার সময় দুর্ঘটনা ঘটেছে?

সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। মাথার পেছন দিকে প্রথম আঘাত লাগে। দ্বিতীয়বার মাথার মাঝখানে। মৃত্যু ওতেই হয়েছে।

শেষবারের মত দত্তকে কখন দেখা যায়?

ব্যাঙ্কের সামনে। তখন সাড়ে পাঁচটা।

ওখান থেকে কলকাতার দূরত্ব কতটা?

ট্রেনে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে।

বাসব হাই তুলে উঠে দাঁড়াল।

এখন চললাম মিস্টার সামন্ত। অপর্ণা সোমের খোঁজ-খবর আমি নিচ্ছি। আপনি বাকিদের খোঁজ-খবর নিন। ফলাফল জানাবেন। এস ডাক্তার।

ওরা চিন্ময় দত্তর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল।

বাসবকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। কোন কথা হল না দুজনের মধ্যে। নিচে নেমে এসে, বকুল বাগানকে পেছনে ফেলে ওরা 'ভারতী'র সামনে এসে দাঁড়াল।

ভাগ্যক্রমে ট্যাক্সি পাওয়া গেল কয়েক মিনিট পরেই।

ট্যাক্সিতে উঠে বসার পর শৈবাল প্রশ্ন করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

অপর্ণা সোমের ওখানে।

ড্রাইভারকে সেই মত নির্দেশ দিল বাসব।

ভীষণ চুপচাপ। মনে হচ্ছে, কেসটা তোমায় ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছে?

কেসের গভীরে এখনো নামিনি। আমি ভাবছি অন্য কথা। বুঝলে ডাক্তার, দত্তর ফ্ল্যাটে একটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছি।

অসঙ্গতি—

হ্যাঁ। তবে অসঙ্গতিটা যে কোথায়, সেটাই মনে করতে পারছি না। অবিরাম তাই ভেবে চলেছি। হয়তো ওই অসঙ্গতিই এই কেসের একটা বড় রকম সূত্র।

মনে করতে পারছ না?

একেবারেই না। আমার মেমারী যে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে, আগে কে জানত। ভারি অস্বস্তি বোধ করছি।

অপর্ণা সোমের বাসায় পৌঁছবার আগে পর্যন্ত আর কোনো কথা হল না।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বাসব দরজার কড়া নাড়ল। দরজা খুলে একজন স্মার্ট চেহারার ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বয়স আন্দাজ চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ।

আপনারা—

অপর্ণা সোম এখানে থাকেন?

তিনি আমার স্ত্রী। কি ব্যাপার বলুন তো?

আপনার নামটা জানতে পারি?

অরুণ সোম।

বাসব নিজের পরিচয় দেবার পর বলল, একটা তদন্তের ব্যাপারে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

অরুণ সচকিত হল। তার বুঝে উঠতে অসুবিধা হল না, কোন কেসের সূত্র ধরে এই ভদ্রলোক এখানে এসেছেন। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে ঝামেলার। অবশ্য ঘাবড়ে গেছে এমন ভাব দেখালে এখানে চলবে না।

কি সমস্ত বলছেন? আমি তো—

শুনুন মিস্টার সোম, অনর্থক কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। আমি খোঁজ খবর নিয়েই এসেছি। আপনার স্ত্রী চিন্ময় দত্তকে ভালই চিনতেন। আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে উনি ভাল কাজ করবেন। নইলে পুলিশ আসবে। অনেক কমপ্লিকেশন দেখা দেবে। তখন আতান্তরের সীমা থাকবে না।

বাসব জানে, এসমস্ত ক্ষেত্রে ধাপ্পা দিয়ে কথা না বললে উদ্দেশ্য সফল হয় না।

অরুণ কিছু বলতে যাচ্ছিল, অপর্ণাকে ঘরে ঢুকতে দেখে চুপ করে গেল। অপর্ণা নিশ্চয় এতক্ষণ ওধারে দাঁড়িয়ে এদের কথা শুনছিল।

অপর্ণার দিকে চোখ পড়তেই বাসব বলল, নমস্কার মিসেস সোম। চিন্ময় দত্ত খুন হয়েছেন। তাঁর ডায়রীতে আপনার সম্পর্কে অনেক কথা লেখা রয়েছে দেখলাম।

তীক্ষ্ণ গলায় অপর্ণা বলল, কার ডায়রীতে আমার সম্পর্কে কি লেখা আছে, তার জন্য নিশ্চয় আমি দায়ী নই। তাছাড়া আপনি এমন কি মহামান্য ব্যক্তি যে আপনার প্রশ্নের উত্তর আমায় দিতেই হবে?

আমি সামান্য গোয়েন্দা। এই কেসে পুলিশকে সাহায্য করছি। লালবাজারে ফোন করলেই, হোমিসাইড স্কোয়াডের বড়কর্তা পুরন্দর সামন্ত আমার উক্তি সমর্থন করবেন। এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি দেবেন না, তা আপনার ইচ্ছে। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখি, ঝামেলার মুখোমুখি যদি না হতে চান—সহযোগিতা করুন।

আপনি কি মনে করেন, আমি দত্তকে খুন করেছি ?

এখনই মনে করি না। এখন আমি আপনার কাছ থেকে দত্ত সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে চাই।

আমাদের সঙ্গে আলাপ ছিল। বন্ধু হিসাবে এখানে যাওয়া-আসা করতেন, এই পর্যন্ত।

আপনি ওর ফ্ল্যাটে কখনো যান নি ?

অরুণ বলে উঠল, ও কেন যাবে ওখানে ?

না গিয়ে থাকলেই ভাল। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখি, পুলিশ দত্তর ফ্ল্যাট ডাস্ট করিয়েছে। কয়েকটা ফিঙ্গারপ্রিণ্ট পাওয়া গেছে। তার মধ্যে কোনটার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর হাতের ছাপ যদি মিলে যায়, তাহলে কিন্তু উনি ভারি বেকায়দায় পড়ে যাবেন। তাই বলছিলাম, আমাকে সমস্ত খুলে জানান। সম্ভব হলে একমাত্র আমিই ওকে বাঁচাতে পারি।

অপর্ণা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে বাসবের কথা শুনছিল। তার মনের মধ্যে তখন ভয় আর আশঙ্কা ওঠা নামা করছে। শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা এমন দাঁড়াবে, আগে কে ভেবেছিল ?

বলল কিন্তু ধীর গলায়, বেশ। আমি সব কথাই বলছি। তবে একথা ঠিক খুনের সঙ্গে আমাদের প্ল্যানের কোন সম্পর্ক নেই।

বলুন। ছোটখাটো কোন কথাও বাদ দেবেন না। অরুণবাবু, আপনি এখন এখানে না থাকলে ভাল হয়।

গম্ভীর মুখে অরুণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা।

বাসব গভীর চিন্তায় মগ্ন।

এক রাউণ্ড পেসেন্স খেলা এই মাত্র শেষ করল শৈবাল। তাস সাফ্‌ল্ করতে করতে বলল, কি এত ভাবছ ? কালকের সেই অসঙ্গতি ভূত এখনো ঘাড় থেকে নামেনি নাকি ?

না, ভাই। ভারি ভাবিয়ে তুলেছে। মন বলছে, দত্তর ফ্ল্যাটে এমন কিছু দেখেছি, যা আমাদের কাজে লাগবে। কিন্তু সেই বিশেষ দেখাটা যে কি, এত ভেবেও মনে করতে পারছি না।

টেলিফোন বেজে উঠল।

বাসব উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে নিতেই সাড়া পেল পুরন্দর সামন্তর : হ্যালো, দত্তর ডায়রীতে পাওয়া ঠিকানাগুলোতে নক করা হয়েছে—ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্মচারি —ওদের কাছ থেকে কাজে লাগাবার মত কোন তথ্য পাওয়া যায় নি—আপনার কতদূর—

অপর্ণা সোমের কাছে গিয়েছিলাম—অনেক কথা জানতে পারা গেছে, আপনাকে পরে সব জানাচ্ছি—শুনুন, আমি কাল সকালেই দত্তর কর্মস্থলে যেতে চাই—

স্থানীয় থানাকে আপনার কথা জানিয়ে রাখব কি—

খুব ভাল হয়—একজন পুলিশ কর্মচারি সঙ্গে না থাকলে কেউ আমল দিতে চাইবে না—

আমি আধঘন্টার মধ্যে ওখানে খবর পাঠাচ্ছি।

ধন্যবাদ—ফিরে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করব—এখন ছাড়লাম।—বাসব রিসিভার নামিয়ে রাখল।

আকাশ বেশ মেঘলা। স্টেশনে নেমেই বাসব ঘড়ির দিকে তাকাল, আটটা কুড়ি। শৈবালও সঙ্গে আছে। ওভারব্রীজ পার হয়ে ওরা বাইরে এল। এখন গন্তব্য পুলিশ স্টেশন। রিক্সায় চেপে ওখানে পৌছতে দশ মিনিটের বেশী সময় লাগল না।

থানার কর্তা বিজয় কর্মকার অফিসেই ছিলেন। মাঝারি সাইজের লোক। শরীরে তেমন মাংস নেই। দেখে শুনে মনে হয় রিটায়ারের মুখে এসে থেমেছেন। বাসবের পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন বলে মনে হল না। ভ্রূ-কুঁচকে দৃষ্টি হানলেন কয়েকবার। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, কি করতে পারি আপনাদের জন্যে ?

আমাকে সঙ্গ দেবেন শুধু। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করব। আপনি সঙ্গে থাকলে কথাবার্তা বলতে সুবিধা হবে।

যত ঝামেলা আমার ঘাড়ে। কাজ-কর্ম চুলোয় গেল, আপনাদের পিছু পিছু আমাকে ঘুরে বেড়াতে হবে।

বাসব ভারি গলায় বলল, ঠিক আছে। আপনাকে বাদ দিয়েই আমরা কাজে নেমে পড়ছি। কলকাতায় ফিরে গিয়েই আমি কিন্তু আই-জি'র সঙ্গে দেখা করব। এই অসহযোগিতার মূল্য তখন আপনাকে প্রচণ্ডভাবে দিতে হবে

বিজয় কর্মকার চেয়ার থেকে প্রায় ছিটকে সরে এসে গলা নামিয়ে বললেন, সে কি কথা ! আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করব না কখন বললাম ? কি করতে হবে বলুন ?

জায়গা মত ঘা পড়েছে বোঝা গেল। নরেন গাঙ্গুলী আর প্রশান্ত তালুকদারের ঠিকানা বাসব নিয়ে এসেছিল। বিজয় কর্মকারকে সঙ্গে নিয়ে ওদের উদ্দেশেই রওনা হল। ওদের গ্রসারির জমজমাট ব্যবসা। দুজনকেই পাওয়া গেল আড়তের অফিস ঘরে। বাসবের পরিচয় পেয়ে দুজনে খুশি হলেন। হাঁকডাক করে চায়ের অর্ডার দিলেন।

বাসব বলল, ইতিমধ্যে নিশ্চয় শুনেছেন, চিন্ময় দত্তকে খুন করা হয়েছে। ওই খুনের ব্যাপারেই আমি আপনাদের সহযোগিতা চাইছি।

নরেন গাঙ্গুলী বললেন, এমন যে হবে ভাবতেই পারি নি। ভদ্রলোককে চিনতাম আমরা। সদালাপী। তাঁর মনে যে এমন পাপ লুকিয়ে ছিল, কে জানত।

মানুষ চেনা সহজ ব্যাপার নয় মিস্টার গাঙ্গুলী। টাকাটা নিয়ে সরে পড়বার পর তাকে কেউ খুন করেছে! এখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে, যেভাবে হোক ব্যাঙ্কের টাকা উদ্ধার করা, আর খুনীকে ধরা।

বটেই তো—তালুকদার বললেন, এ ব্যাপারে আমাদের যে কোন রকমের সহযোগিতা আপনি পাবেন।

ধন্যবাদ। আচ্ছা সোমেনবাবুর ঠিকানাটা কি ?

সে কিছু করেছে নাকি ? অবশ্য ওর পাস্ট রেকর্ড ভাল নয়। জেলে ছিল কিছুদিন। কিন্তু সোমেনের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আপনাকে কে বলল ?

একজন মহিলার মুখ থেকে শুনলাম।

তাই নাকি! আমি চিনি মহিলাকে ?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, না। ওঁর ঠিকানাটা—

মানিকতলায় থাকে—তালুকদার বললেন, ভাগ্যক্রমে গত রাত্রে সে এখানে এসেছে। ডেকে পাঠাব ?

ভাল হয়।

তালুকদার একজন কর্মচারিকে পাঠালেন সোমেনের উদ্দেশে।

নরেন বললেন, বিজয়বাবু একেবারে চুপচাপ যে ? আমরা তো ভেবেছিলাম, টাকাগুলো আপনি আগেই উদ্ধার করে ফেলবেন।

বিরস গলায় বিজয় কর্মকার বললেন, আমরা চুনোপুঁটি মশাই। মাথাওয়ালা লোকেরা তদন্তে নেমে পড়েছেন।

মৃদু হেসে বাসব বলল, কথাটা মনে রাখবেন। নরেনবাবু, আপনার কাছ থেকেই সেদিন চিন্ময় দত্ত গাড়ি চেয়ে নিয়েছিলেন, তাই না?

নরেন বললেন, হ্যাঁ। চাঁদপুর যাবেন বলেছিলেন।

তারপর?

আমি বিকেলে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

ওর সঙ্গে তারপর আর দেখা হয় নি?

তালুকদার বললেন, হয়েছিল। তবে উনি আমাদের দেখতে পান নি।

কি রকম?

গাঙ্গুলীর ভাগ্নে বর্ধমানে একটা এ্যাক্সিডেন্ট করে বসে। ওর ওখানে যাওয়া দরকার হয়ে পড়ল। অথচ গাড়ি ম্যানেজারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অগত্যা গাঙ্গুলী ট্রেনেই যাবে স্থির করল। আমি ওকে ট্রেনে তুলে দিতে যাচ্ছিলাম। তখনই—

তালুকদার বললেন, রওনা হবার সময় সোমেন অবশ্য আমাদের সঙ্গে ছিল। বাজারের কাছে এসে কার সঙ্গে দেখা করতে চলে যায়।

তারপর—

দূর থেকেই ব্যাঙ্কের সামনেটা আমাদের নজরে পড়ল। দত্ত একটা স্যুটকেশ নরেনের গাড়ির কেরিয়ারে রাখছিলেন। এই সময় দরোয়ান এসে পড়ল। তার সঙ্গে দু-চার কথা বলে, গাড়ি নিয়ে রওনা হলেন।

চাঁদপুরের দিকে গেলেন নিশ্চয়?

গাঙ্গুলী বললেন, না। গেলেন ব্যাণ্ডেলের দিকে।

বাসব ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছাড়তে বলল, তিনি কিন্তু গাড়িতে কোথাও যান নি। গেলে, আপনাদের স্টেশনের সামনে গাড়িটা পাওয়া যেত না।

আমার মনে হয় এর কারণ হল, রাস্তা বন্ধ দেখে উনি স্টেশনে চলে আসেন। তারপর ট্রেনে ব্যাণ্ডেল বা ওধারের আর কোন স্টেশনে যান।

রাস্তা বন্ধ কেন?

মেরামত হচ্ছে।

আপনার যুক্তিতে ধার আছে। তবে উনি ব্যাণ্ডেল বা ওধারের কোন

স্টেশনে যান নি। তা গেলে কলকাতায় ওর ডেডবডি পাওয়া যেত না। যাহোক, স্টেশনে পৌছে আপনি কি করলেন মিস্টার গাঙ্গুলী ?

বৃষ্টি এসে গিয়েছিল। প্রায় দৌড়ে আমরা স্টেশনে পৌছলাম। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, ট্রেন পেয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে।

তখন ক'টা ?

পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ।

বর্ধমান থেকে সেদিনই ফিরেছিলেন ?

ফিরলাম পরের দিন বেলায়।

মিস্টার গাঙ্গুলী রওনা হয়ে যাবার পর আপনি কি করলেন প্রশান্তবাবু ?

তালুকদার বললেন, ওখানে আর তো কিছু করার ছিল না। বাড়ি ফিরে এলাম।

সোমেনবাবুকে স্টেশনে দেখেছিলেন ?

না।

চা এসে পড়ল। সঙ্গে কয়েক রকমের মিষ্টি।

নানা ধরনের কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে চা-মিষ্টি শেষ হল। সোমেনও এসে পড়ল এই সময়। তাকে কিছুটা চিন্তিত দেখাচ্ছে। তালুকদার বাসবের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলেন। আসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন।

সোমেন বলল, আমার সন্ধান আপনি কোথায় পেলেন ?

বাসব মৃদু হাসল : সোমদের সন্ধান আমি পেয়েছি। কথা প্রসঙ্গে আপনার নামটাও এসে পড়েছিল। কি সূত্রে আপনি ওদের সঙ্গে যুক্ত, তাও আমি জানি।

সোমেন ঠোঁঠ চাটল : সব কথা বলেছে ?

সমস্ত।

বাসব এবার অন্যান্য সকলের দিকে দৃষ্টি ফেলল।

আপনারা অনুমতি করলে সোমেনবাবুকে নিয়ে আমি অন্যত্র যেতে পারি। আড়ালেই আমাদের কথাবার্তা জমবে ভাল।

তালুকদার বললেন, বেশ তো। ওপাশের ঘরে চলে যান।

নির্দিষ্ট ঘরখানা ছোট। খানকয়েক চেয়ার আছে। সরু একটা চৌকিও রয়েছে। তার ওপর সতরঞ্চি পাতা। ঘরখানা কিভাবে ব্যবহার করা হয় বোঝা গেল না। চেয়ারে বসল দুজন।

বাসব বলল, প্রথমেই বলে রাখি, পুলিশের সমস্ত রকম সমর্থন আমার পিছনে আছে। আপনার অতীত নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। যদিও সমস্ত কিছু জানি। বর্তমান কেসটা নিয়েই আমার আগ্রহ। যা বলবেন, সত্যি কথা বলবেন আশা করতে পারি নিশ্চয় ?

সত্যি কথাই বলব।

অপর্ণা সোম তাই বলেছেন। প্রথমে প্ল্যানটা কি ছিল, পরে কি দাঁড়াল, আমি জানি। এবার বলুন, অপর্ণা সোমকে বাজারের কাছে দেখবার পর আপনি কি করলেন ?

আমি জানতাম, ও স্টেশনে যাচ্ছে। দত্তর সঙ্গে কি কথাবার্তা হল, জানবার আগ্রহ আমার ছিল। প্রশান্তদা আর নরেনবাবুর চোখ বাঁচিয়ে, অন্য পথ ধরে আমি স্টেশনে পৌছলাম। অপর্ণার সঙ্গে টিকিট ঘরের কাছে দেখা হল। প্রশ্ন করতে বলল, তেমন কোন কথা হয়নি। তবে দু-চার দিনের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হবে।

দত্ত সেদিনই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে সরে পড়েছে একথা অপর্ণা সোম আপনাকে বলে নি ?

বিশ্বাস করুন, আমাকে বলে নি।

আপনি তারপর কি করলেন ?

পাঁচটা চল্লিশের কলকাতাগামী লোকালটা এসে পড়ল এই সময়। অপর্ণা ওতেই চাপল। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছিল, ও আমায় সত্যি কথা বলে নি বিশেষ কিছু চেপে গেছে। সাত-পাঁচ ভেবে আমি ট্রেনে চেপে বসলাম। অবশ্য অন্য কামরায়।

হাওড়ায় পৌছে কি করলেন ?

ভিড়ের মধ্যে আর অপর্ণাকে খুঁজে পেলাম না। অগত্যা বাসায় ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম।

তারপর থেকে সমস্ত রাত বাসায় ছিলেন বোধহয় ?

একটু ইতস্তত করে সোমেন বলল, বাসায় পৌছবার পরই দারুণ বৃষ্টি এল। মনের মধ্যে বেশ অস্থিরতা বোধ করছিলাম। বারবার মনে হচ্ছিল, দত্ত বিশেষ কিছু বলেছিল—অপর্ণা সেকথা আমায় জানায় নি। বৃষ্টি থামল ন'টা আন্দাজ সময়। আমি আবার বেরোলাম বাসা থেকে। চাপ দিয়ে অপর্ণার কাছ থেকে আসল কথাটা বার করে নেব, এই আশা নিয়েই বেরোলাম। ওদের ওখানে

পৌঁছে দেখি, দরজায় তালা ঝুলছে। মিনিট পনেরো ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার বাসায় ফিরে আসি। আর কোথাও বেরোই নি।

অরুণবাবু এখান থেকে কখন কলকাতা ফিরেছিলেন, জানেন?

তিনটে বাহান্নর গাড়িতে। আমাকে অন্তত সেই কথাই বলছিলেন।

বাসব পাইপে মিক্সচার ভরতে ভরতে বলল, কাল আপনি এসেছেন কেন?

এধার ওধার করতে আর ভাল লাগছে না। কোন একটা ব্যবসা করব ভাবছি। প্রশান্তদা আর নরেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।

চিন্ময় দত্তর খুন সম্পর্কে নিশ্চয় আপনি চিন্তা-ভাবনা করেছেন। কাজটা কে করেছে বলে আপনার ধারণা।

যে টাকাটা নিয়েছে, খুন করেছে সে।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, তা তো বটেই। জানতে চাইছি, আপনার ধারণায় সেই লোকটা কে?

ধারণার কথা ছেড়ে দিন মিস্টার ব্যানার্জি। কাজটা পুলিশের। এখন দেখছি, আপনারও কিছুটা দায়িত্ব রয়েছে।

দায়িত্ব ঠিক নয়। অনুরোধে ঢেঁকি গেলা বলতে পারেন। উপস্থিত আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। চলুন, ওখানে যাওয়া যাক।

মিনিট দশেকের মধ্যেই তালুকদার আর গাঙ্গুলীর কাছ থেকে বিদায় নিল বাসব। বিজয় কর্মকার চুপচাপই আছেন। আবার তিনজন থানায় ফিরে গেল।

বাসব বলল, এবার আপনি কিছু বলুন বিজয়বাবু?

কর্মকার বললেন, নতুন কথা আর কি বলব? আপনি তো সবই জানেন।

সব জানলে তো এতক্ষণ হত্যাকারীর হাতে হ্যাণ্ডকাফ পড়ে যেত। ভাল কথা, আপনার কাছে টাইমটেবল আছে?

আছে।

দেখি। এক সিট কাগজও দেবেন।

কর্মকার দেরাজ ঘেঁটে টাইমটেবল বার করলেন। এক সিট কাগজও এগিয়ে দিলেন। বাসব টাইমটেবল ঘেঁটে কি সমস্ত দেখল। কাগজে নোট নিল কিছু। তারপর কাগজটা মুড়ে পকেটে রাখতে উঠে দাঁড়াল।

এখন চলি। পরে আবার দেখা হবে। এস ডাক্তার।

স্টেশনে পৌঁছবার মিনিট দশেকের মধ্যেই কলকাতাগামী লোকাল পাওয়া গেল। অপেক্ষাকৃত নির্জন কামরায় উঠে বসল দুজনে। দ্রুতগতিতে লোকাল

কলকাতার দূরত্ব কমিয়ে আনতে লাগল। বাসব চিন্তিত মুখে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল।

শৈবাল বলল, টাইমটেবল নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেছিলে কেন?

বাসব পকেট থেকে মোড়া কাগজটা বার করে বলল, এখান থেকে কে কখন গেছে, তারই একটা লিস্ট বানিয়েছি। পড়ে দেখ।

শৈবাল কাগজটার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। তালিকা নিম্নরূপ—

অরুণ সোম কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয় তিনটে বাহান্নর ট্রেনে।

অপর্ণা সোম কলকাতাগামী ট্রেন ধরে পাঁচটা চল্লিশে।

সোমেনবাবুও ওই একই ট্রেনে রওনা হয়।

নরেন গাঙ্গুলী বর্ধমান যান পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেনে।

যে কোন কারণেই হোক মত পরিবর্তন করে, চিন্ময় দত্ত মোটর নিয়ে চলে এসেছিলেন স্টেশনে। মনে হয়, পাঁচটা আটান্ন বা ছ'টা কুড়ির ট্রেনে তিনি কলকাতা চলে গিয়েছিলেন।

এতে কি প্রমাণিত হল?

বাসব মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বলল, কিছুই না। আবার অনেক কিছু। এখান থেকে কলকাতা পৌঁছতে আধ ঘণ্টাটাক সময় লাগে। পাঁচটা আটান্ন বা ছ'টা কুড়ি, যে কোন একটা ট্রেন দত্ত অ্যাভেল করে থাকলে, সাতটার মধ্যে সে বাসায় পৌঁছে গিয়েছিল। তারপর অপেক্ষা করছিল অপর্ণা সোমের জন্য। আমার মনে হয়, হত্যাকারী এই সময় ওখানে গিয়ে পৌঁছয়। দত্ত অবাক হয়নি। কারণ আগন্তুক তার পরিচিত। অবশ্য বিরক্ত হয়ে থাকতে পারে। এর পরের কাজটা সহজ।

সেই লোকটা কে?

সমস্যা তো সেখানেই ডাক্তার।

বাসব আর কিছু বলল না। চিন্তিত মুখে তাকিয়ে রইল জানালার বাইরে। একের পর এক স্টেশন পার হয়ে চলল। লোকাল হাওড়ায় পৌঁছল নির্দিষ্ট সময়েই। ভাগ্যক্রমে অল্প আয়াসেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। বাড়ি পৌঁছবার পর বাসব বলল, আমার মন বলছে কেসটা খুব সরল। স্থূল একটা সূত্র ধারে-কাছেই আছে, দেখেও দেখতে পাচ্ছি না। বাহাদুর কোথায় গেল? কড়া এক কাপ চা না হলে আর চলবে না।

শৈবাল চেঁচিয়ে বাহাদুরকে চায়ের কথা জানিয়ে বলল, বেশ গরম লাগছে, এয়ার কুলারটা চালানো যাক।

চালাও।

এই নতুন মডেলের যন্ত্রগুলো চমৎকার। সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে ঘর ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

বাসব প্রায় লাফিয়ে উঠল : কি বললে? সুইচ অন করার কথা বললে না?

শৈবাল অবাক হয়ে বলল, তাই তো বললাম। কি হয়েছে?

বুঝতে পারছ না ডাক্তার, অজান্তেই তুমি আমার কি উপকার করলে। চিন্ময় দত্তর ফ্ল্যাটে একটা অসঙ্গতি আমি লক্ষ্য করেছিলাম, কিন্তু সেটা কি, ভেবে পাচ্ছিলাম না। তোমার ওই কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

অর্থাৎ—

সেণ্টার টপের ওপর একটা টেপরেকর্ডার রাখা ছিল, মনে পড়ছে?

হ্যাঁ। বেশ দামী টেপরেকর্ডার।

যন্ত্রটার সুইচ অন করা ছিল।

তাতে কি হয়েছে?

টেপরেকর্ডার চালু অবস্থায় অকারণে কেউ ছেড়ে দেয় না। হয় শোনে বা রেকর্ড করার পর সুইচ অফ করে দেয়। এক্ষেত্রে অন করা ছিল কেন?

হয়তো—

আমার মন বলছে—আচ্ছা ডাক্তার, পুরাণের দধিচী মুনির উপাখ্যানটা তুমি জান? সেই যে, অসুর নিধনের জন্য যিনি স্বেচ্ছা মৃত্যুবরণ করে নিজের অস্থি দান করলেন?

জানি। দেবতাদের ঠেঙিয়ে পাটবিচি বুনে দিয়েছিল অসুররা। শেষে দধিচীর অস্থি দিয়ে অস্ত্র তৈরি হল। সেই অস্ত্রের সাহায্যে দানবপতি বৃত্তাসুরকে মেরে দেবতারা স্বর্গের মুখরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তার সঙ্গে এই কেসের সম্পর্ক কি?

সম্পর্ক অতি গভীর। হিসাবে আমার ভুল না হয়ে থাকলে বলতে চাই, দধিচীর অস্থির মত, চিন্ময় দত্ত শত্রুর নিপাতের এক মোক্ষম সূত্র রেখে গেছে। মানতেই হবে লোকটার মাথায় বুদ্ধি নামক পদার্থটা ছিল।

সূত্রটা কি?

ওই যে বললাম, টেপরেকর্ডারের সুইচটা অন করা ছিল।

বাসব সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল। দ্রুত এগিয়ে গেল কোন স্ট্যাণ্ডের দিকে। রিসিভার তুলে একটা নম্বর ডায়াল করল। সাড়া পেতে বলল, কে মিস্টার সামন্ত? আমি বাসব—দত্তর ফ্ল্যাটে আরেকবার যেতে চাই।—হ্যাঁ—আমার পরিচিত কাউকে এখনই পাঠিয়ে দিন আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছব। ধন্যবাদ—রাখলাম।

বিজয় কর্মকার চার্মিনার ধরিয়ে সবে চেয়ারে নড়েচড়ে বসেছেন, বাসবকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখলেন! সঙ্গে শৈবাল ও আরো একজন লোক। ভারি বিরক্ত হলেন কর্মকার। বেসরকারী লোকেদের নাক গলাবার সুযোগ কেন যে কর্তারা দেন, তিনি ভেবে পান না।

বাসব টেবিল পর্যন্ত এগিয়ে এসে বলল, আবার আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি লালবাজার থেকে আসছেন, রণেন চৌধুরী। হোমিসাইড বিভাগের অফিসার।

কর্মকার এবার ব্যস্ততা বোধ করলেন: একি! দাঁড়িয়ে কেন বসুন, বসুন।

রণেন চৌধুরী বললেন, চিন্ময় দত্তর কেসটা দু' ভাগে ভাগ হয়ে রয়েছে। চুরি হয়েছে এখানে, খুন আমাদের এলাকায়। বুঝতেই পারছেন, মিলেমিশে কাজ করতে হবে।

তা তো বটেই। আমরা উঠে পড়ে লেগেছি। চোর বা খুনে—যাই বলুন, তার সন্ধান এখনো পাই নি।

ধীর গতিতে কাজ করলে, লোকটা দূরে থাক, একটা সূত্রও হাতে পাবেন না। যাক ওকথা। এখন আমরা মিস্টার ব্যানার্জির পরিকল্পনা মতই এগোব। কয়েকটা কাজ আপনাকে করে দিতে হবে। আমি সঙ্গে করে কয়েকজনকে নিয়ে এসেছি। বাইরে অপেক্ষা করছে। ওরা আপনাকে সাহায্য করবে।

কর্মকার বললেন, বলুন, কি করতে হবে?

রণেন চৌধুরী বাসবের দিকে তাকালেন।

বাসব একটা ভাঁজ করা কাগজ টেবিলের ওপর রেখে বলল, এতে লেখা আছে। অসুবিধায় পড়তে হবে না। ভাল কথা চিন্ময় দত্ত এখানে থাকত কোথায়?

কাছেই। 'শিকদার ভিলা'। এখান থেকে পঞ্চাশ গজও হবে না। যাবেন নাকি ওখানে?

ঘরখানা একবার ভাল করে দেখবার ইচ্ছা ছিল।

কর্মকার দেরাজ থেকে চাবি বার করে বাসবের হাতে দিলেন। টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিলেন ভাঁজ করা কাগজটা। বাসবদের ছোট দলটি বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

থানা থেকে বেরিয়েই নরেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। উনি গাড়ি চালিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন।

গাড়ি থামিয়ে কিছুটা বিস্ময়ের সুরে বললেন, একি, আপনারা? কখন এলেন?

ঘণ্টাখানেক।—বাসব বলল, মিস্টার তালুকদার কোথায়?

কাজের জায়গায়। আমাদের ওখানে যাবেন নাকি? আপনারা তাহলে গাড়িতে উঠে আসুন।

চলুন। কিছুক্ষণ আপনাদের ওখানে বসি গিয়ে।

মিনিট কয়েক পরেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল ওরা। তালুকদার কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলেন। তাড়াতাড়ি গদিঘর থেকে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন ওদের।

রণেন চৌধুরীর সঙ্গে বাসব পরিচয় করিয়ে দিল।

নরেন প্রশ্ন করলেন, কতদূর এগোল ব্যাপারটা?

বেশ দ্রুত তালেই এগোচ্ছে। ঘটনার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে যে কাঠামো খাড়া করা গেছে, তা নিয়ে স্বচ্ছন্দে আলোচনা চলতে পারে। ব্যাপারটা কিভাবে গড়িয়েছিল আপনাদের বলি। চিন্ময় দত্ত লোক হিসাবে খুব খারাপ ছিলেন না। কিন্তু দুষ্ট গ্রহের কোপে পড়ে এক তথাকথিত মহিলার ফাঁদে পড়ে তলিয়ে গেলেন। যা হয় আর কি, পাকে চক্রে এমন অবস্থার মধ্যে এসে পড়লেন, যখন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা সরাবার পরিকল্পনায় একাগ্র না হয়ে আর উপায় রইল না। কলকাতার অফিসে সুবিধা হবে না তিনি জানতেন। খুঁজছিলেন এমন একটা ব্রাঞ্চ, যেখানে একাই তাঁকে সমস্ত দিক সামলাতে হবে। ভাগ্যক্রমে এখানে তিনি বদলী হলেন। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার ইচ্ছা ছিল না দত্তর। তিনি অপেক্ষা করছিলেন, কবে বেশ বড় অঙ্কের টাকা তহবিলে জমা হয়। সুযোগ এসে গেল। আপনারা জমা করলেন কয়েক লক্ষ টাকা। আর অপেক্ষা করা দত্ত বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন না। তাঁর প্ল্যানটা বোধহয় ছিল, গাড়িতে চেপেই ব্যাণ্ডেলের দিকে চলে যাবেন। তারপর ওধারের কোন স্টেশন থেকে

রওনা হয়ে যাবেন কলকাতা। এতে পুলিশকে বিপথগামী করা হবে। তারা ভাববে, দত্ত টাকা সমেত কোন দূরপাল্লার ট্রেন ধরেছে ব্যাণ্ডেল থেকে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি। মেরামতির দরুন রাস্তাটা বন্ধ ছিল। অগত্যা দত্তকে ফিরে আসতে হয় স্থানীয় স্টেশনে। তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। এমন একজন তাঁকে দুটো স্যুটকেশ হাতে ট্রেনে চড়তে দেখল, যার মনে আগেই ধোঁয়াটে সন্দেহ হয়েছিল, এখন সন্দেহ বদ্ধমূল হল।

বাসব থামল।

তালুকদার প্রশ্ন করলেন, তারপর ?

সেও ট্রেনে চাপল। অবশ্য অন্য কামরায়। দত্ত কিন্তু কিছু জানেন না। লোকটা সতর্কতার সঙ্গে বকুল বাগান পর্যন্ত অনুসরণ করে এল। দত্ত নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পরে অনুসরণকারী নক করল দরজা। আগন্তুক অপরিচিত নয় দত্তর। তাকে দেখে তিনি অবাক হলেন নিশ্চয়। কল্পনার শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেলেও এই ব্যক্তিকে তিনি আশা করতে পারেন না। বলা বাহুল্য, এই ব্যক্তিই দত্তকে খুন করে টাকা ভর্তি স্যুটকেশ নিয়ে সরে পড়েছে।

সেই লোকটাকে তাহলে আপনি—

চিনতে পেরেছি। চিনতে পারাটাই অবশ্য শেষ কথা নয়। সকলের অ্যালিবাই আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে হচ্ছে। খোঁজ নিতে হচ্ছে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সে রাত্রে কে কোথায় ছিলেন। আজকের কথাই ধরুন না। থানায় অবশ্য বললাম, দত্তর এখানকার আস্তানাটা দেখব বলে এসেছি। তা কিন্তু নয়, আমরা এখানে এসেছি একজনকার অ্যালিবাই যাচাই করতে।

নরেন বললেন, বলেন কি ! এখানে ?

ঠিক তাই। এখানকার ওসির সঙ্গে লালবাজারের কয়েকজন বাজিয়ে দেখতে গেছে একজনকে। এতক্ষণে তাদের এখানে আসবার কথা ছিল। ঠিকানা দেওয়া আছে। আসল কথাটা হচ্ছে, মিস্টার গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা না হলেও, আমরা এখানেই—

বাসবের কথা শেষ হবার আগেই গদিঘরের সামনেকার চত্বরে কয়েকজনকে দেখা গেল। কর্মকারও আছেন তাঁদের মধ্যে। তিনি সকলকে নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। এবার লক্ষ্য করা গেল, ওঁদের সঙ্গে একজন ভৃত্যশ্রেণীর লোকও রয়েছে। মুখ দেখে বুঝতে পারা যায়, কিছুক্ষণ আগে সে কান্নাকাটি করছিল।

কর্মকার ব্রণেন চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এর নাম হরিপদ। ওকে বাড়ির সামনেই ধরেছিলাম। সব কথা স্বীকার করেছে।

হরিপদ ততক্ষণে তালুকদারের কাছে এগিয়ে গেছে। ভাঙা গলায় বলল, আমি কিছু করি নি। এঁরা আমাকে চড়চাপড় মেরেছেন। টানতে টানতে এখানে নিয়ে এসেছেন বাবু।

সেকি! ভারি গলায় তালুকদার বললেন, ব্যাপার কি? আমার চাকরকে মারধোর করা হল কেন?

মুখে হাসি টেনে বাসব বলল, আসল কথাটা বলতে চাইছিল না বোধহয়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে পুলিশ একটু মারধোর করেই থাকে।

আসল কথা বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?

সেদিন আপনি কখন বাড়ি ফিরেছিলেন? সন্ধ্যার মুখে, মাঝরাতে, না ভোরে?

তার মানে?

আমি পেঁচিয়ে কিছু বলি নি মিস্টার তালুকদার। সার কথাটা হচ্ছে, আপনি ধরা পড়ে গেছেন।

তালুকদার দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর শরীর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। বললেন অসংলগ্ন গলায়, আপনি বলতে চাইছেন, আমি—আমি—

হ্যাঁ, আপনি। চুরি এবং খুন, দুটোই আপনি করেছেন। তবে কাজটা পরিচালিত হয়েছে ভারি অপটু হাতে। মনে হয়, পরিকল্পনার পিছনে খুব বেশী চিন্তা-ভাবনা নেই।

বিস্মিত নরেন গাঙ্গুলী বললেন, এ সমস্ত কি শুনছি প্রশান্ত, তুমি—আমার এ কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? বাসববাবু—মানে—

যা ইচ্ছে তাই বলে দিলেই হল! তীক্ষ্ণ গলায় প্রশান্ত বললেন, আমার একটা মান-মর্যাদা আছে। কারোর মর্যাদা নিয়ে খেলা করার কি পরিণাম, আপনি জানেন?

বাসব শান্ত গলায় বলল, জানি বৈকি। আমার দীর্ঘ-কার্যকালে এ ধরনের কথা আমি বহুবার শুনেছি। নিজের ভাল মত ডিফেন্সের ব্যবস্থা না থাকলে, শেষ কথাটা আমি বলি না। হাজার হাজার অপরাধী অতীতে যে ভুল করেছে, আপনিও তাই করেছেন। দত্তর ফ্ল্যাটে রেখে এসেছেন নিজের হাতের ছাপ;

আপনার চাকর হরিপদ, নিজের সাক্ষাতে বলবে, সেদিন আপনি গভীর রাতে অর্থাৎ শেষ ট্রেনে বাড়ি ফিরেছিলেন। অথচ নিজের জবানবন্দীতে বলেছেন, সন্ধ্যায় বাড়িতেই ছিলেন। ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছে, আমি মোটামুটি আঁচ করতে পেরেছি। নরেনবাবুর সঙ্গে আপনি স্টেশনে যাবার পথে অসময়ে ব্যাঙ্ক থেকে দত্তকে স্যুটকেশ বার করে গাড়িতে রাখতে দেখে আপনার মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। নরেনবাবু বর্ধমান চলে যাবার পর আপনি স্টেশন ছাড়তে পারেন নি। দারুণ বৃষ্টি হচ্ছিল। সেডের তলায় বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন সময় দত্তকে আপনি দেখতে পেলেন। ব্যস্ততা ও ভীত সন্ত্রস্ত ভাব তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল। আপনি যে কোন কারণেই হোক, এবার নিশ্চিত হলেন, লোকটা টাকা নিয়ে পালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে লোভ আপনাকে সাপ্টে ধরল। একক ভাবে আপনি অনেক টাকা পেতে চাইলেন। এতে আপনার পার্টনার নরেনবাবু বা আপনাদের কোম্পানির কোন ক্ষতি নেই। ব্যাঙ্কের টাকা চুরি গেলে আমানতকারীরা অসুবিধায় পড়ে না। ব্যাঙ্ক সে টাকা মিটিয়ে দেয়। আপনি চোরের ওপর বাটপাড়ি করার জন্য তৎপর হলেন। এরপর কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল, আমি আগে বলেছি।

এই সমস্ত দুর্বল প্রমাণ নিয়ে আপনি—

আমার আরো কিছু বলার আছে প্রশান্তবাবু। চিন্ময় দত্ত বোকা ছিলেন না। মরার আগে তিনি বিশেষ উপকার করে গেছেন। আপনাকে দেখেই উনি নিশ্চয় প্রথমে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সেণ্টার টপের ওপর একটা টেপরেকর্ডার রাখা ছিল। আপনার আসার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেই উনি অলক্ষ্যে টেপরেকর্ডারের স্যুইচ অন করে দেন। কাজেই বুঝে নিন টেপ করা আপনার প্রতিটি কথা এখন আমাদের হেফাজতে আছে। এরপর আসছে টাকার কথা। ওই বিশাল অঙ্কের টাকা নিশ্চয় আপনি অন্যত্র রাখেন নি। রেখেছেন বাড়িতেই। আপনার বাড়ির খানাতল্লাসী আজই হবে।

ভাঙা গলায় নরেন গাঙ্গুলী বললেন, এ তুমি কি করলে প্রশান্ত? তোমার কিসের অভাব? তুমি একটা মানুষকে খুন করতে পার, আমি ভাবতেও পারছি না।

প্রশান্ত তালুকদারের শরীরে এখন থমথমে শৈথিল্য নেমে এসেছে। বাঁচার কোন পথ নেই, এবার বোধহয় বুঝতে পেরেছেন। চোখে বোধহয় অনুশোচনার ছায়া গভীর হচ্ছে।

বললেন থেমে থেমে, তুমি বিশ্বাস কর নরেন, লোকটাকে আমি খুন করতে চাই নি। ও আমাকেই মারার চেষ্টায় ছিল। আমি—

প্রশান্ত তালুকদার আর কিছু বলতে পারলেন না। চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। ঘামের স্রোত ওঁকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলল। আর কিছু করার নেই। বাসব উঠে দাঁড়াল। ঘড়িতে তখন বারোটা কুড়ি।

স্থ মুখ?...ঐ যে উহাদের দ্রুত পদশব্দ...ইন্দ্রাণী, এত রাত্রিতে তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ? আমি আসিব, সকালেই আসিব; রাগ করিও না, ইন্দ্রাণী।

নিচের তলায় ভারী বুটের সদর্প দ্রুত শব্দ হইতেছে। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে কে উঠিতেছে, না?

অমিতের চোখে পড়িল, ভোরের আলো আসিতেছে। অন্ধকার সরাইয়া নূতন দিনের বাতায়ন খুলিতেছে।

ততক্ষণে সবুট পদধ্বনি দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া গেল।